বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ও

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক প্রকাশিত হল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একশ চল্লিশ বছরের গদ্য সংকলনে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার ক্রমোন্নতি বোঝা যাবে। গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে যে বৈচিত্র্য বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছিল, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের স্থান দিতে এই সংকলন গ্রন্থে।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা দেশে সংকলন গ্রন্থের সমাদর ছিল। তবে সেগুলি সবই কবিতার সংকলন। কদাচিৎ উনিশ শতকের শেষের দিকে গদ্য-পদ্য সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাপক। সেই উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়েছে পাঠক বিচার করবেন।

বাংলা গদ্যের পদাঙ্কের ভূমিকায় বাংলা গদ্যরীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। আমাদের অবলম্বিত আদর্শের কথাও সেখানে বলা হয়েছে। এখানে আর দু-একটি কথা বলে নিই। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন। তাছাড়া এমন কতকগুলি গদ্যাংশ চয়ন করেছি যেগুলির সামাজিক মূল্য অপরিসীম। কিছু কিছু গদ্যাংশ সামাজিক দলিল হিসেবে বিবেচ্য। আর এক জাতীয় গদ্যাংশ চয়ন করেছি ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে। এই সংকলন গ্রন্থে চিঠিপত্র পর্য্যায়ের রচনা কিঞ্চিৎ বেশি। পত্রসাহিত্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে আমরা সচেতন হয়েছি। কিন্তু পত্র-সাহিত্যের গদ্যরীতির বিচিত্র উপকরণ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেই কারণে তা স্মরণযোগ্য। গদ্যরীতির আর একটি শাখা স্মরণীয়। আমাদের অনেক গদ্যশিল্পী মুখে মুখে অনেক কথা বলেছেন, একজন লিপিকর তা লিখেছেন। মুখের ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরবার জন্য আমরা সেই জাতীয় রচনার স্থানও দিয়েছি কিছু বেশি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন'। কিন্তু গদ্য-পদ্যের এই ভেদরেখা যে রবীন্দ্রনাথের হাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার প্রমাণ এই সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

লেখকদের জন্ম তারিখ অনুযায়ী রচনাগুলি সংকলিত। এর সুবিধে যেমন আছে তেমনি অসুবিধেও কিছু আছে। শ্রীমতী রাসসুন্দরীর রচনা এই নিয়মে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আগে দিতে হয়। কিন্তু তাতে ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে বাধা জন্মায়। এই কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীমতী রাসসুন্দরীর গদ্য সংকলনে দিতে পারি নি।

প্রত্যেক রচনার উৎসমূল উল্লেখ করেছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সেক্ষেত্রে যে সংস্করণ থেকে রচনাটি সংগৃহীত, সেই সংস্করণের এবং সংস্করণের তারিখ উল্লেখ করে দিয়েছি। বিভিন্ন সংস্করণে একই বই'র কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সমস্ত শিল্পীর রচনাকে স্থান দিয়েছি অনেকের কাছে তা বাহুল্য মনে হতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে যাঁদের সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু এককালে তাঁহার রচনা অভিনন্দিত হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকের কাছে এসব রচনার গুরুত্ব আছে। সেই গুরুত্ব বিচার করে এ সংকলনে তাঁদের স্থান দিয়েছি। আবার কোনও কোনও লেখকের রচনা অনবধানবশত সংকলনে বাদ পড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধনের আশা রাখি।

এই সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করতে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈতন্য লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভাগ অন্যতম। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীসুলেখা গণ আমাদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। শ্রীশিবচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার সাহাও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহ এবং আগ্রহ না থাকলে এত শীঘ্র বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

॥ ভ্রম-সংশোধন ॥

এই গ্রন্থের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবৎকাল ১৮৫৬-১৯২৩ এর স্থানে ভ্রমবশতঃ ১৮৫৪-১৯৩২ মুদ্রিত হয়েছে। গুপ্তিপাড়া হাইস্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক এবং বর্ত্তমানে কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীনীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভ্রম-সংশোধন করে দিয়ে সম্পাদকদ্বয়কে ঋণী করেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
বাংলা গদ্য রীতির একশ চল্লিশ বৎসর		১—১৭৬
রামরাম বসু		
প্রতাপাদিত্যেব প্রত্যাবর্ত্তন	...	১৭৭
উইলিয়ম কেরী		
স্ত্রীলোকের কথোপকথন	...	১৭৮
কন্দল	...	১৭৯
খলেব ইতিহাস	...	১৮০
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার		
চতুর্থী পুত্তলিকাব কথা	...	১৮০
হিতোপদেশ	...	১৮২
সিরাজদ্দৌলা	...	১৮৩
ব্রহ্মের স্বরূপ	...	১৮৪
বিশ্ববঞ্চকেব কাহিনী	...	১৮৫
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়		
মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৮৭
রামমোহন রায়		
বাংলা গদ্য	...	১৮৮
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচাব	...	১৮৯
সহমবণ বিষয়	...	১৯০
ঈশ্বব	...	১৯১
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
বাবু	...	১৯২
অথ উপদেশারম্ভ নব বাবু	...	১৯৩
ফুলবাবু	...	১৯৪
অথ দ্রব্যের বিবরণ	...	১৯৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত		
ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৯৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		
ভূসুরেব পত্র	...	১৯৭

বিষয়		পত্রাঙ্ক
সংবাদপত্র		
স্ত্রী শিক্ষা	...	১৯৮
যাত্রা	...	১৯৮
বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ	...	২০০
বেলুন	...	২০০
কন্যাবিক্রয় কাহিনী	...	২০১
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ	...	২০২
প্যারীচাঁদ মিত্র		
তামাসা ফষ্টি	...	২০৩
মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে	...	২০৫
পক্ষিদল	...	২০৬
রাত্রি		২০৭
বিদেশী শিক্ষা	...	২০৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ	...	২০৮
জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব	...	২১০
আমার জীবন কাহিনী	...	২১১
অক্ষয়কুমার দত্ত		
হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায় বক্তৃতা	...	২১৫
স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক	...	২১৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		
পরিশ্রম-অধিকার	...	২২১
আলেখ্য দর্শন	...	২২২
মাতৃভক্তি	...	২২৪
প্রভাবতীসম্ভাষণ	...	২২৬
খুড়-ভাইপো	...	২৩৩
বাল্যস্মৃতি	...	২৩৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত		
মঙ্গলাচরণ	...	২৩৯
উৎসর্গ	...	২৪০
হেক্টরের যুদ্ধযাত্রা	...	২৪১

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আওরঙ্গজেবের পত্র ... ২৪৩
মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট পত্র ... ২৪৬
পানিপথের যুদ্ধ ... ২৪৭
সামাজিক প্রকৃতি—উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ ... ২৪৯

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

মহাশ্বেতা ... ২৫২

রাজনারায়ণ বসু

চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ... ২৫৫

দীনবন্ধু মিত্র

নিমচাঁদের স্বগতোক্তি ... ২৫৮

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোল রমণী ... ২৫৯
নববধূ ... ২৬১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবমন্দির ... ২৬৩
পত্র সূচনা ... ২৬৫
প্রকৃতি ... ২৬৮
বড়বাজার ... ২৬৮
আমার দুর্গোৎসব ... ২৭০
কমলাকান্তের বিদায় ... ২৭০
জ্যোৎস্না ... ২৭২
পুরাতন ও নূতন ... ২৭৪
মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ... ২৭৭
শাহজাদী ভস্ম হইল ... ২৮১
খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম ... ২৮৫

কেশবচন্দ্র সেন

রাজা রামমোহন রায় ... ২৮৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা ... ২৯২
দুর্গোৎসব ... ২৯৪

বিষয়		পত্রাঙ্ক
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
চিঠিপত্র	...	২৯৫
গীতা পাঠের ভূমিকা	...	২৯৭
আর্য্যামি এবং সাহেবি আনা	...	২৯৯
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)	...	৩০২
কালীপ্রসন্ন ঘোষ		
অভিমান	...	৩০৪
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		
যার কেউ নাই, তার হরি আছে	...	৩০৫
চন্দ্রনাথ বসু		
আনন্দমঠ	...	৩১০
ফুলের ভাষা	...	৩১২
গিরিশচন্দ্র ঘোষ		
জল্পনা	...	৩১৫
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		
ভারত মহিমা	...	৩১৭
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		
নীলকমল	...	৩১৯
অক্ষয়চন্দ্র সরকার		
গ্রাব্	...	৩২০
শিবনাথ শাস্ত্রী		
বালিকা বধূর বেদনা	...	৩২৩
নবীনচন্দ্র সেন		
রবীন্দ্রনাথ	...	৩২৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়		
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী	...	৩৩১
খাঁদা ভূত	...	৩৩২
মীর মশাররফ হোসেন		
হানিফার পরিণতি	...	৩৩২

বিষয়		পত্রাঙ্ক
রমেশচন্দ্র দত্ত		
স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল	...	৩৩৫
কলিকাতা বড়বাজার	...	৩৩৯
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়		
জাহ্নবীতীরে	...	৩৪২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী		
তৈলদান	...	৩৪৩
ত্রয়ী	...	৩৪৬
প্রেমিক প্রেমিকা	...	৩৫০
কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে	...	৩৫১
মায়ার স্বামীর মূর্তি	...	৩৫৩
শ্রীম		
যোগ ও ভোগ	...	৩৫৪
অমৃতলাল বসু		
কালাচাঁদের বাহাদুরী	...	৩৫৬
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু		
কাশীধাম	...	৩৫৭
অশ্বিনীকুমার দত্ত		
কর্ম্মযোগ	...	৩৫৯
স্বর্ণকুমারী দেবী		
বিদায়	...	৩৬১
জগদীশচন্দ্র বসু		
যুক্তকর	...	৩৬২
বিপিনচন্দ্র পাল		
প্রাণের কথা	...	৩৬৫
যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন	...	৩৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র	...	৩৬৭
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি		
ভোজবিদ্যা	...	৩৬৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
সুরমার মৃত্যু	...	৩৭১
রাজপথের কথা	...	৩৭২
'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া	...	৩৭৩
'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া	...	৩৭৪
'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া	...	৩৭৬
পোস্টমাস্টার	...	৩৭৬
ছিন্নপত্র	...	৩৭৭
ছিন্নপত্র	...	৩৭৮
ছিন্নপত্র	...	৩৭৮
ছিন্নপত্র	...	৩৭৯
ছিন্নপত্র		৩৭৯
ছিন্নপত্র	...	৩৮০
কৃষ্ণচরিত্র	...	৩৮০
ক্ষুধিত পাষাণ	...	৩৮২
নরনারী	...	৩৮২
কাব্যের উপেক্ষিতা	...	৩৮৪
নববর্ষ	...	৩৮৬
নৌকাডুবি	...	৩৮৮
দুঃখ	...	৩৮৮
গোরা	...	৩৮৯
জীবনস্মৃতি	...	৩৯০
নীলকুঠি	...	৩৯১
পয়লা নম্বর	...	৩৯২
পায়ে-চলার পথ	...	৩৯৩
সন্ধ্যা ও প্রভাত	...	৩৯৪
যোগাযোগ	...	৩৯৫
শেষের কবিতা	...	৩৯৬
চোরাই ধন	...	৩৯৭
ছেলেবেলা	...	৩৯৭
নীলা	...	৩৯৯
সভ্যতার সঙ্কট	...	৪০০
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব		
তিন শত্রু	...	৪০১

বিষয়		পত্রাঙ্ক
স্বামী বিবেকানন্দ		
পত্র	...	৪০৪
পত্র	...	৪ ৫
বর্ত্তমান ভারত	...	৪০৮
বাঙ্গালা ভাষা	...	৪১১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়		
বিক্ষুব্ধ হৃদয়	...	৪১৪
চাণক্যের চিন্তা	...	৪১৫
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		
বিগ্রহ	...	৪১৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	৪১৭
মুক্তি	...	৪২০
বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা	...	৪২১
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৪২২
মন্দিরের সৌন্দর্য্য	...	৪২৩
দীনেশচন্দ্র সেন		
সীতা	...	৪২৫
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়		
বঙ্গের ভাস্কর্য্য	...	৪৩২
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	৪৩৪
প্রমথ চৌধুরী		
জয়দেব	...	৪৩৫
পত্র	...	৪৩৭
পত্র	...	৪৩৯
রূপের কথা	...	৪৪০
বাঙালি পেট্রিয়টিজ্‌ম্	...	৪৪১
পথের অভিজ্ঞতা	...	৪৪২
বাংলা ভাষার কথা	...	৪৪৭
চিত্রাঙ্গদা	...	৪৪৮
ভারতচন্দ্র	...	৪৪৯

বিষয় পত্রাঙ্ক

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হুঁকা-কলিকা বনাম চুরুট-সিগ্‌রেট ... ৪৫১

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৃদয়াঞ্জলি ... ৪৫৫
কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা ... ৪৫৬
কণারক ... ৪৫৭

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাদিত্য ... ৪৫৯
বৃদ্ধমহিমা ... ৪৬১
লুকিবিদ্যে ... ৪৬২
পাখির প্রশ্ন ... ৪৬৪
শিল্প ও ভাষা ... ৪৬৫
সৌন্দর্যের সন্ধান ... ৪৬৭
ঘরোয়া ... ৪৭১
ঘরোয়া ... ৪৭২
জোড়াসাঁকোর ধারে ... ৪৭৩
জোড়াসাঁকোর ধারে ... ৪৭৫
জোড়াসাঁকোর ধারে ... ৪৭৫
জোড়াসাঁকোর ধারে ... ৪৭৭
জোড়াসাঁকোর ধারে ... ৪৭৮

অরবিন্দ ঘোষ

কারাকাহিনী ... ৪৭৯

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আইন প্রসঙ্গ ... ৪৮১
একটি ভৌতিক কাণ্ড ... ৪৮৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসা ... ৪৯৩
শ্রীকান্ত ... ৪৯৪
গৃহদাহ ... ৪৯৫
তাজমহল ... ৯৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
আনন্দবাজার পত্রিকা		
আশা ও নৈরাশ্য	...	৫০০
ভোঁদড় নাচ	...	৫০১
যুগান্তর		
আমাদের কথা	...	৫০২
রবীন্দ্রনাথ	...	৫০৩
সাংহাই সন্দেশ	...	৫০৩
রাজশেখর বসু		
ট্রেনে	...	৫০৪
নামতত্ত্ব	...	৫০৫
ত্রিজটার স্বপ্ন	...	৫০৭
গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন—কৃষ্ণকে অভিশাপ	...	৫১০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		
সবাই-রাজার-দেশ	...	৫১২
সীমা-সাক্ষী	...	৫১৪
সতীশচন্দ্র রায়		
রসাতল	...	৫১৫
অতুলচন্দ্র গুপ্ত		
কাব্যের ফল	...	৫১৯
অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী		
ছিন্নপত্র	...	৫২০
বিনয়কুমার সরকার		
লালদীঘি ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট	...	৫২৩
তালতলা	...	৫২৪
লোকসাহিত্য	...	৫২৪
শক্তিধরের আদমসুমারি	...	৫২৫
ডানপিটের বীরত্ব	...	৫২৬
ত্যাঁদড়ের ভবিষ্যনিষ্ঠা	...	৫২৭
গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিশ্বরূপ	...	৫২৮
ভূমিকা	...	৫২৯

বিষয়		পত্রাঙ্ক
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়		
মনে মনে	...	৫৩০
মোহিতলাল মজুমদার		
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	...	৫৩৪
নলিনীকান্ত গুপ্ত		
নব্য কাব্য	...	৫৩৬
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়		
বের্লিন	...	৫৩৮
চীনা থিয়েটার	...	৫৪২
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
অরণ্যের সৌন্দর্য্য	...	৫৪৬
॥ পরিশিষ্ট ॥		
নরনারায়ণে [মল্লদেব] র পত্র	...	৫৪৯
দলিল	...	৫৪৯
পত্র	...	৫৫০
পত্র	...	৫৫১
কুঞ্জনির্ণয়	...	৫৫১
রাজনগর-রাজ প্রদত্ত সনন্দ	...	৫৫২
পত্র	...	৫৫৩
পত্র	...	৫৫৩
পত্র	...	৫৫৪
সাধননিরূপণ	...	৫৫৭
চিঠি (আহোম)	...	৫৫৭
চিঠি (কাছাড়)	...	৫৫৯
চিঠি (মণিপুর)	...	৫৫৯
মনোএল্-দা-আস্সুম্পসাম		
রাখালের কাহিনী	..	৫৬০
লোভের পরিণাম	...	৫৬১
দোম্ আন্তোনিও		
ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ	...	৫৬২
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন		
আসামের রাজ্য বিবরণ	...	৫৬৪

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

বাংলা গদ্যরীতির একশ-চল্লিশ বৎসর

বাংলা গদ্যসাহিত্য উদ্ভবের ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি বিস্ময়কর। যাঁরা কোনকালে বাংলাভাষার চর্চা করেন নি, করবেন এমন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, অনেকে হয়তো বা মনে মনে বাংলা ভাষাকে 'ভাষা'-মাত্র জ্ঞানে অবজ্ঞা করতেন, হঠাৎ একদিন ভবিতব্যের ইঙ্গিতে তাঁদেরই উপরে বাংলা গদ্যসাহিত্য গড়ে তুলবার ভার পড়ল। রাজাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, তন্মধ্যে বাঙালী পণ্ডিত ও মুন্সী ছিলেন, আর ছিলেন বিদেশী ইংরেজ, বাংলা গদ্যসাহিত্য গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করলেন। যাত্রা তো সুরু হল কিন্তু পথেরই যে অভাব! তখন এঁদের একাধারে পথিকৃতের ও পথিকের দায়িত্ব বহন করতে হল, কেবল বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনা করলে চলবে না, রচনার পথটাও তৈরি করতে হবে, অভিধান ও ব্যাকরণের সাঁকো তৈরি করে দুর্গম নদীনালা উত্তরণ করতে হবে। দায়িত্বের কঠোরতায় ভীত না হয়ে এই দুঃসাহসী লেখক গোষ্ঠী অগ্রসর হতে লাগলেন, যেখানে পথ ছিল না সেখানে পথের রেখা দেখা দিতে লাগল। আজকার দিনে আমাদের চোখে সে পথটাকে বন্ধুর ও সঙ্কীর্ণ মনে হতে পারে, মনে হতে পারে তা বাংলা গদ্যের রাজরথের চলাচলের অযোগ্য, মনে হতে পারে তা গ্রাম্য পথিক বা বড় জোর গোরুর গাড়ীর যোগ্য। কিন্তু তখন যে ভাবে স্বল্প আয়োজনে এই উদ্যমের সূত্রপাত হয় মনে করলে আদৌ যে কিছু সম্ভব হয়েছিল তাতেই বিস্ময় উদ্রেক করে। এমন কুইকসোটিক (quixotic) সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে কেউ বিস্মিত হত না। কিন্তু ঠিক হিসাবের বিপরীত কাণ্ডটি ঘটে গেল—বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা খসড়া গড়ে উঠল। শুধু তাই কি, কী প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ছিল বাংলা ভাষার মধ্যে! বিদেশী ছাত্রদের দাঁতনকাঠি যোগাবার আশায় সরকারী অফিসসংলগ্ন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে যে কয়েকটি চারা গাছ রোপিত হয়েছিল অচিরকাল মধ্যে বুঝতে পারা গেল সেগুলি শিশুবনস্পতি। কোথায় পিছনে পড়ে রইল নবাগত বিদেশী সিভিলিয়ানদের পাঠ্যপুস্তক যোগাবার মূল উদ্দেশ্য, প্রমাণ হল দূরদর্শী ওয়েলেসলির

অদূরদর্শিতা। বস্তু পরবর্ত্তীকালে যে বাংলা সাহিত্য ভারত থেকে বৃটিশ-শক্তিকে বিদায় করে দেবার অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে জবরদস্ত লাটসাহেব নিজের অজ্ঞাতসারে স্বহস্তে তারই গদ্য শাখার পত্তন করে দিলেন।

"প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগত হইয়া এমত ২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জাপ্রযুক্ত, প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে ২ পিতা ও খুল্লতাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব।"*

"আর ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে।…আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয় তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।…এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মনির্ভরতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছে।"†

রামরাম বসুর পাঠ্যপুস্তকের অনভ্যস্ত দ্বিধাগ্রস্ত কলমের ভাষা মহাকবির হাতে বজ্রগম্ভীর ভেরীধ্বনিতে বৃটিশ শাসনযুগের উপসংহার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়েছে।

১৮০১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি আমাদের আলোচনার এলাকা। ১৮০১ সালে বাঙালীর লেখা বাংলা গদ্য পুস্তকের প্রথম প্রকাশ আর ১৯৪১ সালে বাংলা সাহিত্যের, গদ্য ও পদ্য দুয়েরই, মহত্তম লেখকের দেহাবসান। দু দিকেই সীমানা নির্দেশ করবার মত ঘটনা সন্দেহ নাই, মাঝখানে একশচল্লিশ বৎসর। এ বইখানার মূল নাম বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক বটে, উপনাম বাংলা গদ্যরীতির একশচল্লিশ বৎসর। আমরা যথাসাধ্য এই একশচল্লিশ বৎসরের লিখিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবরণ দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বইখানার ছক সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য সেরে নেওয়া যেতে পারে।

* রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র : রামরাম বসু : ১৮০১

† সভ্যতার সঙ্কট : রবীন্দ্রনাথ : ১৯৪১

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস। ইতিহাস গ্রন্থের দুটি অংশ, এক বিবৃতি, আর উদাহরণ। সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে ও দুটি জড়িত হয়ে থাকে, বিবৃতি থেকে উদাহরণ, উদাহরণ থেকে বিবৃতি এইভাবে চলে। এখানে আমরা একটু স্বতন্ত্রপন্থা অবলম্বন করে বিবৃতি ও উদাহরণকে দুই ভিন্ন কোঠায় স্থান দিয়েছি। বিবৃতি অংশ এই আমরা যা লিখছি আর উদাহরণ অংশ হয়েছে পরবর্ত্তী অংশে মুদ্রিত। এমন করবার দুটি কারণ। বাংলা গদ্যের ইতিহাস অনেকগুলি লিখিত হয়েছে, সে সব গ্রন্থে বিবৃতি ও উদাহরণ দুই-ই আছে, স্বভাবতই বিবৃতির অংশ অধিক, উদাহরণের যে অপ্রাচুর্য্য এমনও নয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস একটু বিবেচনার সঙ্গে বিষয়বৈচিত্র্য, ও রীতিবৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে উদাহরণগুলি যদি নির্ব্বাচিত হয়, আর সেগুলি কালানুক্রমিক সজ্জিত হয়, তবে বিবৃতি ছাড়াই বা নামে মাত্র বিবৃতির সহায়তায় মনোযোগী পাঠক বাংলা গদ্যসাহিত্যের গতি ও বিবর্ত্তন বুঝতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে উদাহরণগুলির নিজস্ব মূল্য আছে, বিবরণকে মুখ্য করে তুললে সে মূল্যের অপহ্নব ঘটে। সাধারণতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে বিবৃতি এগিয়ে চলে, উদাহরণ তল্পিবাহক। এক্ষেত্রে আমরা বিপরীত পন্থা গ্রহণ করেছি। উদাহরণকে আগে পথ ছেড়ে দিয়েছি, আমাদের বিবৃতি তল্পিবাহকমাত্র। বাংলা গদ্যের ইতিহাসকথন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এমন কি প্রধান উদ্দেশ্যও নয়, বাংলা গদ্যের বিচিত্র রসের পরিচয় দানই প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যের কালানুক্রমিক বিবর্ত্তন প্রদর্শনের ইচ্ছাটাও জড়িত। একশচল্লিশ বছর ধরে যে দীর্ঘ পথ বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক বহন করছে সেটাই আমরা দেখাতে চাই, সেই কাজ করতে গিয়ে আশেপাশে যদি বর্ত্তমান সম্পাদকদের পদাঙ্ক পড়ে, তবে তাকে অপরিহার্য্য বিড়ম্বনা মনে করা ছাড়া উপায় নেই। তবে চক্ষুষ্মান পাঠক এ দুই পদাঙ্কের প্রভেদ অনায়াসে বুঝতে পারবেন, কাজেই বিভ্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে মনে হয় না। উদাহরণ নির্ব্বাচনে আমরা নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

লেখকের জন্মসাল-সূত্রে কালানুক্রমিক অংশগুলি সজ্জিত হয়েছে।

প্রয়োজন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ গদ্যরীতির বৈচিত্র্য ও বিবর্ত্তন দেখাবার উদ্দেশ্যে এক লেখকের রচনা থেকে একাধিক উদাহরণ গৃহীত হয়েছে।

আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উদাহরণগুলি সংগৃহীত

হয়েছে সত্য কিন্তু অনেক সময়েই গদ্যরীতির বিকাশ দেখাবার উদ্দেশ্যে এ নিয়ম লঙ্ঘন করতে হয়েছে।

বোধ করি কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র রচনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যেখানে রচনারীতি প্রদর্শন প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র রচনার উদ্ধার সেখানে অনাবশ্যক ; তবে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি যে খণ্ডিত হওয়ার ফলে রসের হানি যেন না ঘটে।

আরও একটি কথা। বাংলা গদ্যের প্রধান লেখকদের সঙ্গে এমন অনেক লেখকের গদ্য সঙ্কলিত হয়েছে কি ইতিহাসের বিচারে কি রসের বিচারে যাঁরা আদৌ উল্লেখযোগ্য নন। একটি নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হলে অনেক স্বল্প-শক্তিমান লেখক সেই রীতি সাধারণের মধ্যে বিস্তার সাধনে চেষ্টা করেন—এঁরা যেন রীতিপ্রবর্ত্তনেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই কারণেই এঁরা সাহিত্যের ইতিহাসে তথা বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থানলাভের অধিকারী।

গত একশচল্লিশ বছরের একাশি জন লেখকের ২০২টি উদাহরণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।*

এই গৌরচন্দ্রিকা শুনে হঠাৎ মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে আমরা বুঝি ১৮০১ সালকেই, যখন বাঙালীর লিখিত গদ্যগ্রন্থ প্রথমে মুদ্রিত হল, বাংলা গদ্যের স্ত্রপাত বলে ধরে নিয়েছি। বলা বাহুল্য এমন অবাস্তব ধারণা আমাদের নেই। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সঙ্কট মানচিত্রকারের সঙ্কটের অনুরূপ। মানচিত্রকার নদীর ছবি আঁকতে বসে সমুদ্রসঙ্গম থেকে উজানে চলতে চলতে এক সময়ে পর্ব্বতে গিয়ে পৌঁছয়, তার পরেই সঙ্কট সুরু হয়। গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার আনুষ্ঠানিক স্ত্রপাত স্বীকার করলেও তথ্য দুর্গমতর শিখরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে থাকে, যেখানে জাহ্নবী তুষার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে শিখরমালার চিহ্নহীন সঙ্কটে উধাও হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার মূল অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক ইচ্ছা করলে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও বিষ্ণুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত যেতে পারেন—ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কাজ চালাবার জন্যে তাকে একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে নিতে হয়। গঙ্গার পক্ষে গঙ্গোত্রী সেই সীমা, আমাদের পক্ষে কাজ চালাবার সীমা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রচেষ্টা।

* পরিশিষ্টের উদাহরণগুলি ধরিনি। সংবাদপত্রের প্রতিটি নিদর্শনের জন্যে এক এক লেখক ধরেছি।

বাঙালী চিরকাল কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা এমন কি কলহ-মারামারিতে গদ্য ব্যবহার করে আসছে, কেউ সেসব পত্রপুটে ধরে রাখেনি, কোন দেশেই কেউ বড় ধরে রাখে না। কিন্তু এখানেই হচ্ছে বাংলা গদ্যের আসল ভিত্তি—বাঙালীর মুখের কথা। ঐ সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে বাংলা গদ্যের কিছু কিছু লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, বৈষ্ণব কড়চায় আর পরবর্ত্তীকালের বিদেশী খ্রীষ্টানগণ লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থে।

মোটের উপরে বলতে পারা যায় যে ১৮০১ সালের আগে এই হচ্ছে গিয়ে বাংলা গদ্যের রূপ ও পরিচয়। এখন এই সব নিদর্শন নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রায় সমস্ত উপাদান উপস্থিত আছে। শব্দাবলী বিশ্লেষণে পাবো সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশী, আর আরবী ফারসী শব্দ ; পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের পাবো সমস্ত রকম রূপ ; আর বাংলা বাক্য গঠনের যে স্বাভাবিক বিন্যাস, প্রথমে কর্ত্তা, মধ্যে কর্ম্ম, সর্ব্বশেষে ক্রিয়া—তাও এসব উদাহরণে বেশ স্পষ্ট। কেবল খ্রীষ্টান রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ এর ব্যতিক্রম। বাক্যবিন্যাস সর্ব্বত্র বাংলাভাষার নিয়মানুযায়ী নয়। এখন এটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলে স্বীকার করতে আপত্তি থাকে না যে ১৮০১ সালের পরে যে গদ্যসাহিত্য আমরা পাই তার প্রায় সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত গদ্যের নমুনাগুলোর মধ্যে। তবু যে ১৮০১ সাল থেকে গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব বলে ধরেছি তার একটা কারণ আগেই বলেছি—কাজের সুবিধে। দ্বিতীয় কারণ, আগের নমুনাগুলো শুধুই গদ্য আর পরবর্ত্তী নমুনাগুলো গদ্য-সাহিত্য। বিষয়টি বিশদভাবে বলবার আগে বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে কিছু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

অহোমরাজকে লিখিত নরনারায়ণের (মল্লদেবের) পত্র—

(১) লেখনং কার্য্যঞ্চ [।] এথা আমার কুশল [।] তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি [।] অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে [।] তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক [।] আমরা সেই উদ্যোগতে আছি [।] তোমারো এ-গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় [।] না কর তাক আপনে জান [।] অধিক কি লেখিম [।] সতানন্দ কর্ম্মী [,] রামেশ্বর শর্ম্মা [,] কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার [,] উদ্ভণ্ড চাউনিয়া [,] শ্যামরাই [,] ইমরাক

পাঠাইতেছি [।] তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা [।] [রচনাকাল, ১৫৫৫]

এ একখানি জয়পত্র—

(২) পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকীয়া সধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনার গ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্ম অধীকারি ও বৈরাগীবৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবৎসাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তি সাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্যাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয় মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্যাচার্য্য বিচারে পরাভুত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমরাও দিলাম···ইত্যাদি। [রচনাকাল, ১৭৩০]

এখানি একখানি সাধারণ পত্র—

(৩) তোমার বাড়ির আমার বাড়ির সংবাদ বিবরিয়া লেখিবেন আর ঘরের বিষয় সকল সৌষ্ঠব করিআ থাকিবেন আমার এখানে কিছু মাত্র নাই বাসা খরচ হয় না কজ্জতে মদাব এই শ্রীমতি দীদী ঠাকুরাণির স্থানে ৭ সাতটি টাকা লইয়া দেবে বাড়া নাগে তাহা করিবেন অবস্য অবস্য রামহরিদিগের টাকা দিবে নাই রামহরিদের খাবার খরচ উশাড়ি গ্রামে চালু ১৯ সলি ১০ সাড়ে শ্রীবিশ্বনাথ আচার্য্য স্থানে আছে শ্রীরামনাথ শর্ম্মাকে লইয়া আসিবেন শ্রাবণ নাগাদি অগ্রহায়ণ পর্য্যঞ্চ হইবেক আমার এখানে নাই জে খাবেন পুনশ্চ লিখি গোয়ালন্দের ঔষধ দুই সপ্তাহ চতুর্মুখ পাঠাই মধুতে ঘসিয়া পিপ্‌পলী চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে কহিবেন। [রচনাকাল, ১৭৪১]

বৈষ্ণব কড়চা—

(৪) রাধাকুণ্ডের উত্তরে ললিতাজিউর কুঞ্জ। তার অষ্টদিগে অষ্টসখির

কুঞ্জ। মধ্যে এক কুঞ্জ নাম কন্দর্প কুহুলি। তার মধ্যে চম্পক বৃক্ষ আছে নানা রত্নে মূল বান্ধা। তার ছয় কোন বেদিঃ উপরে চান্দয়া নানা জাতি রত্নে জড়িত বস্ত্রে ঝলমল করে। নানা পুষ্প গুচ্ছ তাহাতে দুলিতেছে। মধ্যে রত্ন পালঙ্কঃ নানাপুষ্প সর্য্যাতে। বিরচিত তার চতুর্দিগে নানা সামগৃ পরিপূর্ন। তার মধ্যে কিসোর কিসোরীকে বৈসাইঞা নানা সেবা নর্ম্ম সখিগণ করেন। [রচনাকাল, ১৭৬৪]

বৈষ্ণব কড়চা—

(৫) চন্দন সেবা চারিমত হয়॥ গোপী চন্দন॥ ১ ॥ শ্যামচন্দন॥ ২ ॥ অরক্ত চন্দন॥ ৩॥ কস্তুরি চন্দন ॥ ৪ ॥ মালা পঞ্চ ॥ গুঞ্জা মালা ॥ ১ ॥ ধাত্রি॥ ২ ॥ পট্টডোর॥ ৩॥ শ্যামবর্দ্ধনি ॥ ৪ ॥ তুলুশী॥ ৫॥ এই পঞ্চমালা ধ্যান করিবে॥ তৈলমর্দ্দন ত্যাগ॥ আলিশ ত্যাগ ॥ স্ত্রীশঙ্গ ত্যাগ॥ আশুক্তি দুর॥ বিশয় ত্যাগ॥ এই তিন কুর্য্যাত॥ [রচনাকাল, ১৭৯২]

এই পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে পঞ্চমটিকে হয়তো অনেকে গদ্যের নমুনা বলে স্বীকার করতে চাইবেন না, বলবেন ও কেবল 'নোট' মাত্র, নিতান্তই ইঙ্গিতে টুকে রাখা। সত্যই এ পুরো গদ্য নয়, নোট বা টুকে রাখা মাত্র, কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন 'ধ্যান করিবে'—পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে, বাক্যটি আর নোট নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। শেষের বাক্যটি 'এই তিন কুর্য্যাত,' লক্ষ্য করবার মতো। এখনকার দিনে ইংরেজি-জানা লোকে যেমন কথার মুখে অনেক সময় বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এ তারই অনুরূপ, কেবল ইংরেজির বদলে সংস্কৃত ক্রিয়াপদ 'কুর্য্যাত'। অংশটিকে গদ্যের এক প্রকার নমুনা বলেই ধরা উচিত।

দ্বিতীয় নমুনাটি শাস্ত্রীয় বিচারের জয়পত্র। পত্রের মধ্যে কিছু কিছু আরবী ফারসী শব্দ আছে। যেমন, 'পাতশাহি', 'মনসবদার' 'ইস্তফা,' 'গুণাগার,'—ইত্যাদি। বিষয়টি শাস্ত্রীয়, লেখকগণও পণ্ডিত তবু প্রয়োজন-স্থলে তাঁরা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হননি। শাস্ত্রে পরকীয়াবাদ স্বীকারের পরে ভাষায় পরকীয়াবাদ অস্বীকার করবার হেতু বোধ করি তাঁরা খুঁজে পাননি।

তৃতীয় নমুনাটি নিতান্তই ঘরোয়া। ঘরের কথার সেরা কথা খরচের টানাটানি, আর "গোয়ালন্দের ঔষধ দুই সপ্তাহ চতুর্মুখ পাঠাই মধুতে ঘসিয়া পিপ্পলী চুর্ন্ন প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে কহিবেন"—সমস্তই আছে। একটি

বিদেশী শব্দও আছে 'নাগাদি'। প্রথম নমুনার 'ফলিত' ও তৃতীয় নমুনার 'বিবরিয়া' শব্দ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন আমরা পুষ্পিত বলি কিন্তু ফলবান অর্থে 'ফলিত' বলি না। অবশ্য ফলিত শব্দটি এখনো প্রচলিত আছে তবে ভিন্ন অর্থে। ফলবান অর্থে 'ফলিত' শব্দটির লোপে ভাষার ঐশ্বর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তৃতীয় নমুনার 'বিবরণ দান করিয়া' বা 'বিবরণদান পূর্ব্বক' অর্থে 'বিবরিয়া' অধিকতর সুপ্রয়োগ। পরবর্ত্তীকালের গদ্য নামধাতুকে তেমন প্রশ্রয় না দেওয়ায় ভাষার শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এবারে আর এক শ্রেণীর গদ্যের কয়েকটি নমুনা উদ্ধার করছি।

(৬) কাজী হাফেজ মহাম্মদ আরজী হইল জাহের করিলক যে পরগণে জয়দুজাল দরুন মোজে কোকা ও ঘোষবাটী জমা খারিজে বঞ্জর ১৪ চৰ্দ্দ বিঘা বাগ লাগাইতে হুকুম হইয়াছে কোকাতে ১৮ বিঘা ঘোড়াচাতেও তিন বিঘা পরআনা ১১৩৩ সাল ৭৮ দাগে হইয়াছে তাহাতে ঘোষকার প্রজারা ও মোড্যাচার প্রজারা আরজী হইল জে আমাদের গরু চরাইতে আর জানা নাই—ইত্যাদি। [রচনাকাল, ১৭২৬]

(৭) আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের গোপিনাথ শর্ম্মা ও রামজীউ শর্ম্মা ও লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা ও জয়চন্দ্র শর্ম্মা ও রাজ্জিশ্বর শর্ম্মা জাহির করিলা যে—উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর—দেবত্তর—মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুর—সাবীক বীররাজার দত্ত৺বক্রেশ্বর নাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবত্তর মুদ্দ্‌ৎ পুরুষ ২ হইতে ৺জীয়ের সেবাপূজা করিয়া দখলিকার আছে বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে এক্ষণ বক্রেশ্বর মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গামা করে এজন্য দরখাস্ত করি—ইত্যাদি। [রচনাকাল, ১৭৬৫]

(৮) স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সত্রুসমুহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাব হুজুর সুনতানও ওইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজীমঃসান শীপাহছালার আফুআজ বাদশাহি ও কম্পনী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ লাট করনওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্রপ্রতাপেষু—ইত্যাদি। [রচনাকাল, ১৭৮৭]

(৯) সেমতে জেল্লার সাহেব ইস্তাহারনামা দিয়াছেন যে তুমি জতো তকঃশীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসের মেআদে

খালিসাতে কিম্বা জিলার সাহেবের নিকট হাজির হও।—ইত্যাদি। [রচনাকাল, ১৭৮৮]

(১০) অত্রানন্দ বিশেষঃ মাঙ্গরাজ হইতে হইতে জয়ি হইয়া কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন এ শুস্বংবাদে পরমাপ্যাইত হইলাম ৶ সর্ব্বত্র জয়ি করিতেছেন করিবেন অপর এথাকার সমাচার সমস্ত গোচর আছে আমার তরফ শ্রীজানকীরাম সরকার উকীল পূর্ব্বাবধি হুজুরে হাজির আছে।—ইত্যাদি।

৬ থেকে ১০ সংখ্যক নমুনাগুলোর মধ্যে অজস্র আরবী ফারসী শব্দ, প্রয়োজনের তাগিদে এমন জুটেছে, সমস্ত চিঠিই রাজসরকারে লিখিত, বিষয় হচ্ছে আইন আদালত ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত। তবে পত্রলেখকভেদে কখনো কখনো সামান্য ইতর বিশেষ আছে, যেমন ১০ সংখ্যক নমুনায় বিদেশী শব্দ অল্প। এ রীতির ভেদ নয়, লেখকের কলমের ভেদ। ৮ সংখ্যক পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসীর সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিলন ঘটেছে, বেশ বুঝতে পারা যায় জাতি-ইতিহাসে নূতন উপাদানরূপে এসে পড়েছে ইংরেজ সরকার। এ পর্য্যন্ত সমস্যা ছিল সংস্কৃত বাংলা ও ফারসী শব্দ মিলিয়ে গদ্যের একটা আদালতী রীতি তৈরি করে তোলা, এবারে তার মধ্যে নূতন উপাদান এসে পড়লো ইংরেজি। এ সমস্যাটা পরবর্ত্তীকালে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, এখন পর্য্যন্ত সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে মনে করা চলে না। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮, ৯, ১০ সংখ্যক নমুনাগুলো গৃহীত হয়েছে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন নামে গ্রন্থ থেকে,* পরে আরো ২।১ খানি পত্র গৃহীত হবে এই বইখানা থেকেই। বাংলাদেশের পূর্ব্বপ্রত্যন্ত-সীমায় কুচবিহার, আসাম, কাছাড়, মনিপুর প্রভৃতি যে-সব স্বাধীন রাজ্য ছিল তাদেরই সরকারী দপ্তর থেকে কলকাতার কোম্পানীর দপ্তরে এই সমস্ত চিঠিপত্র লিখিত। এই সমস্ত চিঠিপত্র বাংলাভাষায় লিখিত। ঐ সব রাজ্যের সবগুলোর ভাষা বাংলা ছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে পত্রাপত্রি ইংরেজি ভাষাতেও হতে পারতো, কিন্তু

* ৬, ৭, সংখ্যক নমুনাগুলো শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

তখন ইংরেজিনবিস পাওয়া সহজ ছিল না, কাজেই বাংলাভাষা ও বাঙালী সরকার, উকীল, মুন্সী প্রভৃতির শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এইভাবে তখনকার দিনে বাংলাভাষা পূর্ব্বভারতের অন্যতর সরকারী ভাষা হয়ে উঠেছিল।

এ পর্য্যন্ত গদ্যরীতির দুটো খসড়া পাওয়া গেল। একটিতে আরবী ফারসীর অজস্র মিশল, সেই সঙ্গে দেখা দিচ্ছে ইংরেজি শব্দের প্রাদুর্ভাব আর অন্যটিতে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য, সামান্য বিদেশী শব্দ আছে বটে কিন্তু তা কুণ্ঠিত কলমের কৃপণতার দান। এবারে প্রাচীন গদ্যরীতি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

"আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাঙ্গালা প্রচলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দু মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহুসংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দু ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালী-ওয়ালারা এই ভাষায় গীতি বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক এই তিন দশ লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।...কথক মহাশয়েরা বহুকালাবধি বাঙ্গালায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃত ব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ীলোকের ভাষা। কেবল জমকালো বর্ণনা স্থলে ও সংস্কৃতশ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতী ভাষার অনুসরণ করিতেন।"*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাষার উদাহরণ দেন নাই। আগেই বলেছি সেকালের ভাষার নমুনা কেউ ধরে রাখেনি। কিন্তু আমরা যে নমুনা সংগ্রহ করেছি তার ১ম থেকে ৫ম সংখ্যক অবধি কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভাষার নমুনা বলে গ্রহণ করা যায় না, আর ষষ্ঠ থেকে দশম সংখ্যক অবধি আদালতের লোকের ভাষার নমুনা বলে! কেবল তফাতের মধ্যে এখানে উক্ত ভাষার লক্ষ্য নবাব ও ওমরাহ নয়, তৎস্থলাভিষিক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবসুবাগণ।

* বাঙ্গালা ভাষা : হরপ্রসাদ রচনাবলী : পৃঃ ১৯৯-২০০

কিন্তু বিষয়ী লোকের ভাষার নমুনা কোথায় পাবো ? এ ভাষার নমুনা সংগ্রহ দুর্ঘট হলেও খুব সম্ভব অসম্ভব নয়। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনের যে পত্রখানির কিয়দংশ এখন উদ্ধার করতে যাচ্ছি খুব সম্ভব তা হচ্ছে শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণিত বিষয়ী লোকের ভাষা।

"...শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তস্য পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি বাঙ্গালার কলিকাতা সহরের সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায় ৫০০ পাঁচ সত গরিব জাহারা কানা খোড়া অতুর অচল ও পুঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ অনাথা পিতামাতাহিন ও পতিপুত্রবিহিন শক্তিরহিত শ্রম করিয়া আত্মভরণপোষণ করিতে অযোগ্য সর্ব্বদা সহরের রাস্থাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে যাহাদ্দিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চপেটে ও অন্য ২ অসগ্দতিতে তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদার-ফরাস আসিযা স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয় ইহাতে যে যেমত জাতি সাস্ত্রসম্মত গতি হয়না এই অনাহুত অনাথা জিবের প্রাণরক্ষার কারণ যদি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরল বাহাদুর সাহেবের অনুগ্রহ হয় ঐ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখ বিমোচণ করেন তবে ইহাতে অত্যন্ত পুণ্য প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগত সংসারে থাকিবেক একারণ আমরা এ সকল গরিব লোকের দুঃখ দুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জন্যে বিস্তারিত দফাওয়ারিতে আপনাদ্দের বুদ্ধিক্রমে নিচে লিখিতেছি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরল বাহাদুরের ও সহরের বাসিন্দাদ্দিগের জ্ঞাতসার কারণ আমরা এক সন এক মহরির রাখিয়া এই সহরের গলি ও রাস্তার ঐ সকল অক্ষেম লোকের তালিক করিয়াছিলাম তাহাতে একসনের তালিকা চারিসত চৌসাট্ট লোক...

"...১৮ অষ্টাদশ। যেমন কলিকাতার নতুন গিরিজার খরচ মাথট্ট করিয়া হইয়াছে ইণ্ডষ্টরি বাটী বনাইবার খরচ সেইরূপ. মাথট্ট হইয়া হইবেক কিন্তু ইহার আমাদ্দিগের দেসের দস্তুরমত জদি সাহেবেরা মাথট্টের এক নিয়ম করিয়া দেন তবে অতি ত্বরায় এ জায়গা বনাইবার টাকা মজুত হইতে পারে তাহার নিয়ম এই কমোবেষ লাক টাকা খরচ হইলে বাটী ইহার লওাজিমা স্থান তৈয়ার হইবেক ইহার আনেয়োন কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি চাকর-হায়ের উপর ইহাদ্দিগের পায়া কিম্বা খেদমত মাফিক এবং সহরের কোম্পানীর চাকর সেওায় পাকা হাবেলিওয়ালা বাসিন্দার উপর এক নিরিখ

মকরর করিয়া দেন সরকারের খাচাঞ্চি ও পুলিস আফিসের দ্বারা এ টাকা আদায় হয় এমত হইলে অতি শীঘ্র টাকা আদায় হইয়া বাটী তৈয়ার হইতে পারে সহরের গলি ও রাস্তা হইতে এ সকল অক্ষেম গরিব অন্যত্রে স্থাপিত হইলে সহরের লোকের অনেক প্রকার আরাম হইবেক মোছলমানের আমল অবধি এ সকল ধারা বন্দ হইয়াছে পুর্ব্বে হিন্দুর আমলে এমতরূপ গরিবের জন্যে স্থান ও ইহার ব্যয় নিরোপন ছিল মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে এই স্থানের নাম অনাথমণ্ডপ ছিল এখন সেইমত নিয়ম বিলাতেও আছে শুনিতে পাই—

"গরিব বাঙ্গালি লোকের দুঃখ বিমোচন কারণ এবং তাহাদ্দিগের সুখতপত্তি নিমিত্যে যে নকসা আমরা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত গৌরনর জানরেল কণ্ডসলে জ্ঞাত করিতেছি ইহাতে কোনো বিষয়ে আমাদ্দিগের বিবেচনার ও লিখিবার ক্রুটী ও ভুল হইয়া থাকে তাহার যাহাতে ভাল হয় সাহেবেরা বিবেচনা করিবেন এ বিষয় সম্পূর্ন্ন কারণ আমাদ্দিগে হইতে মেহনত ও তরদ্দুদ যে তক দরকার হইবেক তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি এজন্যে বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১১৯৪ সাল—তেরিখ—:৫ আশাড়—"*

খুব সম্ভব এই হচ্ছে তৎকালীন শিষ্ট সমাজের ভাষা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন বিষয়ী লোকের ভাষা। এতে ফারসী, বাংলা, সংস্কৃত (এবং ইংরেজি) সমস্ত মিশল ঘটেছে আর কোন একটা দিকে ঝোঁক না থাকায় ভারসাম্য ঘটে আগের নমুনাগুলোর চেয়ে সরল ও সুবোধ্য হয়ে উঠেছে। আরও একটি কথা: পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের অনেকের ভাষার চেয়ে এ ভাষা সরলতর।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এবারে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের এদিকে ওদিকে দেখা দিল ইউরোপীয়গণের লিখিত বাংলা ভাষা। তাতে বাংলা গদ্যের আর এক চেহারা পাওয়া গেল, এখানে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদে'র ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হল।

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপিনা; অথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা

* প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন: ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত: পত্রসংখ্যা ১৬৯।

করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।*

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'-র লেখকের জাতি পরিচয় ও সময় পরিচয় সম্বন্ধে বিতর্ক আছে কিন্তু রচনাভঙ্গী বিতর্কাতীত অর্থাৎ তা সাহেবী বাংলায় লিখিত।

ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ।†

এই সব সাহেবী বাংলার রূপে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এখানে বাংলা গদ্যরীতির স্বাভাবিক বিন্যাসের ওলটপালট হয়ে গিয়েছে আর এসেছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কমা, সেমিকোলন, কোলন প্রভৃতি যতিচিহ্ন। দুটিই পেয়েছে পরবর্ত্তী গদ্যসাহিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে। এই সব লেখক যখন বাংলা লিখছিলেন তাঁদের মনে অগোচরে কাজ করছিল ইউরোপীয় গদ্যের বাক্যগঠন বিন্যাস। পরবর্ত্তীকালের শক্তিমান লেখকগণও এ প্রভাব থেকে মুক্ত নন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অনেক সময়েই সচেতনভাবে ইংরেজি বাক্যগঠন বিন্যাসকে অনুসরণ করেছেন। এর ভালো মন্দ দুই দিক আছে। প্রতিভাবানের হাতে যা বাংলা গদ্যের শক্তি বৃদ্ধির হেতু, আনাড়ির হাতে তাই বিড়ম্বনা, অনেক সময়ে তাদের ভাষা মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ না করে নিলে বুঝতে অসুবিধা হয়। আর সাহেবী বাংলার বিরামচিহ্নাদি তো বহুকাল হল বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, বাঙালী লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই বোধ হয় প্রথমে এদের যথাযোগ্য-ভাবে কাজে লাগান।

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম

* বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ: শ্রীসজনীকান্ত দাস: পৃ: ১৮।

† বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ: শ্রীসজনীকান্ত দাস: পৃ: ১৮।

কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হওয়ার আগেই ছিল বাংলা গদ্য, বাঙালীর মুখে আর বাঙালীর কলমে। পাওয়া গেল বাংলা গদ্যরীতির তিনটি দেশী খসড়া, আর একটি সাহেবী খসড়া*। চারটি রীতিই রূপান্তরিত হতে হতে পরবর্তী গদ্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। আর পাওয়া গেল বিচিত্র শব্দ সম্ভার: সংস্কৃত, সংস্কৃতজ, দেশী, বিদেশী, বিদেশীর মধ্যে আবার নূতন চালান ইংরেজি। শব্দ সম্ভারের বৈচিত্র্য ও বৈষম্য বাংলা ভাষার একাধারে প্রধান ঐশ্বর্য্য ও প্রধান সঙ্কট। প্রতিভাবানের হাতে যা সহস্র-তার বীণা, আনাড়ির হাতে তা যষ্টি খণ্ড মাত্র। †

---

* সাহেবী বাংলার আরো কিছু নিদর্শন উদ্ধার করে দেওয়া গেল—সর্ব্বত্র বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করবার মতো।

(১) শিক্ষাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালী বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি শিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

ইহার মূলের কিয়দংশ—The Tutor or a New English and Bengalee Work, well adapted to teach the Natives English in three Parts.

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ: শ্রীসজনীকান্ত দাস: পৃ: ৩৬-৩৭।

(২) আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়েব সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ: শ্রীসজনীকান্ত দাস: পৃ: ৩৭।

(৩) গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অরম, তখন [এপ্রিল, ১৭৮৮]

Now the wages of sin is death…But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord.

(৭) বাহিরে আইস আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।

"Forth come and separate be: and unclean thing touch not: and I accept will you: and you shall be sons and daughters: thus says the Almighty God."

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ: শ্রীসজনীকান্ত দাস: পৃ: ৬৭।

† প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে ফরাসী ভাষার সমধর্ম্মী কেন বলেছেন জানি না। আমার তো মনে হয় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা

আরও পাওয়া গেল পরবর্ত্তীকালের তথাকথিত সাধু গদ্যে ব্যবহৃত পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের সমস্ত ও বিচিত্র রূপ। আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে গদ্যরীতির খসড়া, শব্দাবলীর বৈচিত্র্য, পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ ও বিরাম চিহ্ন অর্থাৎ যা নিয়ে নাকি গদ্যসাহিত্য গঠিত হয় তার সমস্তই পেলাম উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে। এবারে পূর্ব্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য ও সমস্যাগুলো গ্রহণ করে উনবিংশ শতক আরম্ভ করলো গদ্যসাহিত্য রচনার কাজ একেবারে শতাব্দীর প্রারম্ভিক বৎসর ১৮০১ সালে।

কাজেই দেখা গেল যে উনবিংশ শতকের আগেকার গদ্যকে আমরা অস্বীকার করি না, বরঞ্চ তাকেই পরবর্ত্তী সমগ্র গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে সেই গদ্যকে আমরা গদ্যসাহিত্যের মর্য্যাদাদানও করিনি। আমাদের ধারণা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আমলে। এখানে একটু বিস্তার আবশ্যক। সবদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে মৌখিক ও চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজের গদ্যের ধারা চলতে চলতে নূতন কারণের সন্নিবেশে ক্রমে গদ্যসাহিত্যের রূপ ধারণ করে। আবার গদ্যসাহিত্যের ধারা চলতে চলতে কালক্রমে ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ভাষার স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে, অপরিচিত শব্দসম্ভার ক্রমে লোকায়ত্ত হয়ে ওঠে; বলা যেতে পারে বহু গুণীর হাতে সাধা হতে হতে ভাষা বীণাযন্ত্রের গুণ লাভ করে, তখন আনাড়ির পক্ষেও মধুর ঝঙ্কার তোলা আর কঠিন হয় না। তখন সেই গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। এইভাবে গদ্যের আমরা তিনটি পর্য্যায় পাই, গদ্য, গদ্যসাহিত্য আর সাহিত্যিক গদ্য।

বাংলা ভাষা ছাড়া যে ভাষা ও সাহিত্য আমাদের সকলের কাছে সুপরিচিত সেই ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। খুব সম্ভব ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংরেজিগদ্য সাহিত্য হয়ে ওঠে। তখন গুণীর হাতে—যেমন শেক্সপীয়র ও বেকনের হাতে—বীণা বেজেছে ঠিক কিন্তু আনাড়িতে হস্তক্ষেপ করলেই বীণা আর্ত্তনাদে আপত্তি জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি—তেমনি ভাষা তখনো সর্ব্বজনীন রাজপথে পরিণত হয়নি।

ভাষার মিল অনেক বেশি। বাঙালী জাতির মতোই বাংলা ভাষা বহু ও বিচিত্র উপাদানে গঠিত।

অষ্টাদশ শতকের কিছুকাল আগে ড্রাইডেনের হাতেই খুব সম্ভব এর সূচনা। এই সময় থেকে গদ্য সাহিত্যিকগদ্য হয়ে উঠলো—সর্ব্বজনের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠলো, অল্প আয়াসেই তাতে মধুর ঝঙ্কার তোলা আর অসম্ভব থাকলো না।

এখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে প্রথমেই বিস্ময় লাগে ইংরেজি সাহিত্যে যে বিবর্ত্তন আঠারো মাসে বছরের তালে গড়িয়ে গড়িয়ে দুশো বছরে ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে তা ঘটতে চার দশকের বেশি সময় নেয়নি। ১৮০১ সালে যদি গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হয়, সাহিত্যিকগদ্যের সূত্রপাত ১৮৪০ থেকে ১৮৫০-এর ঘরে—বিদ্যাসাগরের রচনা প্রকাশে। বিদ্যাসাগরের কলম গদ্যসাহিত্যকে সাহিত্যিকগদ্যে পরিণত করলো। তারপর থেকে সাহিত্যিক-গদ্য ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে সর্ব্বভাব প্রকাশক্ষম ও সর্ব্বজন ব্যবহার-যোগ্য হয়ে উঠছে। এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর কলম থেকে আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বা রামমোহনের ভাষা বের হওয়ার উপায় নেই। তার মানে এ নয় যে একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী সাহিত্যিক ক্ষমতায় মৃত্যুঞ্জয় বা রামমোহনের উপরে—তার মানে—এই যে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে ভাষারই একটা পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছে, ভাষা যেন একতলা থেকে দোতলায় উন্নীত হয়েছে। ভাষার সর্ব্বজনীন চেহারার মধ্যে যখন লেখকের চেহারা ফুটে ওঠে তখন বলি ভাষায় ষ্টাইল দেখা দিল। এ গুণ দুটো কারণে ঘটে। এক, লেখকের কলমের গুণ; দুই, ভাষার নিজস্ব গুণ। এই নিজস্ব গুণ বহু ব্যবহারের ফলে কালক্রমে ঘটে। এখনকার দিনে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় একটা প্রবন্ধেও ষ্টাইলের অভাব ঘটে না, রামমোহনের আমলে ভাষা এ গুণ লাভ করেনি। তখনকার দিনে ভাষা ছিল ঘষা কাচের মতো, লেখকের অস্পষ্ট ছায়া ধারণ করবার ক্ষমতাও তার ছিল না। রামমোহনের বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে অনুসন্ধান করতে হয় তাঁর মনীষার মধ্যে, তাঁর কর্ম্মের মধ্যে—তাঁর ভাষায় তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেই। ভাষা তখনো ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা লাভ করেনি, সে ক্ষমতা এখনকার সংবাদপত্রের ভাষাতেও অবিরল। এই ক্ষমতার সদ্ভাবেই সাহিত্যিকগদ্য বা গদ্যসাহিত্য। যখন ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো হয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সক্ষম হল তখনি সূত্রপাত হল সাহিত্যিকগদ্যের—তার আগে পর্য্যন্ত শুধু গদ্যসাহিত্য। গদ্যসাহিত্য জ্ঞানের কথা প্রকাশ করতে পারে, রসসৃষ্টিতেও সক্ষম কিন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বকে

ফুটিয়ে তোলা তার ক্ষমতার বাইরে। এই মাপকাঠিতে বিচার করেই ১৮০১-এর পরবর্তী সাহিত্য দুভাগে বিভক্ত করেছি, গদ্যসাহিত্য ও সাহিত্যিকগদ্য। আর তারও পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ শুধু গদ্য।

এখানে একটা প্রসঙ্গের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। এক সময়ে সাহিত্য বলতে বোঝাতো পদ্য, অবশ্য তার পাশে গদ্যের একটা ক্ষীণ ধারা ছিল কিন্তু তা সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত ছিল না। এখন হঠাৎ জাতিমনের ঝোঁকটা পদ্য থেকে গদ্যের উপরে পড়তে গেল কেন; আর গদ্যের উপরে সে ঝোঁক পড়তেই তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে সুরু করলো কেন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জাতিমনের আবেদন পদ্য ছেড়ে গদ্যের উপরে বইতে সুরু করবার কারণ কি? আমাদের ধারণা সমাজবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের সহজাত বাহন গদ্যসাহিত্য। পদ্য নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষা, বড় জোর একভাবে ভাবিত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ভাষা। বাল্মীকি গভীর অরণ্যে তমসার তীরে বসে রামায়ণ রচনা করতে পারেন কিম্বা এক ভাবে ভাবিত বৈষ্ণব কবিগণ পদসাহিত্য রচনা করতে পারেন। কিন্তু গদ্যের এভাবে চলবার উপায় নেই। তার পরিবেশের জন্য চাই সমাজবদ্ধ একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। খুব সম্ভব সব দেশেই গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠবার কারণ এই রকম কিছু। আমাদের দেশেও যে এই রকম তাতে সন্দেহ নেই। আজকে মধ্যবিত্ত সমাজের যে রূপ দেখছি নবাবী আমলে তা ছিল না, বলেছেন আচার্য্য যদুনাথ।*

*"Among social changes, the greatest achievement of British Administration and modern civilisation has been the creation of a middle class independent of Government service and therefore more permanent and fundamentally stronger than the *mansabdār* families of Mughal India. This class had become, by the year 1947, immensely larger in size, better educated, more influential and closer integrated with our life and government than the *āmils* and *munshis*, *faujdārs* and *dāroghas*, who formed the only middle class in the Mughal times, and who could not stand as a buffer between the autocratic baronage at the top and the helpless peasants and artisans at the bottom of Mughal Indian society. The fortunes amassed and the social standing honourably gained by our modern lawyers, physicians, engineers, and writers, were undreamt of in the Mughal times."—Fall of the Mughal Empire : ch.-51, vol. IV : Jadunath Sarkar.

আজকার মধ্যবিত্ত সমাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতন্ত্রের পরিণাম আর সেইজন্যেই এর গোড়াপত্তন হয়েছিল কলকাতা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে। এই নূতন সমাজ ও নূতন সাহিত্য এক জন্মসূত্রে গ্রথিত। বিষয়টি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরল ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—তাঁর কথা শোনা যাক।

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল।...সিবিলিয়ান্‌দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ান্‌দিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েল্‌স্‌লি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল।...বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আছন্ন হইয়া উঠিল। যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোক কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালায় অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল, ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গঙ্গার দুই ধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল। বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোক সর্ব্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাবসকল হৃদগত করিত।"*

এই প্রবন্ধটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও একটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে নবাবী আমলে সাহিত্য তথা শিক্ষা দীক্ষার আশ্রয় ছিল তিনটি, মুসলমান নবাব, জমিদার শ্রেণী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়। এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুটো লোপ পেলো, আর তৃতীয়টি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় হৃতবিত্ত হওয়ায় বিদ্যাব্যবসায় পরিত্যাগ করে "বড় মানুষের সভাশোভাবিধান করিতে

* বাঙ্গালা সাহিত্য: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ১১৭-১১৮।

লাগিলেন।" পুরাতন আমলের আশ্রয় লোপ পেল কাজেই প্রাচীন সাহিত্যের ধারাটিরও আর টিকে থাকা সম্ভব হল না। এহেন অরাজকতার মধ্যে ক্রমে সাহিত্যের নূতন আশ্রয় দেখা দিতে আরম্ভ করলো। প্রথমেই দেখা দিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর সেই সঙ্গে নূতন মধ্যবিত্ত সমাজের নীহারিকা। 'বাংলা গদ্য গড়ে তোলবার জন্যে কোম্পানীর নিজের গরজ ছিল, সেই গরজেরই একটা প্রধান প্রকাশ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। আর নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজও আত্মপ্রকাশের বাহন পরীক্ষা করছিল। কথকতা, পাঁচালী, কবিগান প্রভৃতির পরীক্ষা হল, দেখা গেল ও-সব অচল নূতন পথের যাত্রীর প্রয়োজনের পক্ষে। প্রথমে অজ্ঞাতসারে পরে জ্ঞাতসারে, প্রথমে প্রয়োজনের তাগিদে পরে প্রাণের টানে মধ্যবিত্ত সমাজ যে আত্মপ্রকাশের বাহনকে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করে নিল সেটি হচ্ছে বাংলা গদ্যসাহিত্য। যদিচ এদিকে প্রথম প্রেরণাটা জুগিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তবু অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে এ প্রেরণা না পেলেও বাংলা গদ্যসাহিত্য গড়ে উঠতোই, হয়তো এক দশক বিলম্ব হতো, হয়তো বাধা কিছু দুস্তর হতো, কিন্তু নিশ্চয় দেখা দিতো গদ্যসাহিত্য। কেন না বোবা মধ্যবিত্তসমাজ শশবিষাণের মতোই অসম্ভব। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে গদ্যসাহিত্য গড়ে উঠতে কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানীর পরোক্ষ প্রভাবটার গুরুত্ব অনেক বেশি—যে পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠেছে কলকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে নূতন ও বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

এতক্ষণ দেখা গেল যে বৃহৎ মধ্যবিত্ত সমাজের অভাবটাই হচ্ছে গদ্যের সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠবার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আরো কিছু কারণ থাকা সম্ভব। আমার মনে হয় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পয়ারের বহু প্রচলন গদ্যের দিকে সাহিত্যিকদিগের মনোযোগ না দেওয়ার একটা প্রধান কারণ। মানুষের স্বভাব এই যে পুরাতন বস্তু দিয়ে কাজ চলে গেলে নূতনের সন্ধান বড় করে না। এখন পয়ার ছন্দ দিয়েই গদ্যের কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল, কাজেই নূতন বাহনের অভাব কেউ অনুভব করেননি। বিষয়টি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধরেছেন আর সম্যক্‌ভাবে ও সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও অংশটি উদ্ধার করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

"বাংলা কাব্যে এই পয়ার-প্রাধান্য গদ্যরীতির উদ্ভবকে আধুনিককাল পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার আর একটা কারণ। সনাতনপ্রথার অনুবর্তন-কারীদের পক্ষে পয়ারের উচ্ছ্বাসহীন, নিস্তরংগপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়ার মত আরামদায়ক আর কিছু ছিল না। বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহা এমন একটা সহজ মসৃণতা লাভ করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন একটা চেষ্টাহীন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্য প্রচেষ্টা অতীতের এই কারুকার্যহীন সাধারণ ছাঁচে, যেন একটা অনিবার্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিত। পয়ারের মধ্যে পদ্যরীতির ছদ্মবেশে গদ্যরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাঁটি গদ্যের প্রয়োজনীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক, এই অতিপ্রচলিত ছন্দে গদ্য-পদ্যের এক সাম্যভাবমূলক মিলন দেখা যায়। পয়ারের প্রত্যেকটি চরণ যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সরল ভাবের unit; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাতে গদ্যের অন্বয়ের পর্যন্ত নিখুঁত অনুবর্তন বজায় আছে। আখ্যায়িকা বিবৃতি, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, বাদপ্রতিবাদ ও কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের যে সমস্ত অংগে বিশুদ্ধ কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ড খুব উচ্চ না হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহার উপযোগিতা অসাধারণ।…

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহিরাংগিক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে পয়ার-ছন্দের সবল লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া কাব্য-জগতের অনেক ত্রিশংকু কবিতার স্বর্গ ও গদ্যের মর্ত এই দুইএর মধ্যবর্তী প্রদেশে লম্বমান ছিলেন—এই অবলম্বনটুকু না থাকিলে তাঁহারা বহুপূর্বেই সরাসরি গদ্যের নিম্নলোকে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতেন।"*

এখন পয়ার ছন্দ শব্দটি যদি পদচার ছন্দ শব্দ উদ্ভূত হয় তবে ওর ইংরেজি করা যেতে পারে 'a pedestrian measure'—কিনা পদাতিক জাতীয় ছন্দ, যে ছন্দ পথিকের মতো পায়ে হেঁটে চলে, নেচে চলে না। এখন গদ্যের তো ঐ কাজ। কখনো একক পথিকের মতো, কখনো ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদলের মতো গদ্য পদচার করে চলে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলো গদ্যে লিখলেও চলতো, মাঝে মাঝে অবশ্য ভাবের তীব্রতা প্রকাশের জন্য গানের দরকার

* বঙ্গ সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

হতো। ওগুলো গদ্য না হলেও গদ্যধর্ম্মী রচনা। পয়ার ছন্দের ধর্ম্মটা গদ্যের, যদিচ রক্তসম্বন্ধে পদ্য। একটা অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ নেওয়া যাক।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।

দুটি পদে মিলিয়ে নিলে এরা পদ্য, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে গদ্য ছাড়া আর কি। দীর্ঘকালের পরিচয়ে এদের পদ্যত্ব জ্ঞানের অঙ্গীভূত না হয়ে গেলে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান"কে গদ্য বলেই মনে হতো। এর চালটা পদ্যের কিন্তু চলনটা গদ্যের।

একজন বড় কবির শরণাপন্ন হওয়া যাক।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিয়া পাটুনীরে।

স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক পদ গদ্য ছাড়া আর কি। এবারে সবচেয়ে বড় কবির শরণাপন্ন হই—

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ
অর্থ তার ভেবে ভেবে গবুচন্দ্র চুপ।

স্বতন্ত্রভাবে এর প্রত্যেক পদ নিছক গদ্য। আমি পয়ারের নিন্দা করছি না, পয়ার ছন্দের আমি নিজে অনুরাগী, যে ছন্দ গদ্যপদ্যের, best of both the worlds ভোগ করতে সক্ষম তার প্রশংসা করতে হয় বই কি। বস্তুতঃ যে পয়ার গদ্যের যত বেশি কাছে আসতে সমর্থ তার উৎকর্ষ তত বেশি। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে পয়ারের অন্তর্নিহিত গদ্যধর্ম্মই গদ্যের স্বনামে আত্মপ্রকাশের একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এ অন্তরায়ও দুস্তর হতো না যদি সেই সঙ্গে থাকতো ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের তাগিদ। সেটা যে ছিল না, আগেই বলেছি।

এই দুটো প্রধান কারণ ছাড়া খুব সম্ভব আরও একটা গৌণ কারণ আছে। গদ্যের সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের ধারকবাহকের সম্বন্ধ। পদ্যের ধারক ছন্দ, বাহক মানুষের স্মরণ শক্তি। বৃহৎ গদ্যসাহিত্য নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের অপেক্ষা রাখে বলেই মনে হয়, যদিচ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের আগেই অনেক দেশেই গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তবু মনে রাখতে হবে যে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের আগে গদ্য বাণীর রাজপথ হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত মুদ্রাযন্ত্র ও গদ্যসাহিত্যের যোগাযোগকে

কাকতালীয়ের চেয়ে নিগূঢ় মনে হয়। তবু এই কারণটিকে পূর্ব্বোক্ত দুটি কারণের গুরুত্ব দেওয়া যায় না নিশ্চয়।*

দেশ ও কাল মিলিয়ে যে পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে গদ্যের ধারা গদ্যসাহিত্যের ধারা হয়ে উঠতে চলল, এতক্ষণ তার আলোচনা হল। এবারে গদ্যসাহিত্যের ধারাটিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে আলোচনার সুবিধার জন্য ১৮০১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত একশচল্লিশ বৎসরকে বিভিন্ন পর্ব্বে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ।

দ্বিতীয়, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের যুগ।

তৃতীয়, বিদ্যাসাগরের যুগ।

চতুর্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ।

পঞ্চম, রবীন্দ্রনাথের যুগ।

এখন এই সব পর্ব্বসন্ধি সূক্ষ্ম কলমে আঁকা সম্ভব নয়, কেননা স্বভাতবই সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া তার ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে ঢুকে পড়ে পরবর্ত্তী যুগের সীমানায়, তাই অনেক সময়ে প্রতিক্রিয়াটাই প্রবলতর হওয়া সত্ত্বেও

* পাঠান ও মুঘল নৃপতিদের মধ্যে শের শা ও আকবরের মনকে অল্পবিস্তর 'modern mind' বলা চলে। এহেন আকবর মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেননি ভেবে বিস্ময় বোধ হয়। তাঁর সময়ে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ছাপা বই তিনি দেখেছেন। নূতন কলকজা ও যন্ত্রপাতির প্রতি তাঁর মনে ঔৎসুক্য ছিল। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি তৈরি করবার জন্য নিজস্ব একটি কারখানাও তিনি স্থাপন করেছিলেন অথচ ছাপাখানার মূল্য তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর আগ্রহে এদেশে ছাপাখানার প্রচলন ঘটলে ভারতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করতো মনে করবার হেতু আছে। "Ever since the middle of the 17th century, there had been close commercial exchange between India and England, but our royalty and ruling classes imported only European articles of luxury; none cared for European knowledge; no printing press, not even the cheapest and smallest lithographic stone was installed by the Mughal Emperors or the Peshawas. They imported only what catered to their luxury and vice." Fall of the Mughal Empire: Ch. 51, Vol. IV: Jadunath Sarkar.

আকবর জ্ঞানোৎসাহী ছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয়লাভে তাঁর আগ্রহের অবধি ছিল না, সেইজন্যই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অভাব আরও বেশি বিস্ময়কর।

ক্রিয়া দিয়েই পর্ব্বসন্ধি চিহ্নিত করা উচিত। উদাহরণের ক্ষেত্রে নামলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত চলেছিল, শেষের দিকে স্বয়ং বিদ্যাসাগর যুক্ত হয়েছিলেন এই কলেজের সঙ্গে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা কেবল সতেরোটি বছরকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ অভিহিত করেছি। ১৮০১ সালে প্রতাপাদিত্য চরিত প্রকাশ এই জন্যে এটা পূর্ব্ব সীমানা আর উত্তর সীমানা যে ১৮১৮ সালে টেনেছি তার অনেকগুলো কারণ। বাংলা গদ্য রচনায় প্রেরণা দান, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিকে দেশের মনোযোগ আকর্ষণ আর বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনার জন্য অল্প বিস্তর এক ভাবে ভাবিত গোষ্ঠী গঠন—এই হচ্ছে আমাদের মতে উক্ত কলেজের প্রধান কাজ বা ক্রিয়া। একাজ ১৮১৮ সালের মধ্যেই এক রকম সম্পন্ন হয়েছিল। তারপরে চলেছে ১৮৫৪ সাল অবধি মন্দ গতিতে তার প্রতিক্রিয়া। ইতিমধ্যে এমন কতকগুলো গুরুতর কারণ ঘটলো যাতে নূতন পর্ব্বসন্ধি সূচিত হয়। রাজা রামমোহন স্থায়ী ভাবে কলকাতায় এসে বসলেন ১৮১৪ সালে, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল আর ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হল প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। এখন দ্বিতীয় যুগকে আমরা যদি রামমোহনের যুগ বলতাম (যেমন সাধারণত বলা হয়ে থাকে) তবে পর্ব্বসন্ধি টানতাম ১৮১৪ সালে; কিম্বা যদি একে আমরা হিন্দু কলেজের যুগ বলতাম তবে পর্ব্বসন্ধি টানতাম ১৮১৭ সালে; আমরা একে বলেছি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগ—তাই এর সীমানা টেনেছি ১৮১৮ সাল থেকে। কেন এ নাম দিলাম তার আলোচনা যথাস্থানে হবে। তৃতীয়টি হচ্ছে বিদ্যাসাগরের যুগ। এযুগের সূচনা বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশে ১৮৪৭ সালে। চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের সীমানা নির্দ্দেশে বিতর্কের অবকাশ নেই। ১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ থেকে ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু অবধি চতুর্থ যুগ। আর ১৮৯৪ সালে আরম্ভ হয়ে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের দেহান্ত পর্যন্ত পঞ্চম বা রবীন্দ্রযুগ।

এখন আমাদের এ পর্ব্ববিভাগ নীতি সকলে স্বীকার করবেন এমন মনে করি না, তবু আমাদের বিবেচনা অনুসারে কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে?

॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ॥

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চুয়ান্ন বছরের জীবনে পর্ব্বে পর্ব্বে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক ও শিক্ষকরূপে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তাঁদের অনেকেই স্মরণীয় সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের তিনজনকে মাত্র প্রয়োজন। উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু ও পণ্ডিত মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যাসাগরের কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে পণ্ডিতদের মধ্যে এমন দু' একজন ছিলেন যাঁদের সুঠাম গদ্য বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, কিন্তু সে আলোচনার ক্ষেত্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে স্বভাবতই স্থান সঙ্কীর্ণ তাই অনেককে বাদসাদ দিতে হয়, যাঁদের রচনার মধ্যে ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি বেশ পরিস্ফুট তাঁদের গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। আমাদের ধারণা কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা দিয়েই বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।

এঁদের তিনজনের জীবনবৃত্তান্ত অনেকে আলোচনা করেছেন, বাঙালী পাঠকের কাছে তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে এঁদের রচনারীতির যেমন একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে এঁদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব তার চেয়ে কম স্বতন্ত্র নয়। সম্পূর্ণ তিন ভিন্ন ছাঁচে গড়া তিনটি মানুষ এসে মিলিত হলেন এক লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে। বিশেষতঃ কেরীর জীবন আলোচনা করলে মনে হয় যে সংসারের যে সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথটা ডন কুইকসোটের হাস্যকরতা ও শহিদের মহিমার মাঝখান দিয়ে গিয়েছে—কেরী সেই পথ দিয়ে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন, কোথাও পা টলেনি। এদেশে যে সব মহাপ্রাণ, ভারতনিষ্ঠ ইংরেজ এসেছেন কেরীর স্থান তাঁদের সামনের সারিতে।

কেরীর কথোপকথন প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। নামেই রয়েছে বইখানার পরিচয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষাকে যথাযথভাবে ধরবার চেষ্টা হয়েছে বইটিতে। বইখানা আদৌ কেরীর লিখিত কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—সন্দেহের কিছু কারণও যে না আছে তা নয়। কথোপকথনের ভূমিকায় কেরী স্বীকার করেছেন যে কথোপকথনগুলোকে যথাযথ করবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশীয় লোককে সংলাপ রচনায় নিযুক্ত করেছেন। আর একটা কারণ হচ্ছে, কেরীর মৃত্যুর পরে তাঁর

একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিখেছিলেন যে—"These were composed in the original Bengali, probably by a clever native."*

এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করে শ্রীসজনীকান্ত দাস অনুমান করেন যে—"মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন রচনার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী।"† তারপরেই তিনি বলেছেন—"তথাপি কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই কেরীরই প্রাপ্য।"‡ আমাদেরও মনে হয় বইখানার কৃতিত্ব কেরীকেই অর্পণ করা উচিত, তবে সেই সঙ্গে মনে করা অযৌক্তিক নয় যে তিনি কোন কোন স্থলে অপর কারো সাহায্য নিয়ে থাকবেন এবং সেই অপর ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয় হওয়া বিচিত্র নয়। অনেকগুলো কথোপকথনের ভাষায় উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষার প্রভাব দেখতে পাই। মনে রাখা আবশ্যক কেরী দীর্ঘকাল মালদহে ছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়ও এক সময়ে নাটোর-রাজের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

আসগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম। তোরদের কি হইয়াছিল।

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুণ ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাঝের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

এই কথোপকথনটির মধ্যেই এক জায়গায় 'মুখ ধুইয়ে দেওয়া' অর্থে 'আচিয়া দেয়'—ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও ছেঁচকি, বাগুন, আচানো—এসব উত্তরবঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বলে জানি।

কথোপকথনের ভূমিকায় কেরী জানিয়েছেন যে উদাহরণগুলোকে যতদূর সম্ভব তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মুখ থেকে নেবার চেষ্টা করেছেন—খানসামা,

* কথোপকথন : কেরী : শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত ভূমিকা : পৃঃ ২।০—২।/০

† তদেব : পৃঃ ২।/০

‡ তদেব : পৃঃ ২।/০

সরকার, চাষাভুষো, জেলে, খাতক মহাজন, যাজক যজমান, জমিদার রায়ত, গ্রাম্য স্ত্রীলোক...প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীর মুখ থেকে সংগ্রহ করেছেন কথোপকথন।

আজকের দিনে এতে আমরা বিস্ময় অনুভব করিনে কিন্তু সেদিন বিশেষ বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। কেরীর আগে এ চেষ্টা কেউ করেছেন বলে জানিনে। কিন্তু এই ছিল কেরীর বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ। তিনি এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করবার উদ্দেশ্যে। তিনি দেখলেন যে তারই প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে দেশী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে হবে তাঁকে। আর তা করতে হবে অবশ্যই লোকমুখের ভাষায়—সাধারণের মধ্যে যাতে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কাজেই গোড়া থেকেই তিনি লোকমুখের ভাষা আয়ত্ত করতে সঙ্কল্প করেছিলেন। এই সঙ্কল্পের অন্যতম প্রধান ফল তাঁর কথোপকথন গ্রন্থ। পরে অবশ্য লোকমুখের ভাষার ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে লোকমুখের ভাষা তথা দেশীয় ভাষাগুলোর শক্তির উৎস কোথায়। *

ভাষা সম্বন্ধে কেরীর মত পরিবর্ত্তনের প্রমাণ— †

১৮১২ সালে প্রকাশিত ইতিহাসমালা। কথোপকথনের মতো এই বইখানারও জনকত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে। ‡

যদি গ্রন্থখানাকে কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বলেই ধরে নেওয়া যায় তবু স্বীকার করতে হয় যে সম্পাদকের সমর্থন ভাষারীতির উপরে অবশ্যই আছে। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

* কথোপকথন : কেরী : শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত ভূমিকা

Bengali Literature in the Nineteenth century, 1800-1825. : Chapter IV, Page 102 : Dr. S. K. De.

† কথোপকথন : পৃ: ২৸৵৹

‡ পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে—ইতিহাসমালা | or | A Collection of | Stories | in the Bengalee Language, | Collected from various sources. By W. Carey, D. D.

ইতিহাসমালা থেকে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল—

কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে।

লোকমুখের ভাষাকে কেরী গ্রহণ করবেন এতে আপত্তির কিছু নেই, একদিকে বাইবেল অনুবাদের তাগিদ, অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের নব্য ইংরেজি গদ্যের দৃষ্টান্ত স্বভাবতই কেরীকে লোকমুখের ভাষার প্রতি উন্মুখ করেছিল। কিন্তু এই প্রবণতার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে লোকমুখের ভাষা বলে কেরী নিতান্ত অশিক্ষিত লোকের ব্যবহৃত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালী শিষ্ট সমাজের ভাষাকে গ্রহণ করেননি। এদেশে তখনও রাধাকান্ত দেব, রামমোহনের পর্য্যায়ভুক্ত শিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাটাই শিষ্ট সমাজের ভাষা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন আদালতী ভাষা ও পণ্ডিতী ভাষার মধ্যবর্ত্তী বিষয়ী লোকের ভাষা। খুব সম্ভব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রবেশ করে কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসবার আগে বাঙালী শিষ্ট সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হয়নি যাতে তাদের ভাষাকে তিনি গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি বলে গ্রহণ করতে পারেন। ইতিহাসমালার ভাষায় যে উৎকর্ষ দেখি তার মূলে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তেমনি আছে শিষ্ট সমাজের সঙ্গে পরিচয়, আর আছে কলেজে গোষ্ঠীবদ্ধ দেশী বিদেশী শিক্ষক অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যজাত প্রভাব। বস্তুতঃ এরূপ ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীবদ্ধ লেখক সম্প্রদায়ের কোন রচনাই লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব হতে পারে না—কেননা আংশিক স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না।

রামরাম বসু হচ্ছেন প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যাঁর লিখিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ মুদ্রিত আকার ধারণ করে। আর যখন সাহিত্য মানেই প্রায় মুদ্রিত রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রামরাম বসুকেই আমরা প্রথম বাঙালী গদ্য লেখক বলে গ্রহণ করেছি এই আলোচনায়। আর আগেই নির্দেশ করেছি যে আমাদের আলোচনার পূর্ব্ব সীমানা প্রথম গদ্য সাহিত্যিক আর উত্তর

সীমানা বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।* রামরাম বসু একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। এ যুগে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মাথা ভিড়ের উপর দেখা যেত। শঠতা ও আন্তরিকতা, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, মনীষা ও আত্মপরায়ণতা প্রভৃতির বিষম ধাতুতে গঠিত তাঁর চরিত্র। তিনি আদর্শ চরিত্র পুরুষ নন, স্মরণীয় ব্যক্তি। স্মরণীয়তার প্রধান কারণ বাংলা গদ্যসাহিত্যের পুরোভাগে তাঁর স্থান। এখানে তাঁর জীবনকথার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল সাহিত্যকৃতিত্বের আলোচনাই করবো।

কেরীর অনুরোধে রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সহকারী পণ্ডিতরূপে চল্লিশ টাকা বেতনে ১৮০১ সালের মে মাসে যোগদান করেন। এই বছরেই জুলাই মাসে প্রতাপাদিত্য চরিত্র মুদ্রিত হয়। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লিপিমালা নামে গ্রন্থ। তারপরেও তিনি এগার বছর কাল, ১৮১৩ সালের ৭ই আগষ্ট মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত কলেজে কর্ম্মীতালিকা-ভুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মে মাসে কলেজে নিযুক্ত হয়ে জুলাই মাসের মধ্যে গ্রন্থ মুদ্রণে (রচনা নিশ্চয় আরো আগে শেষ হয়েছিল) প্রমাণ হয় যে রামরাম বসুর কলম খুব দ্রুত চলতো। প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমালা রচনার জন্য সরকার থেকে তিনি ৩০০৲ সিক্কা টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন।†

* দু' জনের মৃত্যুর তারিখে একটা আকস্মিক মিল আছে—দুটোই ৭ই আগষ্ট।

† পারিতোষিক দানের উদ্দেশ্য কেবল উৎসাহপ্রদান নয়—সেকালে বই বিক্রি থেকে যে এক পয়সাও পাওয়ার আশা ছিল না তা নিয়ে প্রদত্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত কয়েকখানা বইয়ের দাম দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

নাম	দাম
১। বত্রিশ সিংহাসন	৬৲ টাকা
২। লিপিমালা	৬৲ "
৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৫৲ "
৪। হিতোপদেশ	৮৲ "
৫। কথোপকথন	৮৲ "

—বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ : ১ম খণ্ড : শ্রীসজনীকান্ত দাস : পৃঃ ১৪২-৪৩।

১৮০২ সালের মূল্যকে ১৯৬০ সালের মূল্যমানে আনতে হলে অন্ততঃ দশগুণ করা আবশ্যক। এখনও অনতিকায় পুস্তকের ৬০৲ টাকা ৫০৲ টাকা ও ৮০৲ টাকা মূল্যে আজকার দিনে বিক্রয়ের কি সম্ভাবনা সহজেই অনুমেয়। সেদিনও কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সরকার হতে

রামরাম বসুর গদ্যরীতির আলোচনায় প্রবেশের আগে একটা তর্কের মীমাংসা করে নেওয়া আবশ্যক। কেরী ও রামরাম বসুর সময় থেকে একটা জনশ্রুতি চলে আসছে যে রামরাম বসু তাঁর ভাষা ও ভাবের জন্য রামমোহনের কাছে ঋণী। তিনিই নাকি বসুজার মন "পরব্রহ্মের" দিকে আকর্ষণ করেছিলেন আর বসু যে শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বিরত ছিলেন সেটাও নাকি রামমোহনের পরামর্শে। রামমোহন মহাপুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহ কিন্তু বসুকে অভীষ্ট পথ থেকে বিচলিত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বসুর জীবনকথা যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে স্বক্ষেত্রে তাঁর শক্তিও কম ছিল না; কেরী, টমাস বা রামমোহন কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। খ্রীষ্টান পাদ্রীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে,"* —লিখতে রামরাম বসুর সর্ব্বশক্তিমান কলম বেশ সক্ষম।— এইটুকুর জন্যে রামমোহনের শরণ নিতে হবে যাঁরা মনে করেন এখনো তাঁরা বসুজাকে চিনতে পারেন নি। আর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে বিরতি!

কেরীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ঐ আশা জীইয়ে রেখে রামরাম বসু পাদ্রী প্রভুদের মনে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন আর মৃত্যুর পরেও সে প্রভাবের অবসান ঘটেনি। ৭ই আগষ্ট রামরাম বসুর মৃত্যু হল, পর দিনেই তস্যপুত্র—"Nuruttom Bose was appointed on the 8th August to succeed him."†

এই প্রভাব থেকে বুঝতে পারা যাবে যে বসুজার স্বাভাবিক প্রতিভা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এটি স্বীকার করে নিলে পরবর্ত্তী কাজ অনেক

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক কিনে নিয়ে ছাপাখানার বিল শোধ হতো—পারিতোষিক দান ছাড়া লেখককে উৎসাহিত করবার আর কোন পথ ছিল না। বইয়ে সালের উল্লেখের আরও কারণ আছে। যে-সব বইয়ের প্রচার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা দিয়ে পাঠক সমাজের ভাষা গঠিত হওয়ার কিছু মাত্র আশা ছিল না। আমার ধারণা কলেজের লেখকগণ পরস্পরের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—তৎকালীন বাঙালী পাঠকের উপরে এসব বইয়ের প্রভাব পড়েনি বল্লেই হয়।

* লিপিমালার ভূমিকা।

† রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : পৃঃ ২৶।

সহজ হয়ে আসে, সমস্যা সমাধানের জন্য রামমোহনকে আমদানি করতে হয় না।

তারপর হচ্ছে রামরাম বসুর গদ্যরচনা রামমোহন কর্তৃক সংশোধনের কথা। কথাটা সেই সময়েই উঠেছিল। রামরাম বসুর পাণ্ডিত্য প্রসঙ্গে কেরী বলছেন—"a more devout scholar than him I did never see."* তারপরে "It was this reputation for learning which secured to him not only the post of a Pundit in the College of Fort William in 1801 but also the friendship of Raja Rammohan Roy, himself a learned man, who is said by Carey to have exercised great influence on Ram Basu's life and character and moulded his literary aspirations." তারপরে আবার—"Carey reports to have heard that Ram Ram took the manuscripts of his first work, *Pratapaditya Charitra* to Rammohan and got it thoroughly revised by him."†

সমসাময়িক জনশ্রুতি সব সময়ে মূল্যহীন নয়, বিশেষ কেরীর মতো ব্যক্তি যদি তা সমর্থন করে থাকেন। কিন্তু অন্য প্রমাণের অভাবে জনশ্রুতিকে জনশ্রুতির মূল্যেই গ্রহণ করতে হয়; প্রমাণ বলে নেওয়া চলে না।

পরবর্ত্তীকালে নিখিলনাথ রায় "শ্রীরামপুর মিশনে রক্ষিত কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্রের" উল্লেখে জনশ্রুতিকে প্রমাণের গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেন।‡ কিন্তু এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"শ্রীরামপুর মিশনে বর্ত্তমানে কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র কিছু নাই। কোনদিন ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।" §

আরও পরবর্ত্তীকালে যাঁরা এই জনশ্রুতিকে তথ্য বলে গ্রহণ করেছেন তাঁরা নূতন প্রমাণের বলে করেন নি, আগের জের টেনেই চলেছেন।‡ অতএব তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

* Hist. of Bengali Lit. : S. K. De : Chap. VI. P. 159.

† Hist. of Bengali Lit. : S. K. De : Chap. VI, P. 160.

‡ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : পৃঃ ২৯।

§ তদেব : পৃঃ ২৯।

‡ বাংলা গদ্যের চার যুগ : মনোমোহন ঘোষ : তৃতীয় অধ্যায়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৬।

এখন জিজ্ঞাস্য, কেরী কথিত জনশ্রুতি ও "শ্রীরামপুর মিশনে রক্ষিত কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র" ছাড়া এর মূলে আর কোনো ভিত্তি আছে কি?

একজন লোক খুব বড় হয়ে উঠলে পরবর্ত্তীকালে তাঁর সময়ের যাবতীয় কৃতিত্বকে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চেষ্টা করে—লৌকিক ইতিহাসের এ একটি সাধারণ সূত্র। এখন এই সূত্রের নিয়মানুসারে রামরাম বসুর সাহিত্যিক কৃতিত্ব রামমোহনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া পাদ্রীর দল রামমোহনের উপরে খুশী ছিল না। কুড়ি বছরের সাহচর্য্যের পরেও রামরাম বসুকে খ্রীষ্টান করতে না পারার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক গ্লানি আছে। এখন দায়িত্ব যদি রামমোহনের মতো বিরাট পুরুষের উপরে চাপানো যায় তবে গ্লানির বেদনা অনেকটা ফিকে হয়ে আসে। খুব সম্ভব এইরকম কোন কারণেই পাদ্রীরা মনে করেছে—"He [Basu] was on the verge of avowing Christianity but was possibly deterred by Rammohan. *

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। রামমোহনের সাহিত্যিক কলম যদি বসুর ভাষার উপরে চলে থাকে, তবে অবশ্যই তার প্রভাব বা চিহ্ন বসুর ভাষায় থাকবে। সেটা কেউ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেন নি। খুব সম্ভব নেই বলেই এ চেষ্টা হয়নি। আমার ধারণা নিছক গদ্যলেখক হিসাবে সেকালের অনেকের মতোই রামরাম বসুর স্থান রামমোহনের উপরে। কি প্রতাপাদিত্য চরিত্রে কি লিপিমালায় রামমোহনের ভাষার ক্ষীণতম সাদৃশ্য আছে বলেও মনে হয় না। কাজেই বসুর উপরে রাজার প্রভাবকে একটা মনোরম জনশ্রুতি বলেই গ্রহণ করা উচিত। যাই হোক, প্রাসঙ্গিক স্থলে অর্থাৎ রামমোহন প্রসঙ্গে এর বিস্তৃততর আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল; এখন রামরাম বসুর গদ্যের নমুনা বিচারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করবার সময়ে রামরাম বসুর দু'খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) ও লিপিমালা (১৮০২)।

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র কিনা "তিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।"

* Hist. of Bengal Lit.: S. K. De: Chap. VI, P. 161.

এ বইখানা অল্পবিস্তর পরিচিত, কাজেই ভাষার সামান্য নমুনা দিলেই চলবে।

"যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাৎ হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।"

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা ফারসী বহুল। কতকটা বিষয়ানুরোধে, কতকটা রামরাম বসুর ফারসী জ্ঞানের স্বাভাবিক আকর্ষণে।

লিপিমালা কতকগুলি কাল্পনিক পত্রের সমষ্টি অর্থাৎ পত্রাকারে লিখিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বা শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনা।

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

"এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এইস্থানে এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলনভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"*

লিপিমালার ভূমিকায়, যার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল, বইখানা লিখবার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এদেশের রাজা ও রাজপুরুষ, শিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে কি ভাবে নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র আদানপ্রদান করে থাকে তারই পরিচয়দান গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে প্রথমেই চোখে পড়বে লিপিমালায় ফারসী শব্দের অভাব। এমন কি যেখানে বিষয়ের

* Hist. of Beng. Lit. : S. K. De : P. 171—72.

অনুরোধে ফারসী আশা করা যেতে পারে, যেমন রাজপুরুষগণের পত্রে, সেখানেও ফারসী শব্দ নেই বললেই হয়। এর কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন—"In this Ram Basu was proving himself a true disciple of Carey and Rammohan ; from the former he learned to make the best use of the popular language and avoid academic affectation c boured style, and from the latter he got an insight into the strength and power of the language on account of its close relation to the classical Sanscrit."*

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে লিপিমালার গদ্যরীতির উপরে কেরী ও রামমোহনের প্রভাব কল্পনা অনাবশ্যক। অবশ্য আগেই বলেছি কলেজের সহকর্ম্মীগণের প্রভাব পরস্পরের উপরে পড়া অসম্ভব নয়, বরঞ্চ সমব্যবসায়ে নিযুক্তগণের মধ্যে পড়াই সম্ভব, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কেরীর প্রভাব কল্পনা করবার কি হেতু আছে? আর সংস্কৃত ভাষার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠবার জন্যে রাম বসুর সঙ্গে খুব সম্ভব তখনো অপরিচিত রামমোহনকে টেনে আনাও নিষ্প্রয়োজন, হাতের কাছেই ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কিন্তু তাঁরও প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা অনাবশ্যক। আসলে রাম বসু কলম চালনা করে তৎকালে প্রচলিত গদ্যরীতিগুলোর পরীক্ষা করছিলেন। ফারসীবহুল গদ্যরীতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন আদালতী ভাষা—সেই রীতিতে লিখিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র, আর দেশী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ ও প্রয়োজন স্থলে ফারসী শব্দ মিশিয়ে যে গদ্যরীতি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন বিষয়ী-লোকের ভাষা—সেই রীতিতে লিখিত হচ্ছে লিপিমালা। কলেজের গ্রন্থকারগণ কেউ কোন নূতন রীতির সৃষ্টি করেননি, তৎকালে প্রচলিত গদ্য-রীতিগুলোকেই সকলে ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ কোন একটা রীতিকে গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করে গিয়েছেন। আবার কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সচেতনভাবে এগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্ব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের, তাঁর পরিণত রচনায় বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির একটি অপরিণত খসড়া যেন দেখতে পাওয়া যায়।

* Hist. of Beng. Lit. : S. K. De : Chap. VI, P. 181

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক সমাজে উজ্জ্বলতম রত্ন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। শুধু তাই নয়, যে কোন মাপকাঠিতেই বিচার করা যাক না কেন মৃত্যুঞ্জয় একজন অসামান্য পুরুষ। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে তাঁকে দেখলে বিখ্যাত ডক্টর জন্‌সন্‌কে মনে পড়ে যায়। "He bore a strong resemblance to our great lexicographer (Dr. Johnson), not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwiedly figure."*

কেরীতে হয়েছিল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অধ্যবসায়ের মিলন, তিনি নিজেকে 'Plodder' বলেছেন, "I can persevere in any definite pursuit." রামরাম বসুতে হয়েছিল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে 'কমনসেন্স' বা কাণ্ডজ্ঞানের মিলন, আর মৃত্যুঞ্জয়ে হয়েছিল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রতিভার মিলন। বস্তুতঃ এই আমলে কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিভার অধিকারী বলা যায়। হঠাৎ এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপরে ভার পড়লো বাংলা লিখবার। কেরী ও রামরাম বসুর জীবনে বাংলা রচনা অভ্যাসের একটা ভূমিকা ছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের বেলায় কোন পূর্ব্বসূত্র ছিল না। তবু দেখা যাবে তাঁর রচনাতেই সাহিত্যিক গুণ সবচেয়ে বেশি। আমরা বলেছি যে অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যের ধারা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কলমেই প্রথমে গদ্যসাহিত্যের রূপ গ্রহণ করলো। অনেকগুলি কলম এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কলমেই ছিল প্রতিভার স্পর্শ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন মৃত্যুঞ্জয়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধ চন্দ্রিকা (রচনা কাল সম্ভবতঃ ১৮১৩, মুদ্রণকাল ১৮৩৩); এগুলি ছাড়া ১৮১৭ সালে বেদান্তচন্দ্রিকা নামে আর একখানি পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন।

"রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনা ও বেদান্তচর্চ্চার প্রতিবাদে

* The life and Times of Carey, Marshman and Ward. 1 : J. C. Marshman : P. 180.

মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করেন।"* কাজেই এ বইখানা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রচিত গ্রন্থশ্রেণীমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত নয়।

মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কাজেই স্বাভাবিক এই যে বাংলা লিখতে বসে সংস্কৃতশব্দবহুল রীতিকে তিনি অবলম্বন করবেন, যেমন ফারসী ভাষায় পণ্ডিত রামরাম বসু করেছিলেন প্রথম গ্রন্থে ফারসী শব্দবহুল রীতিকে অবলম্বন। বত্রিশ সিংহাসনের প্রারম্ভে তিনি লিখছেন—

"দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে।"

একটি বাক্যের মধ্যে † পঁচিশ জাতীয় বৃক্ষের নাম, তথাপি কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে মনে হয় না, সবসুদ্ধ মিলে উদ্যান হয়ে উঠেছে, দুর্গম অরণ্যে পরিণত হয়নি। এখানেই পরিচয় শব্দব্যবহারের প্রতিভার। বাক্যের শেষে 'থাকে' খুব সম্ভব সংস্কৃতে অনুরূপ স্থলে ব্যবহৃত বর্ত্তমান কালের প্রভাব সূচক। 'থাকে' না বলে 'আছে' বললে কানে লাগতো না। ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত হিতোপদেশের ভাষায় সংস্কৃতশব্দ প্রয়াগের ঝোঁক অপেক্ষাকৃত কম।

"অনন্তর লঘুপতন নামে কাক সকল বৃত্তান্ত দেখিয়া ইহা বলিল কি আশ্চর্য্য হে হিরণ্যক তুমি শ্লাঘ্য। অতএব আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি এই নিমিত্তে আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হও।"

কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় সংস্কৃত ক্রিয়াপদের প্রভাব —"মগধ দেশে চম্পকবতী নামে এক বন থাকে"।

রাজাবলি আধুনিক অর্থে ইতিহাস নয়। পুরাণকথা, জনশ্রুতি ও

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : শ্রীসুকুমার সেন : তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩২।

† বস্তুতঃ চারিটি বাক্য। "পুরী ছিল" প্রথম বাক্যের উপসংহার। "ক্ষেত্র থাকে" দ্বিতীয় বাক্যের উপসংহার। "নাম যজ্ঞদত্ত" তৃতীয় বাক্যের উপসংহার। চতুর্থ বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক ঘটনার সমন্বয়ে লিখিত এই গ্রন্থ। তবু কি ইতিহাস হিসাবে কি সাহিত্য হিসাবে এর মূল্য সমকালীন প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রমের চেয়ে বেশি। এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় বিষয়ানুরোধে অনেক ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন, কাজেই বুঝতে পারা যায় যে ফারসী শব্দকে এই নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত পলাণ্ডুর মতো অস্পৃশ্য মনে করতেন না। রাজাবলি পড়লে দেখা যাবে যে হিন্দু রাজাদের ইতিহাস বর্ণনা কালে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য, পাঠান ও মুঘল নৃপতিদের ইতিহাস বর্ণনা কালে ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্য, আর একেবারে শেষের দিকে ইংরেজ রাজশক্তির আবির্ভাব বর্ণনা উপলক্ষ্যে দু'চারটি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ।* আরো অধিক অগ্রসর হলে আরো বেশি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দেখতে পেতাম সন্দেহ নেই। বিষয়ের প্রকৃতিভেদে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহারেই সাহিত্যিক প্রতিভার মৌলিক পরিচয়।†

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের গ্রন্থালোচনার সময়ে মনে রাখা উচিত যে একটি বিশেষ প্রেরণায় এদের সৃষ্টি আর একটি বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী এদের গতি। সোজা কথায় এ সব 'পাঠ্যপুস্তক'—তাও আবার বিদেশী ছাত্রদের। লেখকদের স্বাধীনতা এই উদ্দেশ্য দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ। এসব বই সাহিত্যপদবাচ্য হলেও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ছিল না লেখকদের। আজকার দিনে 'পাঠ্যপুস্তক' অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে অসুবিধা যেমন অনিবার্য্য, সমালোচককে যেমন পদে পদে সচেতন হয়ে পদক্ষেপ করতে হয়, উক্ত কলেজের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেও তেমনি অসুবিধা অনিবার্য্য, তেমনি সচেতন পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক। অনেক সমালোচক এদিকে তেমন সচেতন নন বলে বিচার বিভ্রাট ঘটেছে। এবিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে কোন মোহ ছিল না। রাজাবলি গ্রন্থের শেষে তিনি বলছেন—"কম্পনি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের আলবাস্থে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।" তাঁর বক্তব্য এই যে—এই পাঠশালা কিনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

* লাঠ ক্লীব, লার্ড ক্লীব (লাট বা লর্ড ক্লাইভ), কম্পনি।

† বিষয়টি তলিয়ে দেখেন নি বলেই রামগতি ন্যায়রত্ন প্রবোধ চন্দ্রিকার নিন্দা করেছেন মনে হয়। দ্রষ্টব্য: বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য : ১ম সং, পৃঃ ২০৯—১০।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিশেষ উদ্দেশ্যের স্পষ্টতম পরিচয় পাওয়া যায় প্রবোধ চন্দ্রিকায়। বইখানাকে তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় গদ্যরীতির সংহিতা গ্রন্থ বললে অন্যায় হয় না। প্রবোধ চন্দ্রিকার সূচীপত্রখানা পাঠ করলেই লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যাবে। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি সার্থক ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন—"প্রবোধ চন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনা রীতি অনুসৃত হইয়াছে, কথ্যরীতি, সাধুরীতি ও সংস্কৃতরীতি। কথ্যরীতি প্রধানত কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বইখানার অধিকাংশ সাধুরীতিতে লেখা। সংস্কৃতরীতির ব্যবহার কেবল সংস্কৃত হইতে আক্ষরিকভাবে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই। এযাবৎ যাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রিকা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় রীতিকেই প্রবোধ চন্দ্রিকার বিশিষ্ট রচনারীতি মনে করিয়া ভুল করিয়া আসিয়াছেন। আসলে এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। কথ্য এবং সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা সে যুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী হওয়াতে ভাষাও সর্ব্বত্র সুগম নয়। তবে কথ্যভাষামূলক অংশগুলি প্রাঞ্জল।'*

অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা "সে যুগের রচনারীতির দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নয়।" কোন লেখকের ভাষাই সমকালে প্রচলিত রচনারীতির দোষগুণ থেকে সর্ব্বাংশে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কেরী রামরাম বসু ও অন্যান্য লেখকের রচনার শ্রেষ্ঠ অংশের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ অংশের তুলনা করলে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রতিভার পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হয় না।

এখন মৃত্যুঞ্জয় কর্ত্তৃক অনুসৃত তিনটি রীতির সামান্য সামান্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

সংস্কৃতরীতি :

"অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরা নাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব-

*বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : শ্রীসুকুমার সেন : ৩য় সং, পৃঃ ৩৩—৩৪।

কুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক ভাষা।"

কেবল রীতিবিন্যাসের খাতিরেই এ ভাষা লিখিত—বাংলা সাহিত্যে এ রীতি কখনো অনুসৃত হয়েছে মনে হয় না।

সাধুরীতি :

"ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল সে উপায় কি যাহাতে আমাদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে।"

এ হচ্ছে পরবর্ত্তীকালের বাংলা সাধু রীতির বনিয়াদ, বিদ্যাসাগর এর উপরেই ভাষার অট্টালিকা গেঁথেছেন।

কথ্যরীতি :

"ম্লেচ্ছেরা কহিল বাপু আমরা শাস্ত্রফাস্ত্র কিছু বুঝি না খাইতে চাহ আপনি হাতে উঠাইয়া লইয়া খাও আমরা মানা করি না কিন্তু হাতে তুলিয়া দিতে আমরা পারিব না।"

কিম্বা···

"বাটীর নিকটে গিয়া [বিশ্ববঞ্চক] আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঠকের মা দৌড়িয়া শীঘ্র আয় মাথা হইতে ভার নামা আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল ওগো আমি যাইতে পারিবো না আমার হাত যোড়া আছে।"

এই ভাষাকে আলালী রীতির মূল মনে করা যেতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত আদালতী ভাষা, পণ্ডিতী ভাষা ও বিষয়ী লোকের ভাষার অল্পবিস্তর স্পষ্ট চেহারা পাওয়া যায় কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহে। কিন্তু এই রীতিগুলো শেষ পর্য্যন্ত অমিশ্র থাকতে পারেনি, একটি অপরটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছিল। মোটের উপরে ভাষার দুটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—একটি, কথ্য ভাষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরল নিরলঙ্কার গদ্যরীতি যার পরবর্ত্তী রূপ পাই আলালী-রীতিতে; অপরটি, পণ্ডিতীভাষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অলঙ্কারবহুল গদ্যরীতি যার পরবর্ত্তী রূপ পাই বিদ্যা-সাগরী তথা আরো পরবর্ত্তীকালের সাধুরীতিতে। মৃত্যুঞ্জয় দুই রকম রীতিই লিখেছেন কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সাধুরীতির দিকে, যেমন কেরী ও রামরাম বসুর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল কথ্যরীতির দিকে।

এবারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গদ্যচর্চার ফলশ্রুতি বলবার সময় এসেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কোন মহৎ বা স্থায়ী সাহত্যস্থষ্টি করেনি। কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের যে রাজপথটা কালক্রমে দৃঢ় হয়ে বহুভারসহনক্ষম হয়ে উঠেছে, বিস্তৃত হয়ে বিচিত্র পথিকের যাতায়াতের পক্ষে সুগম হয়েছে আর জ্ঞানবিজ্ঞানের মাল মশলায় পাকা হয়ে উঠে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হয়ে উঠেছে, সেই পথটির পত্তন করে দিয়েছিলেন কলেজের লেখকগণ। তাঁরা সাহিত্যিক গদ্য স্থষ্টি করতে পারেননি সত্য, কাল ছিল প্রতিকূল; কিন্তু তাঁরা স্থষ্টি করেছিলেন প্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্য। আরো কিছু আছে। সরকারী আনুকূল্য, ছাপাখানার সহায়তা, প্রাচ্য-ভাষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, সর্ব্বোপরি কেরীর ব্যক্তিত্ব সবসুদ্ধ মিলে কলেজটি সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা জ্ঞান প্রসারের যে আন্দোলন স্থষ্টি হয়েছিল খুব সম্ভব কলেজ তারও প্রেরণা জুগিয়েছে।*

কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়। ভাষা নদীস্রোতের মতো। সে যদি সর্ব্বজনীন হয়ে উঠতে চায় তবে তাকে দুর্গমশিখর ও গোপন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ধুলোমাটির প্রাত্যহিক ভূতলে। গদ্যসাহিত্য যদি মহৎ সাহিত্যিক গদ্য হয়ে উঠতে চায় তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে সর্ব্বজনের স্পর্শ। বাংলা গদ্যসাহিত্য বেরিয়ে এলো কলেজের সুরক্ষিত আবহাওয়া থেকে নিত্য চলাচলের পথের উপরে—আরম্ভ হল সাময়িক পত্র ও সংবাদ-পত্রের যুগ।

॥ সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগ ॥

১৮১৮—১৮৪৭

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রসঙ্গে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে বাংলা সাহিত্য ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল; কোন ব্যক্তিবিশেষ তেমন নয় যেমন ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রাধান্য লাভ করেছিল; কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির শক্তিকে আত্মসাৎ ক'রে

* Hist. of Beng. Lit. : S.K. De, : পৃঃ ১১৮—১৯

নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি যেন একটি পার্সনালিটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; সকলে প্রাণশক্তি দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটিকে ; সকলের বিচিত্র প্রাণশক্তির সমাবেশে কলেজটি যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাণের মূলাধার। এই জন্যেই পার্সনালিটির কথা বলেছি।

এখন সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগ সম্বন্ধে কি বক্তব্য ? যুগটিকে যদি নিছক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের প্রসঙ্গে মাত্র বিচার করি—তাহলেও দেখি ঐ একই সত্য। কোন বিশেষ বাংলা সাহিত্যিক নয়, ছোট বড় অনেক বাংলা সাহিত্যিক মিলিয়ে একটি পার্সনালিটির সৃষ্টি করেছিল—যার আত্মপ্রকাশের বাহন হচ্ছে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র। গোড়ায় বলেছি যে গদ্যসাহিত্য হচ্ছে ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন। তা যদি হয় তবে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রগুলি হচ্ছে এই ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের কণ্ঠ। এই পর্ব্বে সেই কণ্ঠ প্রথম মুখর হয়ে উঠেছে—মধ্যবিত্ত সমাজ ভাষা পাচ্ছে।

সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র সমূহকে সম্মিলিতভাবে যদি এ যুগের পার্সনালিটি বলা হয়, তবু যাঁরা এই পার্সনালিটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তেমন ব্যক্তিকে বেছে নিতে বাধা নেই, যেমন আমরা কেরী, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়কে বেছে নিয়েছিলাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ক্ষেত্রে। এ যুগে স্পষ্ট দেখতে পাই দুজন লোককে যাঁদের মাথা ভিড়ের ঊর্দ্ধে উঠেছে। রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সামগ্রিক বিচারে এ দুজনের মধ্যে অবশ্য কোন তুলনা চলে না, কিন্তু গদ্যসাহিত্য প্রসঙ্গে অবশ্যই তুলনা চলে। রামমোহনের ভারতীয় মহত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে গদ্যসাহিত্য বিকাশের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান তাঁর নীচে নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের ষ্টাইল বা রচনারীতিকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। নব্য বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে রামমোহনের স্থান অবশ্যই অনেক উপরে, কিন্তু সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগের প্রসঙ্গে রামমোহনের চেয়ে ঈশ্বর গুপ্তের মূল্য অধিক।

রামমোহন নব্য ভারত স্রষ্টাদের মধ্যে প্রথম, অনেকেই বলবেন প্রধান, কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান কোথায় ? আমার ধারণা এ বিষয়ে তাঁর প্রতি সূক্ষ্ম সুবিচার করতে গিয়ে অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। রামরাম বসুর রচনার উপরে তাঁর তথাকথিত প্রভাবের

আলোচনা আগে করেছি। পরবর্ত্তীকালে অনেক মনীষী এই "সূক্ষ্ম সুবিচারের" ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করেছেন। অবশ্য তার একটা কারণ এই হতে পারে যে রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী, পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক অনেক লেখকের রচনাই গ্রন্থাকারে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল না, অন্য পক্ষে রামমোহনের রচনাবলী কখনো অমুদ্রিত ছিল না; তুলনা করে দেখবার সুযোগ ঘটেনি রামমোহনের গদ্যের প্রশস্তিকারদের। কিন্তু আরো কারণ থাকা অসম্ভব নয়। তাঁরা রামমোহনের বক্তব্যের বিচার ক'রে রায় দিয়েছেন, সে রায় গদ্যরীতির অনুকূলে ব্যবহার করা অনুচিত। তৃতীয় কারণটি মনস্তত্ত্বঘটিত। রামমোহনের বহুমুখী মহত্ত্ব এমন অর্ঘ্যকে আকর্ষণ করেছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়। রামমোহনের প্রতিভা বহুমুখী সত্য, কিন্তু সর্ব্বজন ব্যবহার্য্য গদ্য স্থষ্টির শক্তি তার অন্তর্গত নয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথের তিনটি উক্তি উদ্ধার করে আমাদের বক্তব্য বলবার চেষ্টা করবো।

"রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণ কর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।"*

আবার,

"রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন…"†

অন্যত্র তিনি বলছেন—

"রামমোহন যখন এদেশে এলেন তখন পণ্ডিতদের কাছে বাংলার কোন স্থান নেই। সাধুজনের যোগ্য বাংলা রচনার নিয়মকানুনটি পর্য্যন্ত তৈরি ক'রে তাঁকে পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হ'ল।…তারপর যে সব পণ্ডিতেরা বাংলা ব্যবহার করলেন তাঁদের ভক্তি ছিল সংস্কৃতেরই উপরে। বাংলাকে তাঁরা 'নোকর-চাকরের' মতো ব্যবহার করেছেন…। এই সব নোকর-চাকরদের উপরে তাঁরা বৃহৎ কোন কর্ম্মের ভার কখনও দেননি।"‡

* বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, র-র ৯ম।

† বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, র-র ৯ম।

‡ বলাকার ছন্দ, বলাকা পরিক্রমা, পৃঃ ৬৫, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

এখন, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা সাধারণ ভাবে রামমোহনের গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রহণ করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তিনি যে শুধু প্রথম বাংলা ভাষায় শাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রালোচনা সুরু করেছিলেন তাই নয়, তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় মৌলিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করে তার মজ্জার শক্তি বৃদ্ধি করেন।* শুধু এটুকু হলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু তা তো নয়, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে তাঁর ভাষার উল্লেখ করেছেন; পণ্ডিতজন কর্তৃক ব্যবহারের অযোগ্য বলে গণ্য "নোকর-চাকর" রূপী বাংলা ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ অপবাদ কি পণ্ডিতদের যোগ্য? এ অতিবাদ কি রামমোহনের প্রাপ্য?

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অনেকের এবং রামমোহনের সমসাময়িক অনেকের গদ্যরীতি (বক্তব্য নয়) রামমোহনের গদ্যের চেয়ে অনেক সরল, আধুনিক গদ্যের গুণে অনেক বেশি মণ্ডিত। "তাঁহার সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁহার অপেক্ষা ভাল গদ্য লিখিতে পারিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই মনীষায় বা মননে রামমোহনের সমকক্ষ না হইলেও গদ্য রচনার গুণগত উৎকর্ষে রামমোহনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।"†

রামমোহনের ভাষা সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—

"রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিত গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।"‡

* পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতগণ রবীন্দ্রনাথের উক্তি সমর্থন করেছেন।

(১) "আধুনিককালে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বাংলা দেশে দার্শনিক-জ্ঞানচর্চ্চার সূত্রপাত করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সং, পৃঃ ৩৬, শ্রীসুকুমার সেন।

(২) "রামমোহনের চিন্তার বলিষ্ঠতা এবং নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা এবং দৃঢ়বদ্ধতা তাঁহার লেখাকেও একটা বলিষ্ঠতা দান করিয়াছে।"

বাংলা সাহিত্যের একদিক, প্রথম যুগের রচনাকারগণ, ১ম সং, পৃঃ ৮৯, শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত।

† উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য—রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি, পৃঃ ৯৯, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

‡ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ১৮৭, ৬ষ্ঠ সং, রামগতি ন্যায়রত্ন।

অনেক তলোয়ারের দু'দিকে ধার থাকে—এই উক্তিটির চারদিকে ধার। প্রথমতঃ ন্যায়রত্ন বলেছেন, যে, "রামমোহনের সময়েই...বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।" আমরাও এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি। রামমোহনের সময় বলতে ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল। এই সময়টাকে আমরা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগের অন্তর্গত বলেছি। কাজেই ন্যায়রত্নের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ মতের খুব মিল আছে। তিনি বাংলা গদ্য রচনা রীতির উৎকর্ষ রামমোহন ও পৌত্তলিক মতাবলম্বী ভট্টাচার্য্য মশায়দের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন, আর সে উৎকর্ষের কৃতিত্ব যে কেবল তৎকালে লিখিত গ্রন্থসমূহের প্রাপ্য নয়, পত্রিকাসমূহের প্রাপ্য, তাও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। আমরাও কি এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি না? আমাদের বক্তব্য, এই সময় গদ্যরীতির উৎকর্ষসাধন গ্রন্থের দ্বারা তেমন হয়নি যেমন হয়েছিল সাময়িক ও সংবাদ-পত্রের দ্বারা। রামমোহন গদ্যসাহিত্যকে সর্ব্বপ্রথম মৌলিক চিন্তার বাহন করে তুলে ভাষার মহৎ উপকার করেছেন—কিন্তু ভাষায় যে গুণ থাকলে তাকে সাহিত্য বলি সে গুণে রামমোহনের কিছু ন্যূনতা স্বীকার করলে তাঁর মহত্ত্বকে অস্বীকার করা হয় এমন মনে করি না। সেকালে আর একজন মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামমোহনের ভাষা সম্বন্ধে যা বলেছেন সমালোচনার নিরিখে তা যথার্থ বলেই মনে হয়, "সূক্ষ্ম সুবিচার" ও অকারণ নিন্দার মাঝামাঝি তিনি নির্দ্দেশ করতে সমর্থ হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলছেন—"দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা আনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না।"*

এই উক্তির কি অর্থ এই নয় যে রচনায় রামমোহনের মনীষা যেমন প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যগুণ তেমন প্রকাশ পায়নি?

ঈশ্বর গুপ্তের "জলের ন্যায় সহজ ভাষা" প্রতিধ্বনি ক'রে প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের রচনা সম্বন্ধে বলেছেন—"সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।"

এখন, বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসারের ভাষা যদি "জলের ন্যায় সহজ" বা

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, তৃতীয় সং, পৃ: ৩৬—৩৭, শ্রীসুকুমার সেন।

"জলবত্তরল" হয় তবে বলতে হবে যে এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিকগণ যাকে "Heavy Water" বলেন সেই জল। তবে মূলগ্রন্থের তুলনায় তাঁর ভাষা অবশ্যই "জলের ন্যায় সহজ" বা "জলবত্তরল", কেন না মূলগ্রন্থ সংস্কৃত আর রামমোহন যা লিখেছিলেন তা বাংলা।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তথা বাঙালীর জীবনে রামমোহনের প্রভাবের গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিয়েও আমরা বলতে চাই যে বাংলা গদ্যরীতির বিকাশে রামমোহনের কলমের দান বেশি নয়। বিষয়টি প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ করেছেন—"কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহনের) অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"*

এ মত যথার্থ বলে মনে হয়। রামমোহনের গদ্যরীতি মূলে সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি, শাস্ত্রানুবাদ ও প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে অবিরাম শাস্ত্রদ্বন্দ্ব—এই তিনের ফলে তাঁর বাংলা ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হ'য়ে উঠেছে। †

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় যে উদাহরণ দিয়েছেন তা উদ্ধার ক'রে দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

"কঠোপনিষৎ: জানম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতাশ্চিতো'গ্নিরানিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ॥১০॥"

রামমোহনকৃত অনুবাদ: "প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল সে অনিত্য, আমি তাহা জানি, যেহেতু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্যবস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্যবস্তু দ্বারা স্বর্গফল

* প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০।

† তিনি আরবি ও ফারসীতে মহাপণ্ডিত ছিলেন, এ দুই ভাষার কোন প্রভাব তাঁর ভাষা-রীতির উপরে আছে কি না বিশেষজ্ঞগণ বলতে পারবেন।

সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।"*

প্রমথ চৌধুরী যে একে আধুনিক গদ্য বলেন নি, এ রীতি যে বাংলার সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নি তাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

কিন্তু রামমোহনের মতো মনীষীর পক্ষে বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অসচেতন থাকা সম্ভব নয়। যেখানে তিনি বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতির তত্ত্ববিচার করেছেন, যেমন বেদান্ত গ্রন্থের "অনুষ্ঠান" বা ভূমিকায়, সেখানে তিনি ভুল করেন নি।† কিন্তু মনীষায় দৃষ্ট সেই রীতিটি তেমনভাবে তাঁর কলমে বের হয় নি। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। যেখানে তিনি শাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রানুসরণ ছেড়ে সরাসরি মল্লযুদ্ধে নেমেছেন সেখানে তাঁর শরের কলম ধনুঃশরের ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে। পথ্যপ্রদান গ্রন্থ থেকে যথেচ্ছ উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই পুস্তিকাখানি পরবর্ত্তীকালে বিদ্যাসাগর লিখিত পুস্তিকাগুলির অগ্রদূত।

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার ফলশ্রুতি হচ্ছে যে রামমোহন তাঁর বিপুল মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে নব্য বাংলার চিত্তকে জাগ্রত করে নব্য ভারত সৃষ্টির গোড়াপত্তন ক'রে গিয়েছিলেন। নব জাগ্রত বাঙ্গালী মূলতঃ তাঁরই প্রেরণায় সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজনীতি, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি জীবনের নানাক্ষেত্রে চরিতার্থতা লাভ করেছে—তার মধ্যে সাহিত্যও আছে, কিন্তু তিনি নিজে বড় সাহিত্যিক নন। এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ভগীরথের সাধনায় গঙ্গা অবতীর্ণ হলেন তাই বলে ভগীরথ ও ভাগীরথী এক নন।

রামমোহনকে বাদ দিলে এই সময়ে যাঁরা বাংলা ভাষার চর্চ্চা করেছেন তাঁদের সকলকেই সাধারণভাবে সাংবাদিক বলা যেতে পারে; সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র রচনার জন্যেই তাঁরা কলম ধরেছেন, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রই তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন। এই দলের শ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১ম সং, পৃঃ ৯৯-১০০, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

† বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, রামমোহন রায়: বাংলা গদ্য।

তা আগে উল্লেখ করেছি, বলেছি তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ নন, বাংলা সাংবাদিক রচনার ঢঙটির তিনি আবিষ্কারক। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য সাংবাদিক গদ্য, তাঁর পদ্যও অনেকাংশে সংবাদ সাহিত্য। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনেক রচনা যে টিকে আছে তার কারণ তাঁর প্রতিভা। সাংবাদিকগণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তবু সার্থক সাংবাদিক রচনা সাহিত্য পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যে সে রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিক রচনার সম্বন্ধটি আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কেন না, এ যুগটা যে সাংবাদিকের যুগ শুধু তাই নয়, এই যুগের সাংবাদিকতা পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য স্বষ্টির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

সমসাময়িক ভাষা সঙ্কট সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—"খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে, ভরসা করি, পাঠককেও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণমাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত মাত্র না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে!···একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়বিপাক মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না, আর একদিকে ইংরাজির ভরা গাঙ্গের বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে, মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ পিনেস বজরা ক্ষুদে লঞ্চের জালায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছ সলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে।···এ সময় ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।"*

বঙ্কিমচন্দ্র যে অবস্থাকে নিজের সমসাময়িক বলেছেন তা রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরও সমসাময়িক অবস্থা বটে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে পণ্ডিতী ভাষা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই বলেছেন "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়বিপাক মলিম্লুচ" ভাষা। আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে আদালতী ভাষা বলেছেন,

* ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যার মূলে আছে মুসলমান ওমরাহ নবাবের কালচারের ছোঁয়াচ, তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন "ইংরাজির ভরা গাঙ্গের বেনো জল", কেননা ইতিমধ্যে রাজার বদল হয়েছে। হরপ্রসাদ কথিত তৃতীয় ভাষা অর্থাৎ বিষয়ী লোকের ভাষাটা গেল কোথায়? ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ সাংবাদিকগণ সেই ভাষাটি গ্রহণ করেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ রয়ে বসে ধীরে সুস্থে সাহিত্য রচনা করতে পারেন। সে সব রচনায় বিভিন্ন রীতিকে মিলিয়ে নিয়ে শ্রমসাধ্য পরীক্ষা করতে পারেন—সেটাই তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত, কেন না বিদেশী বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের অল্প সময়ে ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দান তাঁদের লক্ষ্য। রামমোহন আত্মস্থ হয়ে শাস্ত্রের অনুবাদ করতে পারেন কিম্বা কলম শানিয়ে ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে পারেন কারণ তিনি স্বাধীন। রামমোহনের স্বাধীনতাই হোক আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিশেষ উদ্দেশ্যের অধীনতাই হোক, উভয়ত্র সকলের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। এবারে দেখা দিলেন সাংবাদিক, যাঁর লক্ষ্য পাঠকসমাজ নামে অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপক এক বস্তু; লেখকে পাঠকে ক্ষীণ যে যোগ তা কোন বৃহৎ আদর্শের নয়, নিতান্তই প্রয়োজনের বা কৌতূহলের। এ শ্রেণীর রচনা ভিন্নার্থে প্রাতঃস্মরণীয় হ'লেও রাতের শিশির শুকোবার আগেই লুপ্ত হয়ে যায়। সাংবাদিকতা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নয় সত্য কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

এক হাতে 'কপি' অন্য হাতে কলম, এক চোখ ঘড়ির কাঁটায় অন্য চোখ কাগজে এমন অবস্থা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয় কিন্তু "সরস্বতীর দিন মজুর" বলে যাঁরা অযথা নিন্দিত সাহিত্যের উপরে তাঁদের অপরিসীম প্রভাব। ঈশ্বর গুপ্তের আমল থেকে অদ্যাবধি সাংবাদিকগণ কত নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, বাংলা গদ্যের কত নূতন ঢঙ সৃষ্টি করেছেন তারও হিসাব হয়নি। এসব গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। "বাধ্যতামূলক" ও "সম্পাদকীয় স্তম্ভ" শব্দ দুটোকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছেন, তবু বাধ্যতামূলক শব্দটাই চলল, "আবশ্যিক" চলল না। "পরিবেশ" ও "অবস্থা" মিলিয়ে যে "পরিস্থিতি" শব্দ, যা এখন সকলেই ব্যবহার করছেন তা সংবাদপত্রের দান। এশিয়া শব্দ থেকে কোন নিয়ম অনুসারেই "এশীয়" পদ নিষ্পন্ন হয় না, কিন্তু

ঐ বিচিত্র শব্দটিকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে সংবাদপত্রের কাছ থেকে। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আর প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ভাষাকে কখনো একদিকে কখনো আর একদিকে নিত্য মোচড় দিচ্ছে—কখনো ব্যঙ্গ কখনো ওজস্বিতা বিচিত্র রস আদায় করে নিচ্ছে, সাহিত্যে গিয়ে পড়েছে তার প্রভাব। সাহিত্যিক ইন্সপিরেশন বা প্রেরণার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু যে সাংবাদিককে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বা বিশেষ একটা সময়ে কপি দিতেই হবে, তীর্থের কাকের মতো তার তো বসে থাকা চলে না। ঠিক শব্দটি কলমে না এলে কাছাকাছি শব্দ তাকে বানিয়ে নিতে হয়, কিম্বা এক শব্দকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করতে হয়, কিম্বা ইংরাজী শব্দকে বাংলা ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিতে হয়। এমন ক'রে অনেক অপসৃষ্টি হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এমন অনেক সৃষ্টি হয় যা গ্রহণ ক'রে ভাষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্রোতের টানে নুড়িগুলো বন্ধুরতা হারায়,. সচল হ'য়ে ওঠে, প্রয়োজনের টানে আভিধানিক শব্দগুলো সচল হ'য়ে উঠছে, গ্রাম্য শব্দগুলো বন্ধুরতা হারিয়ে বেশ মসৃণ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাংবাদিকের প্রধান দান নিত্য নূতন শব্দ সম্ভার। এইসব শব্দের কতক তাঁরা সৃষ্টি করেছেন আর কতক বা প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ ক'রে স্থায়িত্ব দিচ্ছেন। আর তাঁদের অন্য একটি দান হচ্ছে ভাষাকে সর্ব্ববিষয়ে প্রকাশক্ষম ক'রে তুলছেন। রামমোহনের কলম শাস্ত্রানুবাদ করতে পারে, গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করতে পারে; মৃত্যুঞ্জয়ের কলম বিদেশী ছাত্রের পাঠ্য পুস্তকের জন্য বিভিন্ন রীতির গদ্য রচনা করতে পারে। কিন্তু সাংবাদিকের কলমকে হংসের মতো জলস্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র বিচরণ করতে হয়।

গদ্যকে সর্ব্বকার্য্যে নিয়োগ সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের একটি প্রধান কীর্ত্তি, তাদের আর একটি প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে গদ্যকে সর্ব্বজনের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। প্রতিদিন প্রয়োজনের তাগিদে যাকে লিখতে হয়, অনেক রকম কথা লিখতে হয় তার কলমের আড়ষ্টতা না ভেঙে পারে না, আর সেই সঙ্গে ভাঙতে থাকে ভাষার আড়ষ্টতা। আভিধানিক অচলতা থেকে শব্দগুলোকে ব্যবহারের স্রোতের মধ্যে টেনে না নামানো অবধি তাদের শক্তির পরীক্ষা হয় না। সেই শক্তি পরীক্ষার কাজ সাংবাদিকদের। একজন সমালোচক বলেছেন যে "The development, a little later, of the

news paper and periodical journalism generally was another factor making for the utilitarian virtue in prose."*

আঠারো শতকের গোড়াকার ইংরেজি গদ্য সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য হয়েছে আমাদের দেশের উনিশ শতকের গোড়াকার বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তার প্রযোজ্যতা স্বীকার করতে হয়।

মোট কথা এই যে, গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছতে গেলে মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, ওটা একেবারেই অপরিহার্য্য। ওতে গদ্যসাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে, শব্দসম্ভার বাড়ে, সর্ব্বকাজে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে, আর সেই সঙ্গে বাড়ে সর্ব্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা। এই সব শক্তি অর্জ্জিত না হওয়া অবধি গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হ'তে পারে না। আঠারো শতকের প্রারম্ভে যাঁরা নব্য ইংরেজি গদ্য গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমাদের দেশেও যাঁরা নব্য গদ্য গড়তে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তাঁদের প্রধান ঈশ্বর গুপ্ত এ কথা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে।

সংবাদ প্রভাকরের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"এই প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিরও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান।"†

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরের কাছে বাঙালীর ঋণের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঋণের ধরণটা কি? প্রভাকরের কোন্ গুণে বাংলা সাহিত্য ঋণী?

"সমকালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ঈষৎ পরে প্রকাশিত দ্বারকানাথের সোমপ্রকাশের (১৪ই নভেম্বর, ১৮৫৮) ভাষা অতিশয় গুরুভার ছিল। গদ্যের জড়তা মুক্তির জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকসুলভ লঘু ধরণের বাক্য

* Eighteenth Century Prose, 1700-1800, P.XV. D. W. Jefferson.

† ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গঠন অবশ্য প্রশংসনীয়। সাংবাদিক রচনা রীতির স্রষ্টা বলিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"*

এবারে ঋণের ধরণটা জানতে পারা গেল। তত্ত্ববোধিনী ও সোমপ্রকাশের ভাষার তুলনায় প্রভাকরের ভাষা হাল্কা, তার চাল দ্রুত। তত্ত্ববোধিনীর ভাষা গুরুভার, তার বিষয়গুলি জীবনের উচ্চ কোটিতে অবস্থিত। তত্ত্ববোধিনীর অভিজাত ভাষার তুলনায় প্রভাকরের ভাষা আটপৌরে। শুধু সমাজ শিক্ষা ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলে তার চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপকারিতা, শিখযুদ্ধ, ষ্ট্যাম্প কর, লবণের ও আফিমের কর সম্বন্ধে তাকে লিখতে হয়। যে আটপৌরে ভাষা সৃষ্টি কেরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের এবং সাময়িক সাংবাদিকগণের কলমে হ'ল তার পত্তন। তাঁর যে রচনাটি নিছক সাংবাদিকতা নয়, কিছু স্থায়িত্ব আছে যার, তারও প্রধান গুণ অনাড়ম্বর আটপৌরে ভাব।

"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করতঃ বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।"†

এ রীতি কেরীর অযত্নসম্ভূত সরলতা বা বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধ চন্দ্রিকার অংশবিশেষের যত্নসম্ভূত সরলতা নয়, এ সরলতা লেখকের ব্যক্তিত্ব কর্ত্তৃক ভাষার উপরে চাপিয়ে দেওয়া নয়, ভাষার ভিতর থেকে এ আপনি বিবর্ত্তিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে! তার কারণ এ নয় যে বিদ্যালঙ্কারের চেয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যগুণে বড়, আসল কারণ ইতিমধ্যে ভাষার নিজস্ব শক্তি ও নমনীয়তা বেড়ে গিয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত যে ভাষাযন্ত্র ব্যবহার করছিলেন তার তন্ত্রের সংখ্যা ও ঝঙ্কার তুলবার ক্ষমতা বিদ্যালঙ্কার ব্যবহৃত ভাষাযন্ত্রের চেয়ে অধিক। সোজা কথা এই যে বিদ্যালঙ্কারের আমলের গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্য হ'য়ে উঠবার দিকে অনেকটা এগিয়েছে।

* বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৮৫, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

† কবিবর ৺রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত

এই সময়টায় অর্থাৎ ১৮১৮ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে বাহাত্তরখানা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।* সেকালের পাঠকসংখ্যার বিচারে এই সংখ্যাকে কম বলা চলে না, বেশিই বলতে হয়। কিন্তু এই সব কাগজের প্রচার সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। ১৮৩৯ সালে সম্বাদ রসরাজ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানায় খুব অশ্লীল রচনা থাকতো—সম্পাদকের একবার কারাদণ্ডও হয়েছিল। "এই পত্রিকার অন্ততঃ চারি শত সংখ্যা নিয়মিত বিক্রীত হইত।"† সেকালের বিচারে ওই সংখ্যাকে অসাধারণ বলতে হবে, কেন না ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।‡ খুব সম্ভব রচনার অশ্লীলতাই প্রচারের প্রধান কারণ। অন্যান্য পত্রিকার অন্ততঃ অধিকাংশ পত্রিকার প্রচার এর চেয়ে কম ছিল ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রচারের সঙ্গে প্রভাবের অনুপাত ক্ল'ষে নেওয়া ঠিক হবে মনে হয় না। সেকালে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের যেমন অভাব ছিল তেমনি ছিল সময়ের প্রাচুর্য্য। এই সব কাগজই ছিল একমাত্র পাঠ্য বা প্রধান পাঠ্য। কাজেই আজকার দিনের কাগজের মতো তাদের আয়ু বেলা সাড়ে দশটায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছাড়া সাপ্তাহিক কাগজের আয়ু দৈনিকের চেয়ে দীর্ঘতর। এই সব কাগজ বাঙালীর মনকে যেমন নাড়া দিয়েছিল, তেমনি সচল ক'রে তুলেছিল বাঙালীর কলমকে, সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী বাংলা ও ফারসীবহুল আদালতী বাংলার পাশে তৃতীয় একটা পথ, সরল সুগম বিষয়ী বাংলার পথটা খুলে দিয়েছিল। বিস্তারিত উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা নামে দুই খণ্ড বৃহৎ গ্রন্থে ১৮১৮ থেকে ১৮৫০-এর সাময়িক সাহিত্য সঙ্কলিত করেছেন। সাহিত্য হিসাবে এর মূল্য সামান্যই। বাঙালীর মনের চুম্বক-শলাকার চঞ্চলতার চিহ্ন আছে এই সব রচনায়, আর আছে বাঙালীর কলমের নূতন পথ তৈরির প্রচেষ্টা। সম্বাদ প্রভাকরকে বাদ দিলে এই

* বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৮১৮-১৮৬৭), বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

† উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, সাংস্কৃতিক পটভূমিকা: পৃঃ ১৬৪ —শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

‡ তদেব।

সময়ের অন্যতর প্রধান সাময়িকপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)। আমরা ইচ্ছা করেই তার আলোচনা পরবর্ত্তী পর্ব্বের জন্য রেখে দিয়েছি। কারণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনার মূল্য নিছক সাময়িক সাহিত্যের চেয়ে অধিক, আর তার প্রভাবটাও ছড়িয়েছিল পরবর্ত্তী যুগে।

এবারে আমরা বিদ্যাসাগরের যুগের প্রান্তে উপনীত হয়েছি। সে আলোচনা সুরু করবার আগে—সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র যুগের ফলশ্রুতি উচ্চারণ করি।

বাংলা গদ্য সংসারের নিত্য চলাচলের স্রোতে এসে পড়েছে। এতকাল যা মন্থর ভাবে চলছিল, কয়েকজন বলবান মাল্লার গুণের টানে বা সরকারী সাহায্যের পালের বাতাসে, এবারে তা হাজার বৈঠার ক্ষিপ্র তাড়নে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। বৈঠাওয়ালাদের প্রধান ঈশ্বর গুপ্ত, আর হালে অবশ্যই আছেন মনীষী রামমোহন। গদ্যসাহিত্যকে ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন বলেছি। এই সব মাঝি মাল্লাদের সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লীর বাদশার খেতাব প্রাপ্তি সত্ত্বেও রামমোহন মধ্যবিত্ত ছাড়া কিছু নন। বহুজন কর্ত্তৃক বহুতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষায় এসেছে নমনীয়তা, তাতে ঢুকেছে নূতন শব্দসম্ভার তাদের ইঙ্গিত ও স্মৃতির পরিমণ্ডল নিয়ে; বেশ বুঝতে পারা যায় যে অনেকগুলো কলমের প্রচেষ্টায়, তাদের মধ্যে আনাড়ির কলমের সংখ্যাও অল্প নয়, ভাষার কর্দ্দম উত্তমরূপে মথিত হয়েছে, এবারে মূর্ত্তি গড়ে তুললেই হয়, এলেই হয় শিল্পী। এলেন "বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী" বিদ্যাসাগর।

॥ বিদ্যাসাগরের যুগ ॥

১৮৪৭—১৮৬৫

আমরা গোড়াতেই বলেছি যে বাংলা গদ্যের বিবর্ত্তন ধারাকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছি, গদ্য, গদ্যসাহিত্য আর সাহিত্যিক গদ্য। গদ্য আর গদ্যসাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ বুঝে ওঠা কঠিন নয়, কিন্তু গদ্যসাহিত্য আর সাহিত্যিক গদ্যকে অনেকের কাছে হঠাৎ কথার মারপ্যাঁচ মাত্র মনে হতে পারে। কাজেই এবারে বিষয়টাকে একটু বিশদ ক'রে নেওয়া আবশ্যক, বিশেষ যখন আমরা সাহিত্যিক গদ্যের পর্ব্বে এসে পড়েছি। বিদ্যাসাগরের

সময় থেকে, প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের হাতেই সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত। তার পরে সেই সাহিত্যিক গদ্য বিচিত্রতর ও অধিকতর পরিণত হ'তে হ'তে এগিয়ে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার ক'রে নিতে হ'লে দুটি তর্কের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। প্রথমে সাহিত্যিক গদ্য বলতে কি বোঝায় আর তার সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের হাতে কিনা। আগে সাহিত্যিক গদ্য।

বাল্যকালে পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপনে দেখতাম ব্রেজিল পাথরের কাঁচের চশমা। পাথরের কাঁচটা কি বস্তু বুঝতে পারতাম না, যদিচ জানতাম যে ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত একটি দেশ। পাথরের কাঁচের রহস্য একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ব্রেজিল দেশে এক রকম পাথর পাওয়া যায় যা ঘষলে ক্রমে কাঁচের মতো স্বচ্ছ হ'য়ে আসে, তাতেই চশমা তৈরি হয়। তাঁর এ ব্যাখ্যা সত্য কি না জানি না, কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এর প্রযোজ্যতা আছে বলেই মনে হচ্ছে।

ভাষা মূলতঃ অস্বচ্ছ পাথরের মতো, খুব নিপুণ কারিগরও তার উপরে সম্যক ভাবে নিজের বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারে না, আর যে পারে সে ঐ বক্তব্যটুকু মাত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে, তদতিরিক্ত কিছু ফুটতে চায় না সহজে সেই অস্বচ্ছ পাথরে। এখন, একথা নিশ্চয় সকলেই স্বীকার করবেন যে বক্তব্যের অতিরিক্তেই হচ্ছে সাহিত্যের সার। বক্তব্য সুলিখিত হ'য়ে উঠলে সাহিত্য হ'য়ে উঠতে পারে যেমন রামমোহনের হাতে উঠেছে। কিন্তু তার সঙ্গে বক্তব্যের অতিরিক্ত অংশ যুক্ত না হওয়া অবধি তা ভাষার উচ্চতর পদবী লাভ করতে সমর্থ হয় না। ভাষার এই উচ্চতর পদবীকেই আমরা বলেছি সাহিত্যিক গদ্য। বিবর্ত্তনের ধারায় কতকগুলি স্তর না পেরিয়ে এলে এই উচ্চতর পদবীলাভ ঘটে না ভাষার। প্রথম স্তরটা প্রধানতঃ অর্থগত, দ্বিতীয় স্তরটা তদতিরিক্তগত, তার মধ্যে আছে প্রধানতঃ প্রাঞ্জলতা, অর্থাৎ গঠন-রীতির সুষমা আর ইঙ্গিত, অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার। ভাষার এ দুই স্তর অতিক্রম যেন ভাষার দ্বিজত্ব লাভ। ভাষা যখন দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছয় তখন তা বহু ঘৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের মতো বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে, তার মাধ্যমে দৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে বস্তুনিচয়। বস্তুনিচয় বলতে দুটি, যুগ আর লেখক। একদিকে ঐ ভাষার কাঁচে পড়বে যুগের ছায়া, আবার ঐ ভাষার কাঁচে পড়বে লেখকের ছায়া। ইংরেজিতে বলে ষ্টাইলের মধ্যে লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে কম সত্য নয় ষ্টাইলের মধ্যে যুগের পরিচয়।

অবশ্য লীটন ষ্ট্রাচি আরও এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ফরাসী দেশ আর ফরাসী সভ্যতা যদি অতল সমুদ্রে তলিয়ে যায় আর তিনি যদি দৈবাৎ কুড়িয়ে পান ভলতেয়ারের একটিমাত্র গদ্যবাক্য, তবে তার মধ্যে থেকে ফরাসী দেশ আর ফরাসী সভ্যতার মর্ম্মকথা উদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ তাঁর রক্তব্য এই যে ভাষার কাঁচের টুকরোয় একটি দেশের সভ্যতার ছবিও প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব। আমরা ততদূর যেতে চাইনে, যুগ আর লেখক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবো। বিদ্যাসাগরের আগেকার বাংলা ভাষার অস্বচ্ছ কাঁচে না পড়েছে যুগের ছায়া না পড়েছে লেখকের ছায়া, সে ভাষায় শুধু বক্তব্যমাত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাই তাকে বলেছি গদ্যসাহিত্য। বিদ্যাসাগরের সময় থেকে ভাষা ক্রমশঃ স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে, তাতে ক্রমে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে লেখক—তাই এ ভাষা সাহিত্যিক গদ্য।

বিদ্যাসাগর-যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যদি—বিদ্যাসাগরের রচনা আর দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান গ্রহণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে এদের দুটি গুণ প্রধান, Harmony বা ভারসাম্য, আর Middle Manners মধ্যপন্থা অনুসরণের প্রচেষ্টা।

"যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্নপানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্নদাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন?" [ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান]

"ব্রহ্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। যেখানে এই সকল পুণ্যাত্মারা একাসীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান, এখানে তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।" [ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান]

"যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে অপহরণ করা হয়।" [বোধোদয়]

"তখন লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আর চিত্রদর্শনে প্রয়োজন নাই; আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।" [সীতার বনবাস]

এই চারটি অংশে যে ভারসাম্য ও সৌষম্য ফুটে উঠেছে, আতিশয্য ও খোঁচখাঁচ-হীন মধ্যপন্থা অনুসরণের চেষ্টা প্রকট হয়েছে তা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। ও দুই গুণ কি তা হাঁ-এর চেয়ে না-দিয়ে বোঝানো সহজ। এই পর্ব্বে লিখিত দু'খানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হুতোম পেঁচার নকসা আর আলালের ঘরের দুলাল। বই দু'খানার অনেক গুণ, কিন্তু ভাষার ভারসাম্য ও মধ্যপন্থিতা নিশ্চয় তার মধ্যে নয়। বরঞ্চ বলা যায় যে ঐ দুই গুণের অভাবেই বই দু'খানা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখে পড়েছিল যেমন প্রকৃতিস্থ পথিকের ভিড়ে চোখে পড়ে ভারসাম্যহীন মাতালটাকে, যে পথের মধ্যে দিয়ে চললেও নিশ্চয়ই মধ্যপন্থী নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের শ্রেষ্ঠ রচনায় এ দুই গুণ আছে কিন্তু পরিমাণে কম। ভূদেব নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ষ্টাইলিষ্ট বা রীতিনবিস কিন্তু তাঁর রচনারীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় যে সামাজিক প্রবন্ধে তা অনেক পরে রচিত।

এখন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারকে যদি এ যুগের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে এ যুগে বাঙালী সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রে যা আকাঙ্ক্ষা করছিল সেই সব আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যরীতিকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠেছিল এঁদের রচনায়। সেকালের বাঙালী রাষ্ট্রব্যবস্থায় চেয়েছিল স্থায়িত্ব, এই জন্যেই সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সমকালীন কোন বাঙ্গালী আকর্ষণ অনুভব করেনি, বোধ করি প্রতিনিধিস্থানীয় সকলেই ব্যাপারটাকে একটা অবাঞ্ছনীয় হাঙ্গামা মনে করেছিল। আর সমাজব্যবস্থায় চেয়েছিল হিন্দুয়ানি ও খ্রীষ্টানির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা অস্বীকার করেও হিন্দুসমাজের কুল ছাড়লেন না আর রাতারাতি চাঁদা তুলে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে হিন্দু ছাত্রদের পাদ্রীদের স্কুলে আর যেতে না হয়। দেবেন্দ্রনাথ আদর্শ মধ্যপন্থী মানুষ ছিলেন। আর শুনতে খটকা লাগলেও বিদ্যাসাগরও ছিলেন মধ্যপন্থী। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন উপলক্ষ্যে শাস্ত্রকে স্বীকার করেই লোকাচারকে অস্বীকার করেছেন। আবার জগৎকে মায়া বলে অস্বীকার করে যে বেদান্ত দর্শন তাকে তিনি এই জন্যই ভ্রান্ত মনে করেছেন, ও-শাস্ত্রে যে ঝোঁকটা একতরের উপরে, তাতে জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হ'য়ে যায়।

এখন, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এই মৌলিক আকাঙ্ক্ষা দুটি আশ্চর্য্যভাবে ফুটে উঠেছে দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের রচনায়। আর এ

যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ ভাষার কাঁচ এখানে বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে। রামমোহনও দেশের হ'য়ে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন, সে আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে, ভাষায় নয়, কেন না ভাষা তখনো ছিল অস্বচ্ছ। ভাষার স্বচ্ছতা সম্পাদনে প্রভূত সাহায্য করেছে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগ। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও অবশেষে দৈনিক নিত্য ঘর্ষণে ভাষা ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে এমন স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে যাতে পড়েছে তাতে যুগের ছায়া। এই গুণটি লাভ করেছে বলেই এ যুগের গদ্যকে বলেছি সাহিত্যিক গদ্য।

বিদ্যাসাগরী রীতি নামে একটা ভাষারীতি বাংলায় আছে কিম্বা ছিল বলাই উচিত যেহেতু ও-রীতিতে এখন আর কেউ লেখে না। এ রীতিটি সম্পর্কে যত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে এমন আর কোন রীতি সম্পর্কে হয় নি, আর তৎকালীন বাদ প্রতিবাদের জের এখনো চলছে বলা যেতে পারে। এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরব, ভাষারীতি নিয়ে বিতর্ক করবার মতো সৌখীন অবসর তাঁর ছিল না। এই বিতর্কের বিশ্লেষণ করলে বিদ্যাসাগর-রীতি সম্বন্ধে দুটি ধারণা পাওয়া যায় (১) দুরূহ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দযোগে গঠিত নীরস রচনা, (২) অনায়াসবোধ্য সরল রচনা। প্রথম মতটির প্রধান পরিপোষক ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। আর বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১২৮৮=১৮৮১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালা ভাষা নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতের প্রতিধ্বনি, খুব সম্ভব তাঁরই প্রেরণায় প্রবন্ধটি লিখিত। তবে মনে হয় পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেছিলেন।*

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্য উদ্ধার করা আবশ্যক। "ইনি (বঙ্কিমচন্দ্র) স্বনামে ও বেনামিতে বহু বার বহু স্থানে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্ত্তির উপর কটাক্ষপাত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অভিযোগ ছিল যে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতামাত্র এবং তাঁহার রচনা মৌলিক নয়, সবই হয় ইংরেজির নয় সংস্কৃতের অনুবাদ, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ

* বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—হরপ্রসাদ লিখিত ভূমিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অন্যায্য।···মোটকথা বিদ্যাসাগরের যশে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ঈর্ষ্যালু ছিলেন।··· সমসাময়িক শক্তিশালী গদ্য লেখকদিগের মধ্যে অনেকের প্রতিই তিনি অবিচার করিয়া গিয়াছেন।···আলালের ঘরের দুলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও বোধ করি কতকটা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ প্রণোদিত। বিধবা বিবাহ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের সহিত বঙ্কিমের প্রবল মতদ্বৈধ ছিল।"*

এবারে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের মন্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা ভাষা নামে প্রবন্ধটির আগাগোড়াই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিদ্যাসাগরী রীতির নিন্দা ও আলালী রীতির প্রশংসা। রামগতি ন্যায়রত্নের একটি মন্তব্য থেকে প্রবন্ধটি উদ্ভূত। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রশংসা করেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন আলালী ভাষার। বঙ্কিমচন্দ্র রামগতি ন্যায়রত্নের অভিমত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কলম ধরলেন।

তিনি লিখছেন—"এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত। ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।" †

আবার—

"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায় অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, শ্রীসুকুমার সেন, তৃতীয় সং, পৃঃ ৬৭-৬৮।

† বাঙ্গালা ভাষা—বঙ্কিমচন্দ্র।

সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধ না হয় আরো উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।"*

এবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য শোনা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে যা পরোক্ষ, হরপ্রসাদের কলমে তা প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে।

"ইংরাজি হইতে অনুবাদ একবার দেখুন। 'পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময় নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ির শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতি-ঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলা বোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।' ইংরাজি পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।"†

এবারে অন্য পক্ষের মন্তব্য শোনা যাক—যাঁরা মনে করতেন অনায়াস-বোধগম্যতাই নিন্দার কারণ। "বিদ্যাসাগর লিখিলেন সহজবোধ্য স্বাভাবিক রীতিতে। সুতরাং সাহিত্যরসবোধহীন সেকেলে পণ্ডিতেরা, যাঁহারা দুর্ব্বোধ্যতাকে রচনাদক্ষতা মনে করিতেন, তাঁহারা অনেকেই প্রসন্ন মনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন একটি চমৎকার গল্প লিখিয়াছেন—'আমাদের শুনা আছে যে, এক

* বাঙ্গালা ভাষা—বঙ্কিমচন্দ্র।

† বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ২০০, ১ম সং—হরপ্রসাদ রচনাবলী।

সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাংলায় লিখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—এ কি হইয়াছে! এ যে বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গালা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।'*"

এবার বিদ্যাসাগরের ভাষাকীর্ত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শোনা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অমর ভাবজননী রূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের মধ্যে গণ্য হয়,...তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।...বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।...বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। (গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।) গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, সুকুমার সেন, তৃতীয় সং, পৃঃ ৬৬—৬৭।

হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনিই ইহাকে পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প-প্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"*

রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই সাহিত্যিক রায়ের পরে বিদ্যাসাগরী রীতি সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যের অবসান ঘটা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় নি। আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিকে লঘু করে দেখাতে উদ্যত; তাঁরা বিদ্যাসাগরের প্রাপ্যের কতকটা রামমোহনকে, কতকটা অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথকে দান করেছেন।†

বিদ্যাসাগরী রীতি সম্বন্ধে স্বপক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ প্রায় সব শ্রেণীর মতবাদের একটা খসড়া পরিচয় দিলাম। এখানে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়া আর যাঁরা এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন—সে সমস্ত এই তিনের কোন না কোন শ্রেণীতে পড়বেই। এবারে মতগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আপত্তি এই যে, "সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস," আর এই নীরসতার অবসান ঘটালেন টেকচাঁদ ঠাকুর প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়ে।

এখন, আলালের ঘরের দুলালের সরসতার আসল কারণ প্রচলিত ভাষার মহিমা নয়, প্রচলিত ঘটনার মহিমা। টেকচাঁদ এমন একটা ঘটনাসূত্রকে উপজীব্য রূপে গ্রহণ করলেন যা সর্ব্বজন পরিচিত, যাঁর শুভাশুভের জের তৎকালীন সমাজের বহু লোকের জীবনে ভূমিকা রচনা করে চলছিল;—এতদিন কাহিনী বলতে লোকে হয় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বুঝতো নয় ইংরেজি সাহিত্যের কাহিনী বুঝতো, টেকচাঁদের কৃতিত্ব এই যে তাকে একেবারে সমসাময়িক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন; এমন বস্তু সরস না হয়ে যায় না, অবশ্য সেই সঙ্গে কাহিনীর বাহনরূপে গ্রহণ করলেন সমসাময়িক ফারসীবহুল রীতিকে। মোটের উপরে বাহনের কিছু কৃতিত্ব থাকলেও যথার্থ কৃতিত্ব কাহিনীটির। আমার তো মনে হয়, ও কাহিনী

* বিদ্যাসাগর চরিত, চারিত্র পূজা, রবীন্দ্রনাথ।

† বাঙ্গালা গদ্যের চার যুগ—ডাঃ মনোমোহন ঘোষ।

ভাষান্তরে লিখিত হলেও কমজোরি হ'তো না। বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেন যে, "যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে"—সেই ভাষাতে লিখেছিলেন বলেই আলাল এমন সরস।

উৎকট ফারসীবহুল ভাষায় তখনকার লোকে কথা বলতো কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চিত জানি ১৮৬৫ সালে বাঙালী দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাতে কথা বলতো না। তবে দুর্গেশনন্দিনী সরস লাগে কেন? কাহিনীর জন্যে। যে কাহিনী ইংরেজি উপন্যাসে মাত্র সম্ভবপর বলে বাঙালী পাঠকের এতদিন ধারণা হয়েছিল তার সম্ভাবনা এদেশে দেখিয়ে দিয়ে বাঙালী পাঠকের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু সে ভাষায় কথোপকথন করতো কে? বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলছেন যে "বিষয়ানুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।" তাই যদি হয় তবে বিদ্যাসাগরের দোষ কোথায়? তাঁর সীতার বনবাস ও শকুন্তলা যেমন "বিষয়ানুসারেই" কিছু পরিমাণে সংস্কৃতবহুল, তেমনি "বিষয়ানুসারেই" বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিতর্ক পুস্তিকাগুলি লঘু চপল; সীতার বনবাস ও শকুন্তলার ভাষার গতি যদি গজেন্দ্রগমন হয়, বিতর্ক পুস্তিকাগুলির গতি তবে টাট্টু ঘোড়ার চাল, তার চলবার বেগে চার পায়ে লেগে দেশী ভাষার লোষ্ট্রখণ্ডগুলো যে কি রকম প্রবল আঘাত করতে পারে তা জানেন "খুড়োমশাই"! আবার "বিষয়ানুসারেই" আত্মচরিতের গতি মন্থর, না হ'য়ে উপায় কি, তখনকার দিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পদব্রজে আসতে যে অনেক সময় লাগতো। আত্মচরিতের ভাষায় কোথায় "সংস্কৃতানুকারিতা"! এ ভাষা লেখকের মতোই মাইলষ্টোন লক্ষ্য করতে করতে মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে চলেছে; মেঠো পথের মেঠো ভাষা—অথচ কেমন পরিচ্ছন্ন! আর প্রভাবতী সম্ভাষণ! ভাষা এখানে অশ্রুভারে মন্থর, বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠ ঘন ঘন কমা সেমিকোলনে বিশ্রাম সন্ধান করে; একটি সরলহৃদয় শিশুর অকাল তিরোভাবে একটি সরলহৃদয় প্রৌঢ়ের স্বগত এই শোকোচ্ছ্বাসটি বাংলা গদ্যে লিখিত শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। এই রচনায় সংস্কৃত শব্দ অধিক কি অল্প তা বিচারে বসলে বুঝতে পারা যায়, পড়বার সময় নয়। প্রভাবতী সম্ভাষণ বাংলা মন্দাক্রান্তা গদ্যকাব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বলেছেন—"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।" বোধোদয়ের ভাষা আর কথামালার ন্যায় সরল ও স্পষ্ট ভাষার উদাহরণ আর কোথায় পাওয়া যাবে! শীতকালের পল্বলের

মতো শান্ত, স্বচ্ছ, অমলিন বই দু'খানার ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের যুক্তির কাছে নিজে হার মেনেছেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী হাকিম হয়েছিলেন সত্য কিন্তু ক্রান্তদর্শী উকীল হ'তে পারতেন কিনা সন্দেহজনক।

এবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাক। নৈয়ায়িক বংশের সন্তান শাস্ত্রী মহাশয় বেছে বেছে দুটি দুরূহ স্থান আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ঐ দুই অংশকে কেন বিদ্যাসাগরীয় রীতির নমুনা বলে গ্রহণ করবো? লেখকের বিচার শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়ে না নিকৃষ্ট অংশ দিয়ে? কাঞ্চনমালা আর বাল্মীকির জয়ের রীতি দিয়ে কি হরপ্রসাদের ভাষার বিচার করবো? বেনের মেয়ে আর তাঁর প্রবন্ধের অপূর্ব্ব রীতি কি তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়? তা ছাড়া যে দুটি অংশ তিনি উদ্ধার করেছেন তার যা কিছু দুরূহতা কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ সংক্রান্ত। 'ঘরট্ট' শব্দটা দুরূহ মনে হ'তে পারে, আর "অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুপাত" ও "নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে" দীর্ঘ সমাস হেতু প্রথম দৃষ্টিতে দুর্ব্বোধ্য মনে হ'তে পারে—কিন্তু "শঙ্কু" ও শঙ্কুপট্ট" শাস্ত্রী মহাশয়ের কানে দুর্ব্বোধ্য ঠেকলেও একালের কানে খুব পরিচিত। Cone ও Sun-dial অর্থে শঙ্কু ও শঙ্কুপট্ট শব্দ দুটো চলতি ভাষার অভিধান চলন্তিকায় পাওয়া যাবে। এখন, ঐ শব্দগত সামান্য দুরূহতা অস্বীকার ক'রে নিলেও ভাষার যেখানে আসল প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ যে গুণকে বলেছেন "পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষা" এবং "তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা"—শাস্ত্রী মশায় নির্ব্বাচিত অংশে তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। "ধ্বনিসামঞ্জস্য" ও "অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত" রক্ষা করেছে বলেই অংশটি যথার্থ দুরূহ হ'য়ে পড়ে নি, পাঠকের বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে সমর্থ হয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রত্যেক সংস্করণে ভাষার বদল করতেন যাতে ভাষা ক্রমশ বেশ জুৎসই হ'য়ে আসে—এ কথা আমরা শাস্ত্রী মশায়ের লেখাতেই পড়েছি।* বত্রিশ বছরে বোধোদয়ের একাশিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যদিচ শাস্ত্রী মশায়ের উদ্ধৃত অংশ বোধোদয়ের অন্তর্গত নয় তবু বলা বোধ করি অন্যায় হবে না যে কোন একটি সংস্করণ থেকে কোন একটি অংশ উদ্ধার করে তাকেই ভাষার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে আঙুল দিয়ে দেখানো ন্যায়-বিচার নয়। এসব অতিশয় স্থূল কথা, যা আমাদের মতো সাধারণ লোকে

* বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বুঝতে পারে বাংলাদেশের কুশাগ্রধী দুই মনীষী তা বুঝতে পারেন নি ভাবতে কেমন যেন লাগে। এ কি তবে রাঢ় বনাম বঙ্গ দ্বন্দ্বের রূপান্তর।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরী ভাষা নিন্দার যোগ্য, কেন না তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুসারী, আর টেকচাঁদের ভাষা প্রশংসার্হ, কেননা, তা কথোপকথনের ভাষা এবং প্রচলিত ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী কাল টেকচাঁদের ফারসীবহুল রীতিকে পরিত্যাগ ক'রে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল রীতিকে গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমের বিচারে যেমনি হোক কালের বিচারে বিদ্যাসাগর নিজের অনুকূলে রায় পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক বুদ্ধি বলেছিল যে বাঙালীর চিত্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রচুরতর আমদানি অবশ্যম্ভাবী, বাঙালীর মনকে গ্রাম্যতার ঊর্দ্ধে তুলে বাংলা ভাষাকে যদি "অমর ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের" মধ্যে স্থান ক'রে দিতে হয় তবে বহু মনীষীর অনুশীলনপুষ্ট সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেও তাই হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা বাড়তির মুখে চলেছে। আর যদি "সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুসারিতা" দূষণীয় হয় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের অপরাধের মাত্রাও বড় কম নয়।

"অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন।"

আর—

"লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ সততসঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নিলীমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

দুটি অংশেই "সংস্কৃতপ্রিয়তা" সমান, কিন্তু কোনটিই "সংস্কৃতানুকারী" নয়, সংস্কৃত শব্দগুলি এখানে বাংলা পদবিন্যাস রীতিকেই অনুকরণ করেছে। তবু যদি দোষ বিচার করতে হয়, বলব দোষ বঙ্কিমচন্দ্রেরই। বিদ্যাসাগরের

সংস্কৃত শব্দ এসেছে বিষয়ানুরোধে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে অজুহাত ছিল না, তা ছাড়া, খুব সম্ভব তাঁর প্রয়োগেও ভুল আছে, "ধবলাকার" স্থলে ধবল বর্ণ বাঞ্ছনীয়, অন্ধকারে বর্ণ দিয়ে আকারের অনুমান হ'লেও বর্ণ আর আকার এক নয়।

কথা উঠতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র এ রীতি পরিবর্ত্তন করেছেন। সত্য। বিদ্যাসাগরও এক রীতি আঁকড়ে থাকেন নি। বিষয়ানুরোধে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বই ভিন্ন ভিন্ন রীতি আশ্রয় করেছে। বোধোদয় কথামালা যে রীতিতে লিখিত সীতার বনবাস ও শকুন্তলা সে রীতিতে লিখিত নয়; আবার বিতর্ক পুস্তিকাগুলি ও আত্মচরিতের ভাষারীতি স্বতন্ত্র; আর প্রভাবতী সম্ভাষণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ঘরোয়া ও গ্রাম্য শব্দের যে নিপুণ মিশ্রণ তার তুলনা কোথায়! বিদ্যাসাগরের অনেক রীতির মধ্যে একটি মাত্রকে বেছে নিয়ে, যে দোষ তাঁর নয় সেই দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে, বাস্তবক্ষেত্রে সুবিচারক বলে যাঁর খ্যাতি ছিল তিনি তাঁর প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্রে এমন একটি অবিচার করে গিয়েছেন যার জের চলেছে অনেকদিন ধরে। এখন, সাহিত্যবিচারের রায় যাই হোক না কেন সাহিত্যসংসারে বিদ্যাসাগরী রীতি বিচিত্র উত্তর পুরুষের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সফল ক'রে চলেছে, নিষ্ফলা হয়েছে টেকচাঁদী ভাষারীতি। সাহিত্যিককে নাকের সামনে আধ হাত মাত্র আগে দেখলে চলবে না, দিগন্ত অবধি লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস সেকালে কারো যদি দুরূহ মনে হয়ে থাকে তবে সান্ত্বনার কারণ আছে পরবর্ত্তীকালের পাঠক সমাজের সাক্ষ্যে। আজকার দিনে বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর কোন ছাত্রের কাছেও সীতার বনবাস দুরূহ নয়, বোধ করি একটি শব্দের জন্যও তাকে অভিধানের সাহায্য নিতে হয় না; অপর পক্ষে আলালের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অপ্রচলিত ফারসী শব্দে হুঁচোট খেয়ে চলতে হবে শিক্ষিত ব্যক্তিকেও। টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর একই সময়ে নৌকা খুলে দিয়েছেন সত্য; তবে বিদ্যাসাগর খুলে দিয়েছেন আগামী যুগের জোয়ার বুঝে, আর টেকচাঁদ খুলে দিয়েছেন ভাঁটার টানে। তাঁর নৌকা বেধে আছে ফারসীবহুল শুষ্ক ডাঙায়, সেখানে যেতে হ'লে তপ্ত বালু আর গভীর কর্দ্দম পেরোতে হবে, অবশ্য একবার গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারলে সমস্ত শ্রম সার্থক মনে হবে ঠক চাচার সাক্ষাৎ পেয়ে। বাংলা সাহিত্যের এই অমর পামরটি দুস্তর চরের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মনে তসবি জপছে

আর আপন মনে বলে চলেছে—"দুনিয়া বুরা, মুই একা সাচ্চা হ'য়ে কি করবো ?" টেকচাঁদ মাইকেলের সঙ্গে বাজী রেখে দাবী করেছিলেন যে তাঁর প্রচলিত ভাষারীতিই চলবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে রীতি চলেনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে ফারসীবহুল রীতি বলেছেন তারই শেষ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে আলালের ঘরের দুলাল। ও বইখানা কোন নূতন রীতির সূত্রপাত করেনি, পুরাতন ধারার সমস্ত জের আপনার মধ্যে টেনে নিয়ে শরৎ সন্ধ্যার সোনার মেঘের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে সূচনা মনে করেছিলেন আসলে তা উপসংহার।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর বাল্যকালে তাঁদের বাড়ীতে একজন রাশভারি চাকর ছিল, 'কোন লোক বসে আছে' না বলে সে বলতো 'অপেক্ষা ক'রে আছেন'। কর্ত্তারা আড়ালে তার ঐ সংস্কৃত শব্দটা নিয়ে হাসাহাসি করতেন। তারপরে তিনি বলছেন যে এখন আর আমরা চাকরের মুখে সংস্কৃত শব্দ শুনলে হাসি না, কেন না, উপরতলার মুখ থেকে অনেক সংস্কৃত শব্দ চারিয়ে গিয়েছে নীচের তলায়—বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'ফিলটার ডৌন'—filter down ! এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সাহিত্য লোকমুখের শব্দ কুড়িয়ে নিচ্ছে আবার সাধারণ লোক শিক্ষিতের মুখ থেকে দুরূহ শব্দ কেড়ে নিচ্ছে—এই ভাবে উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে চলছে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দসম্ভারের চক্রাবর্ত্তন। এই চক্রাবর্ত্তন বা শব্দের আদানপ্রদান ভাষাদেহের বল বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কোন কারণে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হলে সমাজ ও সাহিত্য দুয়ের পক্ষেই আশঙ্কা। বিদ্যাসাগরের আগেও কোন কোন বাংলা ভাষার লেখক, তন্মধ্যে কেরীর নাম উল্লেখযোগ্য, বিষয়টার গুরুত্ব বুঝেছিলেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এই যে তিনি বিষয়টার তত্ত্ব বুঝেই ক্ষান্ত হননি, সেটাকে কার্য্যেও পরিণত করেছিলেন। সংস্কৃত শব্দ ও লোকমুখের শব্দের যথাযথ সমন্বয়ে ভাষাদেহে যে স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাংলা ভাষায় যা হচ্ছে, তার প্রবল ও আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের কলমে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা।" কেননা তিনি ছিলেন "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী।" এখন কবিগুরুর কথিত সূত্রটির কিঞ্চিৎ বিস্তারসাধন আবশ্যক। তিনি তো প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কী তাঁর শিল্পরীতির প্রধান গুণ

যার ফলে পরবর্ত্তীকালে এই রীতি থেকে এত বড় একটা সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হল? মানুষ যেমন উত্তরপুরুষ সমূহের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, রীতি সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু তার জন্যে বিশেষ গুণের আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে কী সেই গুণ? "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী" রূপে ভাষার একটি মধ্যগা রীতি আবিষ্কার বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই মধ্যগারীতি বলতে কি বুঝি অন্য প্রসঙ্গ উদ্ধার ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করবো। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক এডিসনের ষ্টাইল সম্বন্ধে অধ্যাপক সাদারল্যাণ্ড বলছেন—"He gave to Englishmen an example of good prose that any writer could imitate without losing his own identity ; he has a sort of neutral quality that allowed his imitators to develop their own personal idiom. If, one must have a model, Addison could hardly be bettered ; he will lead to no eccentricities or affectations, he has good manners without being mannered, and he is well within the range of the average mind."* এডিসন ইংরেজি সাহিত্যের জন্য যা করেছেন বিদ্যাসাগর তাই করেছেন বাংলা সাহিত্যের জন্য। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বোধোদয় প্রভৃতিতে ব্যবহৃত রীতিটিকে ভাষার মধ্যগারীতি বলেছি। এ রীতিতে আতিশয্য নাই, কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক নাই, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের ছাপ এখানে নাই, অথচ পদবিন্যাসে "অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত" ও মাধুর্যের অভাব নাই। ভাষাশিক্ষানবিশীর পক্ষে এ রীতি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদর্শহিসাবে গৃহীত হলে বিদ্যাসাগরের মধ্যগারীতি শিক্ষানবিশীর ব্যক্তিত্বকে চেপে মারবে এমন আশঙ্কা নাই—বরঞ্চ তার যদি ভাষাব্যবহার ক্ষমতা থাকে তবে তা এই রীতিকে গ্রহণ করেই বিকশিত হয়ে উঠবে যেমন সরল খুঁটিটাকে অবলম্বন করে লতা উঠে দাঁড়িয়ে ফুল ফোটাতে ফল ফলাতে সক্ষম হয়। বিদ্যাসাগরের মধ্যগারীতি পরবর্ত্তীকালে সাহিত্যে সার্থকতার পথ খুলে দিয়েছিল বললে অন্যায় হবে না। মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি লিখিত হওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলিই ছিল সর্বজনপাঠ্য। বাল্যকাল থেকে

* Eighteenth Century Prose—1700-1780. Introduction, 2. XVII, Ed. by D. W. Jefferson.

এই ভাষাতে অভ্যস্ত হওয়াতে লেখকের কলম ও পাঠকের রুচি একটা সবল ও সরল ইঙ্গিত পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতি অনুসরণ করলে লেখক ক্ষুদ্রতর বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে ওঠে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিরও প্রথম দিকের গদ্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির প্রভাব সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রীতির অনুকরণে কোন লেখক ক্ষুদ্রতর বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছে বলে জানিনে। এ রীতিটা সার্বজনীন পথের মতো, যে কেউ চলতে পারে এবং যথাসময়ে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ারও সম্ভাবনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির তেজী আরবি ঘোড়ার আর রবীন্দ্রনাথের ব্যোমচারী পক্ষিরাজ ঘোড়ার অনুসরণ করবে কে? এবারে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবার আগে তাঁর কীর্ত্তির সার সংক্ষেপ উপস্থাপিত করি।• হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত পণ্ডিতী রীতিটিকে গ্রহণ ক'রে প্রতিভা বলে তাকে "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য" ও "গ্রাম্য বর্ব্বরতা"র উর্দ্ধে টেনে তুলেছিলেন তিনি; সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায় তার মধ্যে "অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত" সঞ্চালিত করে দিলেন তিনি; আর সংস্কৃত শব্দ ও দেশী শব্দকে কাছাকাছি টেনে এনে তাদের ব্যবধান চুকিয়ে দিয়ে বি-সমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি; আর এই সব উপায় অবলম্বন ক'রে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যহীন ও বিশেষ এক দিকে ঝোঁকহীন সর্ব্বজন পদচারণ যোগ্য একটি মধ্যগারীতির আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী"র—এই হচ্ছে গিয়ে বিস্তারিত পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্র আলালের ঘরের দুলালের প্রশংসা করেছেন, নিন্দা করেছেন হুতোম প্যাঁচার নক্সার। একটা সুসংলগ্ন সাময়িক কাহিনী হিসাবে হুতোমের উপরে আলালের স্থান। বস্তুতঃ হুতোম কতকগুলি অসংলগ্ন ঘটনার খসড়া বা নক্সা—কলকাতা হচ্ছে সেই পট যার উপরে নক্সাগুলি স্থাপিত। কাজেই বঙ্কিমের নিন্দা ও প্রশংসা, যদি এই গুণের বিচারে হয় তবে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু ঠিক তা বলে মনে হয় না। বঙ্কিমের আপত্তি হুতোমের বর্ণনার অশ্লীলতায়, হুতোমের ভাষার অশালীনতায়। হয়তো বা আরো কিছু আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিধবা বিবাহ সমর্থন, বহু বিবাহ নিবর্ত্তক আন্দোলন সমর্থন, বিদ্যাসাগরের অনুগমন প্রভৃতি হয়তো তিনি পছন্দ করেননি। এখন, হুতোমের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করবার

সময়ে খুব সম্ভব এই সব আগুনের আঁচ লেগেছিল বঙ্কিমের মনে। আমরা এখানে সাহিত্য বা সমাজের ইতিহাস লিখতে বসিনি, কাজেই শুধু ভাষার আলোচনাটাই করবো।

বিদ্যাসাগরের, বঙ্কিমচন্দ্রের, এমন কি আলালের ভাষার তুলনায় হুতোমের ভাষা নিঃসন্দেহ অশালীন। পূর্ব্বোক্তগণের ভাষায় সর্ব্বদা একটা শৃঙ্খলা আছে, আর শৃঙ্খলা থাকলেই কিছু মন্থরতা অপরিহার্য্য। সুসংবদ্ধ সৈন্যদল যত দ্রুত চলুক নিঃসঙ্গ পথিকের গতির চেয়ে তা দ্রুত নয়। হুতোমের ভাষায় এই দুটি গুণেরই অভাব, তা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, আর তা অত্যন্ত দ্রুত। এ ভাষা যেন শব্দের ভিড়। কে কার গায়ে পড়ছে, কে কখন আসছে যাচ্ছে, কে কি বলছে ঠিক নেই, সবসুদ্ধ মিলে একটা জনতার হট্টগোল। আর সমস্তটাই অত্যন্ত দ্রুত, অনেক সময়ে মনে হয় অনাবশ্যক দ্রুত, এমন দ্রুত যে সব সময়ে বাক্যগুলি শেষ করবার অবকাশ ঘটেনি লেখকের। জনতার বাক্য শেষ হয়েও শেষ না, কারণ তার অনেকটাই কানে পৌঁছয় না। একটা উদাহরণ দি।

"অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড় ক'রে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন—আর হন হন ক'রে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ করচে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ ক'রে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম ক'রে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।"

এ হচ্ছে—"A young man in a hurry"-র ভাষা! প্রত্যেক পদের শেষে ড্যাশ চিহ্নগুলো যেন তার দ্রুতগতির তালে উড়ন্ত উড়ুনীর প্রান্ত। লেখক ছুটছেন, ভাষা ছুটছে, বর্ণনীয় বিষয় একটা আর একটার ঘাড়ে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, ঘনায়মান আকাশের নীচে ভাষার সঙ্গে পাঠক ছুটছে—হঠাৎ সম্বিৎ হল যখন "গুড়ুম ক'রে নটার তোপ প'ড়ে গ্যালো।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ ত্রিশ বৎসর পরমায়ুর গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগের মধ্যে আশী বৎসরের কর্ম্মজীবন ঠেসে ভরে দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গিয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি হুতোম প্যাঁচার নক্সা বহন করছে সেই অনিবার্য্য দ্রুত গতির চিহ্ন।

কিন্তু কী ভাষা! এ ভাষা কিছু অশালীন হতে পারে কিন্তু কী

প্রাণশক্তি। নাগরিক লোকের তুলনায় গ্রাম্য লোক অশালীন হতে পারে; গ্রাম্য লোকের বেশভূষা, আচার ব্যবহার ও ভাব ভাষা কিছু অশালীন হতে পারে কিন্তু নিছক প্রাণশক্তিতে সে কারো কম নয়। হুতোমের ভাষা, কিম্বা আরো বিশেষ ক'রে বলতে গেলে বলা উচিত, লোকমুখের যে ভাষাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্ত্তী সাহিত্যে তা বিচিত্র ফল প্রসব করেছে। এই ভাষারীতির উত্তরপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা আর খুব সম্ভব ব্রহ্মবান্ধবের সাংবাদিকতার ভাষা। বিবেকানন্দ তাঁর ভাষাকে মহত্তর লক্ষ্যে নিবদ্ধ করেছেন, বৃহত্তর প্রয়োজনে খাটিয়েছেন কিন্তু মূলতঃ দুই রীতি একই গোত্রজাত। সে গোত্রটি হচ্ছে কলকাতার লোকের নিত্যব্যবহার্য্য ভাষা। স্বামীজি ও কালীপ্রসন্ন দু'জনেই খাঁটি কলকাতার লোক এবং কলকাতার একই পাড়ার লোক। কালীপ্রসন্নের ভাষারীতির খেই হারিয়ে যায়নি, বিবেকানন্দের রচনায় তা অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায়।

"আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা সীমান্ত নেই। হরি হরি, বলি একটা কিছু ক'রে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হ'লো, কাল তার উপর ভেঁপু হ'লো, পরশু তার ওপর চামর হ'লো; আজ খাট হ'লো, কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রূপো বাঁধন হ'লো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হ'লো—চক্র গদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্ম চক্র—ইত্যাদি—"

এ ভাষা আর হুতোমের ভাষা একই ঝাড়ের বাঁশ—দুইজন অসাধারণ অসহিষ্ণু পুরুষের হাতে লাঠিত্ব প্রাপ্ত হয়ে বাঙালীর মাথার উপরে বন্‌বন্ শব্দে ঘূর্ণিত হয়েছে, লাঠির এমন আইন-বহির্ভূত ব্যবহার আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের কখনোই বাঞ্ছনীয় মনে হতে পারে না। কিন্তু তাঁর নিন্দা ও প্রশংসা সত্ত্বেও আলাল ও হুতোমের বিচিত্র পরিণতি ঘটেছে। আলালে যে একটা রীতির উপসংহার তা আগেই বলেছি। এবার উল্লেখ আবশ্যক, হুতোমে অন্য একটি রীতির সূচনা। যে ভাষারীতি হুতোমে তারই পরবর্ত্তী রূপ স্বামীজির রচনায়। আর সে রীতির রূপান্তর ক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে মনে করবার কারণ নাই। সাহিত্যমূল্যের বিচারে অবশ্যই

আলালকে হুতোমের উপরে স্থান দিতে হয়—কিন্তু ভাষার নূতন রীতির মূল্যবিচারে হুতোমের স্থান কেবল আলালের উপরে নয়—একেবারে পৃথক সারিতে। আলালে পুরাতন রীতির সমাপ্তি, হুতোমে নূতন রীতির সৃষ্টি।

আমাদের এই স্বল্পায়ুর দেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দীর্ঘজীবন একটি বিস্ময়। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র রূপে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হলেও বাংলা সাহিত্যে এর পরোক্ষ প্রভাবটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এর প্রভাব ও দান অপরিসীম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম আমলে চারজন মনীষী এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, প্রথম স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ, তার পরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা সেরে নিয়েছি, এখন, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্তর আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা গদ্যরীতির বিকাশে রাজনারায়ণ বসুর গুরুত্ব এঁদের মতো নয়, তবু আমাদের যা বক্তব্য তা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বললেই চলবে।

বাংলাদেশে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী যদি কেউ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন তবে তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। বৈজ্ঞানিক রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদীর চোখে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বিশাল ঘড়ি, এর যন্ত্রপাতি কলকব্জা সমস্তই বুদ্ধিগ্রাহ্য, সমস্ত খুলে ফেলে আবার যেন জোড়া দিয়ে নেওয়া যায়, কোথাও যে কিছু অজ্ঞেয় থাকতে পারে তা মনে হয়নি অক্ষয় দত্তর। আধুনিক পদার্থবিদ্যা বিশ্বের মধ্যে যে একটুখানি অনিশ্চয়তার আরোপ করেছে তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল, তাঁর বিশ্ব নিউটন প্রতিপাদিত 'মেকানিক্যাল ইউনিভার্স।' এখন, এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা ধারণাটি তাঁর জীবনকে এবং রচনার কলমকে চালিত করেছে। দুটি উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে আশা করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে লিখছেন—"ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।"*

* আত্মচরিত, দেবেন্দ্রনাথ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার অক্ষয় দত্তর, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বই প্রকাশিত হলে মহর্ষি বলেছিলেন যে, আমি সন্ধান করছি ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আর তিনি সন্ধান করছেন বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ —তিনি কোথায় আর আমি কোথায় আছি! এই দুটি ঘটনায় যেমন দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মতিগতির পার্থক্য বুঝতে পারা যায় তেমনি বুঝতে পারা যায় অক্ষয় দত্তর নিজের বুদ্ধিগত চরিত্র। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক বেদান্তের অভ্রান্ততা পরিত্যাগের মূলেও অক্ষয় দত্তর প্রভাব আছে। মোটের উপরে বলা অন্যায় নয় যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমারের মতো দুটি স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়া মানুষ সেকালে আর ছিল না। তবু যে তিনি অক্ষয় দত্তকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক রূপে রেখেছিলেন তার প্রধান কারণ অক্ষয় দত্তর গদ্যরচনার কলম। এখানে আমরা সেই কলমের গুণগান আলোচনায় প্রবৃত্ত আর সেই কলমের পিছনে যে মনটি বর্ত্তমান তার কিছু পরিচয় ভূমিকা-স্বরূপ দিলাম।

বাংলা গদ্যরীতি পরিণত হয়ে ওঠবার পরে জন্মগ্রহণ করলে অক্ষয় দত্ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লেখক হতে পারতেন। কিন্তু তখন অনেক অবান্তর কাজ তাঁকে করতে হয়েছে; বাংলা-গদ্যরীতি তৈরি ক'রে নিতে হচ্ছে, অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে—পুরো মনটা তিনি দিতে পারেননি বৈজ্ঞানিক সাহিত্যরচনার কাজে। তবু তাঁর প্রধান কীর্ত্তি এই যে তিনি সর্ব্বপ্রথম হাতে-কলমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে বাংলাভাষাতে যুক্তিসন্নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সম্ভব।

কিন্তু নিছক গদ্যরীতির বিচারে তাঁর আসন বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের নীচে। তাঁর রচনা যে নিয়মিতভাবে অনেক দিন ধরে দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রাজনারায়ণ বসু বলেছেন—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"* আবার বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের ভূমিকায় গ্রন্থকারও এই ঋণ স্বীকার করেছেন—"অবশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি,

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ৫ম অধ্যায়—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে আনুকূল্য করিয়াছেন।"*

কিন্তু এত সংশোধন সত্ত্বেও অক্ষয় দত্তর রচনারীতি যে খুব একটা প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ লাভ করেছিল মনে হয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর একটি বাক্য নিয়ে কিছু পরিহাস করেছেন, আর সে পরিহাস অনুচিত হয়নি বলেই মনে হয়।†

"তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃ প্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা-নিঃসারিণী, লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতি সহস্র জনের সন্তাপ-নাশক বিস্তৃতশাখাপ্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকা সংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশা-সংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কা সমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মি প্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃ প্রফুল্লকারী সুধাময়ী শারদীয়া পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।"‡

ভারতভূমির বৈচিত্র্যের এই সুদীর্ঘ তালিকা পাঠ ক'রে ম্যাসিডোনিয়াতে বসেই আলেকজান্দার বলে উঠতে পারতেন 'সত্য সেলুকাস, কি আশ্চর্য্য এই দেশ।' কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য কেন এমন হল? এ বই অক্ষয় দত্তর পরিণত বয়সে লিখিত, তার আগে ও সমকালে লিখিত রচনায় পাঠকের "অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত" করে তোলে না; তবে এখানে

---

* ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ৫ম অধ্যায়—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

† হরপ্রসাদ রচনাবলী, বাঙ্গলা ভাষা, পৃঃ ২০১

‡ "এই দীর্ঘ বাক্যটি অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম ভাগের (১৮৭০ খ্রীঃ অঃ) উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত। সম্পাদক।" হরপ্রসাদ রচনাবলী, বাঙ্গলা ভাষা—পৃঃ ২০১

এমন ঘটতে গেল কেন? এর উত্তর ইঙ্গিতে আমরা আগেই দিয়েছি। তার মনটি ছিল বৈজ্ঞানিকের। সংক্ষেপে, সাকুল্যভাবে ও যথাযথভাবে বিষয়কে বর্ণনা করেন বৈজ্ঞানিক। ভারতভূমির নিসর্গ-প্রকৃতির যে বিপুল বৈচিত্র্য দেখে, "অচিরাগত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ"—প্রকৃতিতে দেবতার আরোপ করেছিল, তারই সংক্ষিপ্ত, সাকুল্য ও যথাযথ বর্ণনা দিতে গিয়ে এই প্রমাদটি ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে যখন তিনি কর্ত্তব্য করছিলেন তখন সাহিত্যিক হিসাবে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সমাসসন্ধিপিনদ্ধ বাক্যের অতি সংহতি নব্য ভাষা প্রসন্নভাবে গ্রহণ করে না, তার প্রকৃতি কিছু শিথিলবদ্ধ। তাঁর বৈজ্ঞানিক মন ও সাহিত্যিক কলম সমপর্যায়ের হলে একটি বাক্যের মধ্যে সমস্ত বক্তব্যকে ঠেসে ভরতে চাইতো না, কিছু আলগা ক'রে সাজাতো; এ যে কেমন ক'রে সম্ভব পরবর্ত্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর তা দেখিয়েছেন। কিন্তু হরপ্রসাদের পরিহাস সত্ত্বেও মূল বাক্যটি জটিল নয়—শেষদিকের কুড়ি একুশটি শব্দে তার সরল নাতিদীর্ঘ প্রসার। তৎসত্ত্বেও যে বাক্যটি এমন বিভীষিকাময় মনে হয় তার কারণ ঐ বাক্যটির প্রধান অংশের উপরে তিনি বৃহৎ ভারতভূমির বিপুল বৈচিত্র্যের যাবতীয় শোভা সৌন্দর্য্য চমৎকারের Sky Scraper খাড়া ক'রে দিয়েছেন, দুর্ব্বল ভিত্তির উপরে আলগোছে প্রতিষ্ঠিত গুরুতর ভার নড়বড করছে, পাশ দিয়ে যেতেই ভয় করে, চড়বার কথা তো ভাবতেই পারা যায় না।

অবশ্য এটি একটি চরম দৃষ্টান্ত। একটিমাত্র দৃষ্টান্তের নজীরে তাঁর প্রতিকূলে রায় দেওয়া সুবিচার হবে না, অথচ একথা না বললেও অবিচার করা হবে যে তাঁর সমসাময়িকগণ, বিশেষ দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের দ্বারা এমন কাণ্ডটি ঘটতে পারতো না।

বিষয় অনেক সময়ে কলমের সরসতার কারণ হয়, কিন্তু সে সান্ত্বনাও ছিল না অক্ষয়কুমারের। একে তো "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড কাণ্ড" মন্ত্র জপ করতে করতে এই যুক্তিবাদীর মন শুকিয়ে উঠেছিল, তার উপরে তাঁর রচনার বিষয়-গুলিও সরস নয়, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি। চারুপাঠের চারুতা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।*

* অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আদৌ নীরস ছিলেন না। তাঁহার চিঠিপত্র যথেষ্ট সরস। কোন বন্ধুকে লিখছেন—"আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।" (ডাকটিকিট অর্থে)

উত্তম গদ্যরীতিতে ছায়াতপ থাকে, উচ্চাবচতা থাকে, পাঠকের মন জিরিয়ে নিতে পারে মাঝে মাঝে এমন চটি বা সরাই থাকে, অক্ষয় দত্তর রচনায় এ সবের কিছুই নাই। তাঁর গদ্য যেন তার স্বরে উচ্চারিত কথা। ভাষায় ধ্বনির উচ্চাবচতাজাত বৈচিত্র্য নাই, ছোট-বড় দূর-নিকট সকলের উপরেই তাঁর সমান গুরুত্ব, অল্প পড়লেই ক্লান্তি আসে, অথচ বিশ্রামের ছায়া-কুঞ্জের অভাব। একমাত্র চন্দ্রলোকের মরুভূমির সঙ্গেই তাঁর গদ্যরীতির তুলনা চলে; পৃথিবীর মরুভূমি সর্ব্বত্র সমান নীরস নয়, মাঝে মাঝে মরূদ্যান থাকে। অক্ষয় দত্তর ষ্টাইল একপ্রকার গদ্য পয়ার, তার শক্তি একান্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সীমার মধ্যে তা শক্তিমান। "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড কাণ্ড"—এই ভাবটির মধ্যেই অক্ষয় দত্তর সমস্ত রচনার রহস্য। ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য তাঁকে বিস্মিত ক'রে দিত। কিন্তু এ বিস্ময় কবির বা ধার্ম্মিকের বা দার্শনিকের বিস্ময় নয়—এ নিতান্তই জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়। তাঁর ব্রহ্মাণ্ড দীপ্ত মধ্যাহ্নের জগৎ, তার সবটাই সমান দৃশ্যমান, কোথাও রহস্যের ছায়ামাত্র ফেলতে পারে আকাশে এমন মেঘের লেশমাত্র নাই। তবু এই ব্রহ্মাণ্ড দেখে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। তবে এ কোন শ্রেণীর বিস্ময়? ঘড়ি দেখে ছোট ছেলের যে বিস্ময় অক্ষয় দত্তর বিস্ময় সেই শ্রেণীর। ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি বই নয়। আর বিধাতা (যদি থাকেন) অলৌকিক ঘড়িওয়ালা, খুব সম্ভব ডেবিড হেয়ারের স্বর্গীয় সংস্করণ, তবে ডেবিড হেয়ারের সহৃদয়তা এই স্বর্গীয় ঘড়িওয়ালাতে না থাকবারই সম্ভাবনা। নিতান্ত যুক্তিবাদীর মনেও একটুখানি কবিত্ব রস থাকলে লাভ বই ক্ষতি হয় না। লীটন ষ্ট্র্যাচি বেকন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন অংশতঃ তা অক্ষয় দত্ত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—"It is probably always disastrous not to be a poet." লীটন ষ্ট্র্যাচি আরও বলেছেন যে বেকনের মনীষা বস্তুর রহস্যভেদ ক'রে তার স্বরূপ দেখতে সমর্থ হয় নি। অক্ষয় দত্তর মনীষা ভাষার জঞ্জাল

রাজনারায়ণ বসুর মাথাঘোরার সংবাদ পেয়ে লিখেছেন—"আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখেবেন। শুনিলাম, তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিছু তন্ত্র মন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমানায় না আসিতে পারে,...আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের রস পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।" ব্যক্তিগত জীবনে সরস অথচ কলমী জীবনে নীরস দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়।

ভেদ ক'রে ষ্টাইলের রহস্যভেদ করতে সমর্থ হয়নি। যে সময়ের কথা বলছি তখন দু'জন মাত্র বাঙালী সাহিত্যিক গদ্যরীতির রহস্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক জনের কথা বলেছি—বিদ্যাসাগরের কথা। এবারে অপরজনের কথা বলবো—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গোষ্ঠীপতি ব্যক্তি ছিলেন। বিচিত্র স্বভাবের বহুতর লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে যে সামাজিক প্রতিভার আবশ্যক হয় দেবেন্দ্রনাথ সহজাতভাবে তা পেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্ম সমাজের সংগঠন তাঁর এই শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাকে লালন করবার ভার না নিলে পরবর্ত্তী কালে তা মহীরুহ হয়ে উঠতো কি না সন্দেহ। ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এখানে তাঁর সামাজিক প্রতিভা আমাদের বিচার্য্য নয়—কিন্তু সে বিচার একেবারে অপ্রাসঙ্গিকও নয়। প্রথম আমলে উইলিয়াম কেরী যেমন সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ যেমন নিজ নিজ মুখপত্রের সূত্রে সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তেমনি ক'রে বা তার চেয়েও বেশি ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তার লেখকগোষ্ঠীকে। দেবেন্দ্রনাথ যদি আর কিছু নাও করতেন তবু শুধু এই কারণটির জন্যেই অমর হয়ে থাকতেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

ধর্ম্মানুরাগের প্রেরণায় দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে একটি নূতন শাখার সৃষ্টি করলেন, ধর্ম্মোপদেশের শাখা। বাংলা সাহিত্যে এটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। হিন্দু সমাজে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা ছিল কথকতা পাঁচালী প্রভৃতিতে, সে আর এক জিনিষ। কিন্তু লিখিত গদ্যে ধর্ম্মোপদেশ বাংলাদেশে ছিল না, কারণ লিখিত গদ্যটাই ছিল নিতান্ত হালের ব্যাপার। ব্রাহ্ম সমাজের হাত থেকে বাংলাদেশ যে সব দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছে এটি তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ। পরবর্ত্তীকালে কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি একে পুষ্টতর ক'রে তুলেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় শাখাটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে বললে অন্যায় হবে না। এই শাখার সূত্রপাত দেবেন্দ্রনাথে। "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা

সকল ভোগ সকল সুখ পাইয়াছি, ক্ষণকালের নিমিত্তে যিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন, তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি; একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এতদিনে বিনাশপ্রাপ্ত হইতাম। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ।”

এ উপদেশের রচনাকাল ১৮৬০ সাল। তখনকার দিনের পক্ষে এ বাচনভঙ্গী, এ লিখনভঙ্গী আর অবশ্যই এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। ভাষা স্বচ্ছ সরল হৃদয়গ্রাহী, কারণ গভীর অনুভূতির উৎস থেকে এদের উদ্ভব।

“উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্রতারকার শোভার মধ্যে সেই সত্যসুন্দর মঙ্গলস্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়।”

রচনার মধ্যে নৈসর্গিক শোভা সৌন্দর্য্যের অবতারণা, নৈসর্গিক শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মের বিভূতি দর্শন—এ দৃষ্টিও বাংলা সাহিত্যে নূতন। এরই পরম পরিণতি রবীন্দ্র সাহিত্যে।

দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আত্মচরিত অনেক পরবর্ত্তী কালে, শতাব্দীর শেষ দশকে লিখিত, তবু এখানে তার আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। মুখ্যতঃ অধ্যাত্মজীবনের বিকাশের ইতিহাস লিখবার উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছেন আত্মচরিত। কিন্তু তাই বলে বইখানাকে নীরস বা কেবল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর পাঠ্য মনে করা উচিত হবে না। ঘটনায় ও ভাবনায়, ঘটনার চমৎকারিত্বে ও ভাবনার গভীরতায় কেমন নিপুণ গাঁথনি। একটি অধ্যায়ে যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা থাকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অভিনব ঘটনার বর্ণনা, ঝড়ের মুখে বজরার নিমজ্জন আশঙ্কা বা সিপাহি আক্রমণের ভয়ে সিমলার জনশূন্য অবস্থা; সিমলা যাওয়ার কালে যমুনা থেকে লাল কেল্লায় বাদশাজাদাদের ঘুড়ি ওড়াবার খেলা দর্শন, আবার কলকাতা ফিরবার পথে কাণপুরের কাছে বন্দী বাদশার সদলবলে উপস্থিতি দর্শন—এমন কত চমকপ্রদ ঘটনা পাঠকের কৌতূহলকে এক নিমেষের জন্যে ঘুমোতে দেয় না। আর সর্ব্বোপরি সেই দিব্য তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি ব্রহ্মের বিভূতি যাতে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। বেশ

বুঝতে পারা যায় যে কত বড় শিল্পী ছিলেন তিনি। দুঃখ হয় যখন ভাবি সেই শিল্পবুদ্ধি অবাধ চলবার সুযোগ পেলে কি সৃষ্টিই না করতে পারতো। শতাব্দীর নবম দশকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা লিখিত হয়ে গিয়েছে অথচ ভাষারীতিতে কোথাও ছাপ নেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ভাষার মধ্যগারীতি অনুসরণ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের কলম যদি জীবনের লৌকিকক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক সুখদুঃখের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতো তবে হয়তো এ পর্ব্বকে কেবল বিদ্যাসাগরের যুগ না বলে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের যুগ বলা যেত।

এবারে বিদ্যাসাগরের যুগের ফলশ্রুতি উচ্চারণ করবার সময় এলো। এ যুগের শেষে এসে দেখতে পাচ্ছি যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত ফারসীবহুল বাংলা রীতি আলালের ঘরের দুলালে একটি শেষ অক্ষয় নিদর্শন রেখে বিদায় নিয়েছে—অতঃপর আর সে রীতি অনুসৃত হয়নি বাংলা সাহিত্যে। আর দেখতে পাচ্ছি পণ্ডিতী-রীতি ও বিষয়ী লোকের রীতি অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। "শব পোড়া মড়া দাহের দল" আর "ভট্টাচার্য্যের চানার দল" যুগধর্ম্মে রেল গাড়ীর একই কামরায় একই আসনে পাশাপাশি বসতে বাধ্য হয়েছে—যদিচ এখনো তাদের অস্বস্তি ও অবিশ্বাস দূর হয়নি। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হচ্ছে ভাষার মধ্যগা রীতির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। এতদিনে এমন একটি পথ সৃষ্টি হল যাতে সর্ব্বজন, ছোট বড় সকলে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বচ্ছন্দে আপন সার্থকতার দিকে চলবার সুযোগ পেতে পারে। কেরী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত দলের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হল, সৃষ্টি হল সর্ব্ববিষয় প্রকাশক্ষম সর্ব্বজন পদচারণাযোগ্য ভাষার মধ্যগারীতি। এতদিনে শেষ হল উদ্যোগ পর্ব্বের, এবারে আরম্ভ হল সৃষ্টি কার্য্যের ; দেখা দিল মহৎ স্রষ্টার দল।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ॥

১৮৬৫—১৮৯৪

এবারে আবির্ভাব হল বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে দেখতে পেলেন যে ইতিমধ্যে মধ্যগা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যগা গদ্যরীতি বলতে কি বোঝায় তার সবিশেষ ব্যাখ্যা আগে করেছি, সেই সঙ্গে

কোন্ সামাজিক মনোভাব থেকে তার উদ্ভব তারও আভাস দিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এই মধ্যগারীতি কি ভাবে 'বঙ্কিমের মঞ্জুভাষায়' পরিণত হয়ে উঠল তা বিশ্লেষণ করবার আগে তৎকালীন সামাজিক মনোভাব সম্বন্ধে আরও একটু বলা আবশ্যক। সাহিত্যিক রীতি বা ষ্টাইল, কি গদ্যে কি পদ্যে, দুটি শক্তির প্রভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, একটি লেখকের ব্যক্তিগত শক্তি, অপরটি যুগের বা সমাজের শক্তি। লেখকের শক্তি লেখকের নিজস্ব বা একজনীন, সমাজের শক্তি তুলনায় সর্ব্বজনীন। অর্থাৎ সাহিত্যে একজনীন ও সর্ব্বজনীন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব শক্তির স্বরূপ বর্ণনা করবার আগে যুগের সর্ব্বজনীন শক্তির স্বরূপ বর্ণনা বাঞ্ছনীয়। যে যুগের কথা বলছি তখন শিক্ষিত বাঙালীর সামগ্রিক মনের সব চেয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি ভার-সাম্য ও স্থায়িত্ব। অষ্টাদশ শতকের অরাজকতার স্মৃতি তার মনের অবচেতনে সতর্ক তর্জ্জনী তুলে সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল। সেকালের বাঙালী রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতেন কিন্তু কেউ-ই কোম্পানীর শাসনের আকস্মিক অবসান কামনা করতেন না, কেন না, তাঁদের মনের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের অবচেতন স্মৃতি বলতো এরকম অবসানের পরিণাম স্বাধীনতা নয় অরাজকতা। ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় মন অষ্টাদশ শতকের অভিজ্ঞতায় অরাজকতার Complex-এ সন্ত্রস্ত ছিল। তারা কোম্পানীর শাসনের মধ্যে একাধারে একটি ঐক্য-বিধায়ক আর শান্তিবিধায়ক শক্তি দেখতে পেয়েছিল—আবার তারই মধ্যে দেখতে পেয়েছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিনিধিকে। অন্তঃসারশূন্য, আত্মরক্ষায় ও প্রজারক্ষায় অক্ষম মুঘল শাসনের সঙ্গে প্রভেদটা অত্যন্ত স্পষ্ট ঠেকেছিল তাঁদের চোখে। বিষয়টা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বুঝেছিলেন বলেছিলেন।

"চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটি লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার

প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন-ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন কোন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ ও বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।'

সত্যানন্দ বলিলেন, 'হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজ রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?'

মহাপুরুষ বলিলেন, 'ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য-শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই, সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।'

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন—'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।" [আনন্দমঠ]

কথাগুলো ইংরেজের হাকিমের মুখে হঠাৎ কেমন-কেমন মনে হতে পারে, মনে হতে পারে যে আনন্দমঠে স্বাধীনতার কথার বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলে এখন বুঝি শেষ রক্ষার চেষ্টা করছেন; মনে হতে পারে সন্তানগণের হাতে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয় বর্ণনা ক'রে 'ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না' লিখবার পরে—'ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই'—এ সত্যই শেষ রক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকে এই ভাবেই বুঝেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রকে নিন্দা করেছেন। বস্তুতঃ এর মধ্যে নিন্দনীয় যে কিছু নাই—তৎকালের সামাজিক মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

আমরা আগে বলেছি যে কোম্পানীর শাসনের মধ্যে সেকালের লোক একাধারে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিনিধিকে দেখেছিল, আর দেখেছিল সর্ব্বভারতীয় শান্তিবিধায়ক ও ঐক্যবিধায়ক একটি শক্তিকে। উল্লিখিত অংশে বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ দুটি কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। "ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।" এ হল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিনিধি ইংরেজ। আবার "ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" এ হচ্ছে সেই কোম্পানীতন্ত্র যার শাসনে দেশে ঐক্য ও শান্তি স্থাপিত হবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে বলে তখনকার লোকে আশা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য তাঁর একজনীন উক্তিমাত্র নয়—তৎকালের সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তটি বিস্তারিত উদ্ধারিত হল কেননা তৎকালীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অনুরূপ দৃষ্টান্ত

তৎকালীন ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিকের রচনাতেই পাওয়া যাবে। একদিকে তাঁরা পরাধীনতার বেদনা অনুভব করছেন, অপরদিকে ইংরাজশাসনকে সমর্থন করছেন, অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চড়া সুর তোলেননি।* এক সঙ্গে এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবকে পরবর্ত্তীকাল, যে-কালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাটাই প্রধান কথা, সেই পরবর্ত্তীকাল শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা বা সরকারী চাকরের, সেকালের অধিকাংশ সাহিত্যিক সরকারী চাকরে ছিলেন, ভ্রম সংশোধন বা গোঁজামিলের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেছে। আজ যখন ইংরেজ শাসন শ্রুতিস্মৃতির বিষয় তখন বোধ করি ধীরভাবে সেকালের মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করবার সময় এসেছে। সেকালের মনীষীদের ইংরেজ শাসনের সমর্থন আন্তরিকতাহীন ছিল মনে হয় না। পরাধীনতার বেদনা ও ইংরেজ শাসন সমর্থন একদেহে কিঞ্চিৎ অসম্ভব মনে হতে পারে—বস্তুতঃ তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কথিত "Victorian Compromise"-এর অনুরূপ একটি Compromise বা আপোষ রফা তাঁরা করে নিয়েছিলেন। এই আপোষ রফার মনোভাব জীবনে একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বেদনা জাগ্রত ক'রে দিয়েছে অথচ তখনো তাকে দূর করবার সময় এসেছে মনে করতে পারে নি; ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন সুরা আমাদের পুরাতন জীবন-পাত্রে ধারণ করবার চেষ্টা চলছে; পাশ্চাত্য Patriotismকে ভারতীয় নিষ্কাম ধর্ম্মের দ্বারা শোধন ক'রে নির্দ্দোষ করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ আপোষ সফল হয়েছে কি না সে তর্ক নিরর্থক, কেননা আপোষ মাত্রেই সাময়িক, সঙ্কটের দায় উদ্ধার ক'রে দিতে পারলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। বাংলা গদ্যরীতির ব্যাখ্যা করতে বসে যে এত কথা বলতে হল তার কারণ হচ্ছে তৎকালীন সামাজিক মনটাকে জানবার ইচ্ছা। সামাজিক মন না জানলে সামাজিককে অর্থাৎ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষকে জানা যায় না। আর যে সামাজিক মন স্বতোবিরুদ্ধের মধ্যে পদে পদে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে, এক বগ্গা ঝোঁককে এড়িয়ে যাওয়ার দিকেই যার প্রবণতা, তার কাছে সংস্কৃত ভাষাগত

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতির কাব্যেও এইরূপ বি-সম ভাবের কবিতা পাওয়া যাবে।

ও ফারসী ভাষাগত উগ্রতা দুই-ই বর্জ্জনীয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে-মনোভাব যুগপৎ ইংরেজ শাসনের বেদনা ও ইংরেজ শাসনের বাঞ্ছনীয়তা অনুভব করেছে, সমাজের ক্ষেত্রে যে-মনোভাব যুগপৎ অক্ষয় দত্তর যুক্তিবাদ ও দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদ সমর্থন করেছে, সেই মনোভাবই সংস্কৃত শব্দের ও ফারসী শব্দের আতিশয্য বর্জ্জন করেছে। বিদ্যাসাগর যে মধ্যগারীতি প্রবর্ত্তন করলেন তার প্রবর্ত্তন সমাজ মনের মধ্যেই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মধ্যগারীতিকে ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করলেন তার কারণ সমাজ মন তখন পথের দুই প্রান্তের ঐকান্তিকতা এড়িয়ে মাঝখান দিয়ে চলছিল; আর আলালের ঘরের দুলালের ভাষার প্রশংসিত উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যে সে ভাষার ছাঁচ অনুসরণ করলেন না তার কারণটাও ভাববার মতো। প্রচণ্ড আদর্শবাদিতা সত্ত্বেও যুগ মনের মধ্যে utilitarianism-এর একটা স্তর ছিল। ঐ মনোভাব থেকেই পূর্ব্ব কথিত আপোষ রফার উৎপত্তি; ঐ মনোভাব থেকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা যে বেদান্তদর্শন ভ্রান্ত দর্শন আর তার অধ্যয়নে দেশের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা, আর ঐ মনোভাবেরই প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে গদ্যরীতির রহস্য বিশ্লেষণ করছেন—শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি বলছেন "যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয় আরো উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" প্রয়োজন বা utility এখানে চরম মাপকাঠি। এবারে বুঝতে পারা যাবে টেকচাঁদের প্রশংসা সত্ত্বেও কেন আলালী ভাষা বর্জ্জন, আর বিদ্যাসাগরের নিন্দা সত্ত্বেও কেন তাঁর প্রবর্ত্তিত মধ্যগারীতি গ্রহণ। প্রয়োজন বা utility। ফারসীবহুল রীতির প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবারে নূতন যুগের নূতন প্রয়োজন, ভারসাম্যে অবস্থিত যুগের প্রয়োজন ভারসাম্যে অবস্থিতি ভাষা রীতির।

কোন ভারসাম্য অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, চিরকাল তো নয়ই। বাঙালী সমাজের পূর্ব্বোক্ত ভারসাম্যেরও অবসান ঘটবার সময় হল। কেন এমন পরিবর্ত্তন ঘটতে চলল তা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন নয় কেন এমন ভারসাম্য ঘটেছিল তার ইতিহাসটাও; বৃহৎ ইতিহাসের হস্তক্ষেপটাই আসল কারণ। হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল যে

সামাজিক ইতিহাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দ শার্দূলবিক্রীড়িতের লয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারা গেল যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস নূতন কোন সঙ্গমের মোহানার কাছে এসে পড়েছে, সেখানে আগেকার নিয়ম আর চলবে না। প্রধানতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টি আর অর্থনৈতিক অবস্থা বদলের ফলেই এমনটি ঘটতে চলল, বাঙালীর ভাগ্যে এতকাল যে বৃহস্পতির দশা চলছিল এবারে সূচিত হল তার অবসান কাল। তাই আবেদন-নিবেদনের থালায় ফুলের অর্ঘ্যের বদলে দেখা দিল খড়্গ, আর অন্নের থালাটাও কিনা রিক্তপ্রায়। ভারসাম্যে অবস্থিত যে নৌকাখানা এতকাল সমতলে চলছিল এবারে তা একদিকে কাৎ হয়ে ছুটলো, আরোহীরা হাঁকছে সামাল, সামাল, রক্ষা করো।

এখন সহজেই অনুমেয় যে সমাজ মনের এহেন অবস্থা গদ্যের পূর্ব্বোক্ত মধ্যগারীতিকে আর অনুসরণ করবে না, ভারসাম্যচ্যুত মন পথের মাঝখানটা ছেড়ে এসে একটা প্রান্ত ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করবে। করলোও তাই। নূতন গদ্যরীতির উদ্ভব হল যাকে আমরা একটা ভুল নাম দিয়ে অভিহিত করেছি কথ্যরীতি। কোন্ সময়ে এটা ঘটলো? বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ১৮৯৪ সালে। তারপর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সূচনা ঠিক কুড়ি বছর। এটা একটা সংক্রমণের অবস্থা—যার প্রভাব প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পরে। কথ্যরীতির কিছু কিছু পরীক্ষা আগে হয়ে থাকলেও ঐ সময়ে সবুজপত্রে তার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। দেখতে পাচ্ছি যে সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তন আর নূতন ভাষারীতির সূচনা একটা নির্দ্দিষ্ট বন্দরে এসে যোগাযোগ ঘটিয়েছে। তর্ক উঠতে পারে এই যোগাযোগ কাকতালীয় না কার্য্য-কারণগত। এ তর্কের সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা সেটাই হচ্ছে আলোচনার বিষয়। অতএব বিষয়টাকে বিশদ আলোচনার জন্যে রেখে দিয়ে এবারে আমরা পিছনে ফিরে যাব—যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির অঙ্কুরোদ্গম দেখে এসেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে কয়েকটি মূল কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

রস-সাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাসাদিতে ভাষারীতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি সব সময়ে দেখবার সুযোগ হয় না, কেন না ইচ্ছা করলে ভাষারীতিতে কিছু ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। কাহিনীর মনোহারিত্ব পাঠকের মনোহরণ ক'রে নিয়ে যায়,

রচনার ক্রটি অনেক সময়ে চোখে পড়ে না। রস-রচনায় এ ভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাসাদি রস-রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, প্রায় সমপরিমাণ প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি রচনা ক'রেছেন। কাজেই রস-রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি মিলিয়ে তাঁর ভাষারীতি পর্য্যবেক্ষণ করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলোই বয়স্ক বাঙালী পাঠককে প্রথম বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে আনলো। তার আগে বিদ্যাসাগরের রচনার বহুল প্রচার হয়েছিল সত্য কিন্তু সে-সব ছিল "পাঠ্যপুস্তক", পাঠকের স্বাধীন ইচ্ছা সেখানে অচল। তাছাড়া পাঠক অল্পবয়স্ক বলে দোষগুণ-সন্ধানী-দৃষ্টি তেমন সক্রিয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক বয়স্ক, স্বাধীন, কাজেই দোষগুণ সম্বন্ধে সচেতন। তারপরে আরো মনে রাখা আবশ্যক যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল রস-রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, অনেককাল সাময়িক পত্র পরিচালনা করেছেন, কখনো বা সম্পাদকরূপে কখনো বা সম্পাদকের সিংহাসনের অন্তরালবর্ত্তী প্রধান শক্তিরূপে।

আরো একটা কথা। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো আপনার সময়ের অখণ্ড অধীশ্বর ছিলেন না, একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হাকিম ছিলেন, বস্তুতঃ লিখবার অবকাশ তাঁর অত্যন্ত অল্প ছিল। এই অত্যন্ত স্থূল বাস্তব সত্যটি তাঁর ভাষারীতি গড়ে তোলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। যে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হাকিমকে সাড়ে দশটায় আদালতে গিয়ে বসতে হয়, সকালবেলাতে তার পক্ষে দপ্তর খুলে বসা সম্ভব হয় না। আদালত থেকে ফিরতে পাঁচটা ছ'টা বেজে যাবে। তারপরে কিছুক্ষণ যায় নকল সারতে। সন্ধ্যাবেলায় আসেন বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্য-সতীর্থগণ। তাঁরা চলে গেলে আহারান্তে নিদ্রার সময় থেকে চুরি করা দণ্ড প্রহরগুলি ছাড়া কখন্ তিনি লিখবার সময় পেতেন তা তো জানিনে। অবশ্য যখন লম্বা ছুটি নিতেন তখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখন এই সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্যেই তাঁকে খুব হিসেব ক'রে লিখতে হতো, বাহুল্যের সুযোগ একেবারেই তাঁর ছিল না। যেখানে একটি শব্দে চলে সেখানে দুটি শব্দ ব্যবহার, যেখানে বিশেষণ না হলেও চলে সেখানে বিশেষণ ব্যবহার তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর বিশিষ্ট বাক্যরীতি হাকিমের রায়ের মতো ছাঁটাকাটা; তাঁর অধিকাংশ বাক্য পুলিশের বেতগাছের মতো ক্ষিপ্র ও লঘু; তাঁর অধিকাংশ বাক্য পুলিশের রুলের মতো হ্রস্ব অথচ ফলপ্রদ; তাঁর প্রত্যেক উপন্যাস যেন সমগ্র উপন্যাসখানার শেষতম খণ্ড,

অলিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডগুলিকে তিনি যেন ঠেসে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন ইঙ্গিত-বহুল শেষতম খণ্ডখানার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির তুলনা করলে দেখা যাবে সময়ের অধীশ্বরতা ও অনধীশ্বরতা মস্ত প্রভেদ ঘটিয়েছে। অখণ্ড সময়ের বারিসিঞ্চনে রবীন্দ্রনাথের বাক্যগুলো কাহিনী ও বিষয়ের বিতানের উপরে লতায়িত হতে হতে কোন একটা সময়ে কোন একটা স্থানে পৌঁছে পুষ্পিত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ঋতুপুষ্প পর্য্যায়ের, তার শোভা সৌরভ বর্ণবিভ্রম কম নয় কিন্তু সমস্তই একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আর শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই বা কেন, সেকালের অধিকাংশ বাঙালী লেখক সরকারী চাকরে ছিলেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ সুদক্ষ সরকারী চাকরে ছিলেন, টানাটানি ছিল তাঁদের সময়ের—আমার কেমন যেন ধারণা তাঁদের সকলের ভাষারীতির উপরেই এই Time Factor-এর প্রভাব স্পষ্ট। কথাটা কতখানি সত্য বলতে পারিনে কিন্তু ভেবে দেখবার যোগ্য।

এই প্রাথমিক কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির আলোচনায় নামা যেতে পারে। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কিন্তু তাঁর ভাষারীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সময় নিয়েছে। কাহিনী ঘটনারূপে সহজে হৃদয় অধিকার ক'রে নেয়, ভাষারীতিকে অনেক পূর্ব্ব সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। তাঁর ভাষারীতির একজন প্রধান সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগরের ভাষার গোঁড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের রীতিকে তিনি এক রকম ভাষার চাটনি মনে করতেন, বিদ্যাসাগরের ভাষাভোজের মাঝে মাঝে যা চেখে নিয়ে মুখের স্বাদ ফিরিয়ে নেওয়া চলে। এখন এ উক্তি গম্ভীরভাবে আলোচনার যোগ্য নয় যদিচ আহত বঙ্কিমচন্দ্র সেইভাবেই করেছিলেন। ন্যায়রত্নের উক্তিকে সংক্ষেপে বিদায় দিলেও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যকে এত অনাড়ম্বরে ও সংক্ষেপে বহির্দ্বার দেখিয়ে দিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাংলা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা, অপর দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকারি-

দিগের নাম 'শব পোড়া মড়াদাহের দল' রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা 'শব' বলে তাহারা 'দাহ' বলে, যাহারা 'মড়া' বলে তাহারা তৎসঙ্গে 'পোড়া' বলে, কেহই 'শবপোড়া' বা 'মড়াদাহ' বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষাদোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্যাচার্য্যের চাণা' নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।"*

শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তির প্রতিধ্বনি পরবর্ত্তীকাল পর্যন্ত চলে এসেছে; একাধিক সাহিত্যিক ও সমালোচক বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা আলালী-রীতি ও বিদ্যাসাগরী-রীতির সংমিশ্রণে গঠিত হয়ে উঠেছে।† আমাদের ধারণা এ মতটি অভ্রান্ত নয়, আর এ ভ্রান্তির কারণ টেকচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সাম্য নয়, কাহিনীর সাম্য। টেকচাঁদ সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলতে সুরু করলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তাই করেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতির কাহিনী আলালের মতো ঘরের কথা না হলেও ইংরেজি উপন্যাসের কৃপায় তাকে গ্রহণ করবার জন্যে মনের মধ্যে ভূমিকা রচিত হয়ে অপেক্ষা করছিল, অবশেষে "বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"‡ কাজেই মনে করা অন্যায় হবে না যে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সমালোচকগণ আলাল ও বঙ্কিম উপন্যাসে কাহিনীর সাম্যকে ভাষারীতির-সাম্য বলে ভুল করেছেন। আর কাহিনীতে সাম্য থাকলে ভাষারীতিতে কতকটা সাম্য এসে যাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু তাই বলে একের রীতিকে অন্যের রীতির অনুরূপ বা অনুকরণ মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া যে যুক্তি বা তথ্যের বলে শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকে "শবপোড়া মড়াদাহের" ভাষা বলে বা অন্যপক্ষ "ভট্যাচার্য্যের চাণা" বলে রব ওঠালেন তা কতকটা অলীক কল্পনা, নিতান্তই

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—২য় সং, ২৮৩-২৮৪ পৃঃ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
† (১) বাংলা গদ্যের চার যুগ—মনোমোহন ঘোষ।
(২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
‡ প্রবাসী আশ্বিন, ১৩৩৮, রবীন্দ্রনাথ।

ঝোঁকের মাথায় উতোর চাপান। এক্ষেত্রে আসল পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হচ্ছেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁদের অনুকারিগণের হয়ে ওকালতি করতে চাই না, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ অভিযোগ অবাস্তব, অথবা দু'জনের ভাষাকেই একই সঙ্গে একই অর্থে শবপোড়া মড়াদাহের ভাষা বা ভট্যাচার্য্যের চাণা বলা যেতে পারে। অসম প্রকৃতির শব্দ ব্যবহার যদি শবপোড়া মড়াদাহের তাৎপর্য্য হয় তবে বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতে ও বিতর্ক পুস্তিকায় যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে। তর্ক উঠতে পারে বিষয়ানুরোধে এমন হয়েছে। অবশ্য তাই, কেননা বিষয়ানুরোধেই ভাষারীতি গড়ে ওঠে। আর দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ যদি ভট্যাচার্য্যের চাণার রহস্য হয়—তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোকে সে দোষ থেকে মুক্ত বলা যায় না। তবে যে সে দোষ খুব প্রকট হয়ে ওঠেনি তার কারণ কাহিনীর সজীবতায় সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শবপোড়া মড়াদাহের আর এক নাম গুরুচণ্ডালী দোষ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তো এই কথাটিই বোঝাতে চেষ্টা করছি যে বাংলা গদ্যরীতির বিবর্ত্তনের একটি প্রধান লক্ষণ শব্দের জাতিভেদ লোপ। ভিন্ন জাতির শব্দ ক্রমে কাছাকাছি আসছে, তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটছে, সংস্কৃত ও দেশী শব্দে, সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দে সংমিশ্রণ ঘটে সম্পূর্ণ নূতন সব শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা আদৌ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকছে না, সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ভোজে সম্মানের আসন লাভ করছে। সমাজে যে প্রক্রিয়া চলছিল তারই অনুরূপ সুরু হয়ে গিয়েছিল সাহিত্যে। যুগটাই যে গুরুচণ্ডালী। রেলগাড়ী-ষ্টীমার প্রভৃতির কৃপায় এক কামরায় এক বেঞ্চিতে গুরু চণ্ডাল পাশাপাশি বসে চলেছেন। ভাষারীতিতে তারই ছাপ।

এ পর্য্যন্ত গেল নেতি নেতি। এবারে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। আমাদের ধারণা বিদ্যাসাগরী রীতির ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের রীতি আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত পণ্ডিতী রীতি ও বিষয়ী লোকের রীতির সংমিশ্রণ, আমরা যাকে বলেছি ভাষার মধ্যগা রীতি। এই মধ্যগারীতিটিই বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহীত হয়ে পুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে বঙ্কিমী রীতিতে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক আলালের ভাষার প্রশংসা, বিদ্যাসাগরের ভাষার নিন্দা অনেকের ভ্রান্ত ধারণা

জন্ম দিয়েছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী রীতি গ্রহণ না করে আলালী রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় অধ্যাপক সুকুমার সেন এই মতটি খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখছেন—"বিদ্যাসাগরের রচনারীতি অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য লেখা সুরু করেন। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাভঙ্গি মোটামুটি হিসাবে বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি আশ্রয়ী। ...মৃণালিনীর মধ্যেও বিদ্যাসাগরী এবং স্বকীয় রীতির মিশ্রণ পাই। .. ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে ধীর গম্ভীর বিদ্যাসাগরী রীতি যে কতটা উৎকর্ষ পাইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই কপালকুণ্ডলায়। ...বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসে এমন অংশ দুর্লভ নয় যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের লেখার মতো বোধ হইবে না।...

'কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চক্র-বাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল, গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে।' (রজনী)*"

আপাততঃ নিজ মতের সমর্থনে অধ্যাপক সুকুমার সেনের অভিমত উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম, বিস্তারিত আলোচনা ধীরে সুস্থে পরে করব—এই প্রবন্ধের সেটা একটা প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই বিস্তারিত আলোচনায় নামবার আগে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বয়ং লেখকের আদর্শ জেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক, সৌভাগ্য এই যে কাজটি কঠিন নয়—বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থলে বিশদভাবে, স্পষ্টভাবে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের আদর্শ ঘোষণা করেছেন।† এই প্রবন্ধ চারটির মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা' থেকে আগে কতক অংশ উদ্ধার করে আলোচনা করেছি, পরে আরো কতকটা উদ্ধার করব। 'বাঙ্গালার নব্য-

* বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য, তৃতীয় সং, পৃঃ. ১০৫—১০৯।

† ২(১) বঙ্গদর্শন পত্রের সূচনা (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৯)।

(২) বাঙ্গালা ভাষা (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫)।

(৩) ধর্ম্ম ও সাহিত্য (প্রচার, পৌষ, ১২৯১)।

(৪) বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন (প্রচার, মাঘ, ১২৯১)।

লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' থেকে কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবো, কালের হিসাবে সবচেয়ে পরবর্ত্তী কালে লিখিত হওয়ায় এটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণততম মতবাদ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তা ছাড়া, সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ বলে উদ্ধার করতেও সুবিধা। বারোটি সূত্রের চারটি এখানে উদ্ধৃত হল।

(ক) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সহিত গণ্য করা যাইতে পারে।

(খ) যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

(গ) অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

(ঘ) সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।*

এখন এই চারিটি সূত্রের প্রথম দুটি সাহিত্যে নীতি সংক্রান্ত আর শেষের দুটি রীতি সংক্রান্ত. অবশ্য এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কখনো ভোলেন নি, যে সাহিত্যে নীতি ও রীতি ভিন্ন কোঠার বস্তু নয়। শেষ দুটির মধ্যে আবার শেষেরটি শ্রেষ্ঠ, কেননা এর মধ্যে বঙ্কিম-সাহিত্যের তথা যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রীতি সম্পর্কিত চূড়ান্ত কথা বলা হয়েছে। "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।" বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটির উপরে বিশেষ জোর দিতে চাই, কেননা, একেই কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ ক'রে বঙ্কিমের রচনারীতি যাচাই করতে করতে আমরা অগ্রসর হব।

* বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ।

এবারে বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি।*

"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।"

এখানে আগেকার উক্তির শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে সরলতার সঙ্গে স্পষ্টতা শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তারপরে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যে সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে তাও বলা হয়েছে—আরো বলা হয়েছে যে সেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে ভাষার অসাধারণতা সহ্য করা আবশ্যক হতে পারে—কিন্তু সরলতা ও স্পষ্টতাকে খর্ব্ব করে নয়।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত কষ্টিপাথরখানা হাতে করে তাঁর ভাষারীতি পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে মনে হয়। কিন্তু তার আগে বঙ্কিম-চন্দ্রের বিভিন্ন রচনার ও বিভিন্ন রীতির একটা খসড়া সম্মুখে উপস্থাপিত রাখা আবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র সরলতাকে রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মনে করতেন। "রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা।" "কেন না লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো।" "তবে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।" এখন সরলতা ও শব্দের একটু অসাধারণতার মধ্যে যাতে বৈষম্য না ঘটে, ভারসাম্য বজায় থাকে, একে অপরকে ছাপিয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে কে? কোথাও পড়েছি, এখন ঠিক মনে পড়ছে না, বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রশ্নটি কেউ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে অঙ্গুলি দিয়ে নিজের কান দেখিয়ে দিলেন। কানের উপরে ভার—ভারসাম্য বজায় থাকছে কি না লক্ষ্য রাখবার। অপর একটি সূত্রে তিনি বলেছেন যে "সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।"

এখন এই আদর্শ যে রক্ষিত হচ্ছে, লেখনী সে সীমা লঙ্ঘন করছে না তা

* বাঙ্গালা ভাষা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ।

দেখবার ভার কার উপরে। বঙ্কিমচন্দ্রকে এ প্রশ্ন কেউ করে নি, কিন্তু তাঁর হয়ে উত্তর দেওয়া যায় যে এদিকে লক্ষ্য রাখবে লেখকের মন। মার্জ্জিত মন ও শিক্ষিত কান লেখকের প্রধান সহায়। অতএব দেখা গেল যে সরলতা ও স্পষ্টতা রচনার প্রধান ও প্রথম গুণ, কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো, আরও দেখা গেল যে সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের লক্ষ্য। এ কার্য্যে প্রধান সঙ্গী ও সহায় লেখকের মার্জ্জিত মন ও শিক্ষিত কান। এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির আলোচনার ভূমিকা প্রস্তুত কার্য্য শেষ হল বলা যেতে পারে।

রচনার প্রধান ও প্রথম গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে আয়ত্ত করতে পারেননি। দীর্ঘকাল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। "বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর।" যেখানে একটি শব্দ ব্যবহার করলে চলে সেখানে দুটি ব্যবহার করতে তিনি চাইতেন না। শব্দভাণ্ডারের সমস্ত দরজা যাঁর কাছে উন্মুক্ত তাঁর পক্ষে এ কাজটি সহজ নয়। আর কোন কারণে একটির স্থানে দুটি শব্দ ব্যবহার করলে তখনি তার কৈফিয়ৎ তিনি দিতেন। শেষ জীবনে লিখিত অসমাপ্ত একটি রচনা থেকে এই রকম একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—যদিচ গল্পের পাত্রগণের জবানীতে কথিত তবু তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।*

* নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী।

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি ? ভূত আছে ?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল।—একটু রোষ্ট মাটন প্লেটে করিয়া, ছুরি-কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক, আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণকার্য্য সমাপন করিল। পরে, একটু সেরি দিয়া, গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "Rather laconic।" সারদাকৃষ্ণ রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না।

এখন সারদাকৃষ্ণের মতো বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময়ে গুরুজনের খাতিরে কিম্বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে একটি শব্দের স্থলে দুটি শব্দ ব্যবহার করতেন; এমন যে করতে হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তা স্বীকার করেছেন। সেইজন্যেই আগে বলেছি যে উপন্যাস বা রসসাহিত্যে ভাষারীতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না, তার জন্যে তাকাতে হবে প্রবন্ধাদি রচনার দিকে। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ দুই জাতের রচনাই ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর সরলতা ও স্পষ্টতা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেই রসরচনায় গদ্য-রীতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি শাখা-প্রশাখায় কিছু আচ্ছন্ন, আর সত্য প্রকাশ যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেই নিবন্ধাত্মক রচনায় তা এক নজরে ধরা পড়ে। ঐ শাখা-প্রশাখার অলঙ্কারটাকে আর একটু চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট গদ্যরীতিকে বলেছি ভাষার মধ্যগা পন্থা। এবারে সেই উপমাটাকে বদলে বলা যেতে পারে যে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বৃক্ষের সরল সবল উর্দ্ধোত্থিত কাণ্ডটির মতো, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে আছে তেজ ও রস, অর্থাৎ প্রাণশক্তি, যার ফলে বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়ে আপন সত্তা ও স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছে। এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে সেই কাণ্ডের উপরে শাখা-প্রশাখা দেখা দিল, যা ছিল অন্তর্নিহিত তা হয়ে উঠল স্বতঃপ্রকাশ। এই বৃক্ষের অলঙ্কারটাকে আরো খানিকটা চালিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে শাখাগুলি পুষ্পিত ও ফলিত, আর শুধু তাই নয়, এতকাল যে মধুকণ্ঠ পাখীগুলো কাব্যকুঞ্জে বাসা বাঁধতো তারা এই গদ্যের

যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন "Laconic! বরং একটি কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত' আছে—আমার বলিলেই হইত 'না'। আমি বলিয়াছি 'ভূত? না।' 'ভূত' কথাটি বেশি বলিয়াছি, কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মাটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল। তখন বরদা বলিল, "Seriously সারি। ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"

সারি। না।

(এই ভুতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বঙ্কিম জীবনী। শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত।)

মহীরুহে এসে গান জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু অলঙ্কার অলঙ্কার বই নয়, তার উপরে বেশি টানাহেঁচড়া সহ্য হবে না। অতএব প্রসঙ্গান্তর।

প্রথম তিনখানি উপন্যাস রচনা করবার পরে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্র প্রকাশ করলেন। এই পত্র একটি বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটালো তাঁর গদ্যরীতির উপরে। বঙ্গদর্শন পত্রের অধিনায়করূপে তাঁকে উপন্যাস ছাড়াও নানা জাতের রচনা লিখতে হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি সব রকম রচনাই তিনি লিখেছেন। এ একরকম সাংবাদিকতা। তাতে সুবিধা হল এই যে তাঁর যে কলম উপন্যাসের পথে মন্দ গতিতে সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জ্জন করছিল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে তার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শন পত্রের অধিনায়কতার অভ্যাস তাঁর কলমকে বহুল পরিমাণে মার্জ্জিত ও ভারমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। বোধ করি সব সাহিত্যিকেরই কিছুদিন সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করা মন্দ নয়, তাতে বৃথা বাগাড়ম্বর ঝরে গিয়ে সরলতা ও স্পষ্টতা অর্জ্জনের পথ সুগম হয়ে ওঠে। অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল সন্দেহ নাই। এতকাল তিনি যে-সব রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, এবারে এমন অনেক রচনায় হাত দিলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য প্রকাশ। এতকাল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে শব্দের অসাধারণতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এখন সে দায়িত্ব না থাকাতে তাঁর রচনারীতি কোষমুক্ত শাণিত অসির মতো প্রকাশিত হয়ে পড়লো, দেখা গেল যে তা যেমন সরল তার লক্ষ্যটাও তেমনি স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রস-সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাংবাদিকতার একটি ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে শেষ পর্য্যন্ত চলেছিল; প্রথম, বঙ্গদর্শন পত্রের প্রথম দুই পর্য্যায়, পরে প্রচার ও নবজীবন পত্রদ্বয়।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়, সে গদ্য অতিশয় ভয়াবহ।

(১) "যে লপনেন্দু শত শত সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অণুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্রভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।"*

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম সংস্করণ।

এই ভাষার নমুনা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্ত ভীত হয়েছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন—

"ইহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু [বঙ্কিম] যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন।……রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন।"*

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে অনুপ্রাসলোলুপ ছিলেন, কিন্তু এ একেবারে গুরুমারা বিদ্যা।

ললিতা তথা মানসের ১৮৫৬ সালে লিখিত বিজ্ঞাপনটি আর একটি দৃষ্টান্ত।

(২) "সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার।"†

গদ্যের এই নমুনা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সুহৃদ অক্ষয় সরকার মন্তব্য করেছিলেন—

"১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপনপাঠে মনে হয়, এই গদ্য সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।… সমস্ত লেখাটি পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রং এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম সংস্করণ।

† গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক, ভূমিকা, বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছিলেন।"*

অক্ষয় সরকার খুব সম্ভব বন্ধুপ্রীতিবশে ন্যূনোক্তি করেছেন—এ গদ্য শুধু বিদ্যাসাগরীয় প্রসাদগুণ থেকে বঞ্চিত নয়—এ গদ্য ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষাকেও হার মানায়। মাত্র কয়েক বৎসর পরে যিনি নূতন গদ্যরীতির প্রবর্ত্তন করবেন ১৮৫৬ সালে তিনি গদ্যরচনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছেন।

তার কয়েক বৎসর পরে, দুর্গেশনন্দিনী রচনার প্রায় পিঠপিঠ, পাওয়া যায় Rajmohon's Wife-এর বঙ্কিমকৃত অনুবাদের ভাষা।

(৩) "মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বসতি-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্নে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল, মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল, এবং সদ্যশয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধূত করিতে লাগিল।"†

এ ভাষা দুর্গেশনন্দিনী-রচয়িতার ভাষা বটে আর বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ এর সর্ব্বত্র দুগ্ধে নবনীতের মতো অদৃশ্যভাবে বিরাজিত। আখ্যানের স্রোত বঙ্কিমচন্দ্রের কলমকে ভাষার যুগোচিত খাতে টেনে নিয়ে এসেছে।

রাজমোহনের স্ত্রীর অনুবাদ থেকে আর একটা অংশ উদ্ধার করছি।

(৪) "মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বকৃশিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে

* বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ১২৭, ১৩১, অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)।

† রাজমোহনের স্ত্রী, ১ম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ। বঙ্কিমকৃত এই অনুবাদ দুর্গেশনন্দিনী রচনার আগে না পরে কোথাও তার উল্লেখ পেলাম না। যদি আগে হয় সত্যই বিস্ময়কর, আর যদি পরে হয় তবে অনুবাদ অসমাপ্ত রাখবার কারণ বুঝতে পারা যায়—বঙ্কিমের কল্পনা তখন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি রোমান্সের পক্ষিরাজে আরূঢ়, সামাজিক আখ্যানের ঘরোয়া সূত্র টেনে চলবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না।

ঢলাঢল্। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখনো কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আস্‌মান থেকে পড়েছে?—তাই ত বটে! ওর সঙ্গে ওটি কে?"

ভাষার এই নমুনা দেখে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিদ্যাসাগরী রীতির সঙ্গে আলালী রীতি মিশিয়ে বঙ্কিমী রীতি গঠিত। এ মত গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ উদ্ধৃত অংশ সংলাপ, মুখের ভাষা, কাজেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বভাবের অনুকারী; তারপরে নমুনাটিতে আলালের সচেতন অনুকরণের প্রয়াস স্পষ্ট; অনুকরণে ভাষার বনিয়াদ গড়ে ওঠে না; তা ছাড়া বঙ্কিমী উপন্যাসের সংলাপের এ ঢঙ নয়, বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আশমানী ও বিদ্যাদিগ্‌গজের রসালাপ শুনলেই বুঝতে পারা যাবে। অনেকে যে এই ভ্রমে পড়েছেন তার মূলে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান প্রবন্ধে লিখেছেন—

"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

এই উক্তিটি অবিকল গ্রহণ করতে কিছু বাধা আছে। প্রথমতঃ "আদর্শ বাঙ্গালা গদ্য" বলে কিছু আছে কি না, কিছু সম্ভব কি না সেটা বিবেচ্য। গদ্যরীতি সর্ব্বদা গড়ে উঠবার মুখে, যুগে যুগে তার পরিবর্ত্তন ঘটছে। যার স্বভাবটাই হচ্ছে পরিবর্ত্তিত হওয়া তাকে আদর্শ বলা যায় কি না সন্দেহ। তবে সাময়িক ভাবে কোন একটা রীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যের তৎকালীন ক্ষেত্রে সে আদর্শরীতি কি? তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদের ভাষা যদি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত পণ্ডিতীরীতির বিশুদ্ধ রূপ হয়—আর তাঁর কথিত ফারসীরীতির শিল্পসম্মত রূপ যদি হয় আলালী-রীতি, তবে বিদ্যাসাগরী রীতির স্থান কোথায়? তিনি এ দুই রীতিকে সমন্বিত করতে চেষ্টা করেছেন এ কথা তথ্যসম্মত নয়, কেন না আলাল প্রকাশের অনেক আগে বিদ্যাসাগরের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বিদ্যাসাগরী ভাষারীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছিলেন হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী কথিত বিষয়ী লোকের রীতিটিকে, তাকে মার্জ্জিত, উন্নীত ক'রে বিদ্যাসাগরী রীতিতে পরিণত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে ভাষার সমন্বিত রীতি বলেছেন তা কাদম্বরীর ভাষা ও আলালের ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত নয়—তার বনিয়াদ গোড়া থেকেই ছিল, অস্পষ্ট পদরেখা রূপে ছিল, কাজেই সকলের চোখে পড়েনি; এতকাল পরে বিদ্যাসাগরের হাতে তা স্পষ্ট, প্রশস্ত ও সুগম হয়ে উঠল; বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই গ্রহণ করে স্পষ্টতর, প্রশস্ততর ও অধিকতর সুগম করে তুলেছেন। ফারসী ভাষা শিষ্টসমাজের ভাষা হিসাবে লোপ পাওয়ায় আলালী রীতির পথটা হঠাৎ কানাগলিতে শেষ হয়ে গিয়েছে—তবে তাঁর আখ্যানবস্তুর অভিনবত্বের ইঙ্গিত পরবর্ত্তী কাল অবশ্যই গ্রহণ করেছে।

অতঃপর দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হল। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত পাঠক বুঝতে পারলো যে সাহিত্যে নূতন একটা কিছু আবির্ভূত হয়েছে। রমেশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন—"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ব দেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"*

রবীন্দ্রনাথের মত সুবিদিত, কাজেই বিস্তারে উদ্ধার অনাবশ্যক।

এই আবির্ভাবের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ কাহিনীর আকর্ষণ—কিন্তু কাহিনী যে ভাষারীতি অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করলো তার আকর্ষণটাও কম নয়। এখানে আমরা সেই ভাষারীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত। এই ভাষারীতির আদর্শ সরলতা ও স্পষ্টতা। কি ভাবে সেই আদর্শের দিকে বঙ্কিমের ভাষারীতি 'স্খলন পতন ত্রুটি'র মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন যথাসাধ্য তাই দেখাতে চেষ্টা করবো। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস থেকে নদীর বর্ণনা উদ্ধার ক'রে বিষয়টির আলোচনা করা যাক। নদী বর্ণনায় বঙ্কিমের বড় আনন্দ ছিল, তাঁর কবিপ্রাণ বেশ মুক্তির স্বাদ অনুভব করতো।

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১।

মৃণালিনী তাঁর প্রথম পর্ব্বের তৃতীয় উপন্যাস। বইখানা থেকে দুটি অংশ উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি।

"একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব্ব প্রাবৃট-দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃটকাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবন-তাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।"*

দ্বিতীয় অংশটি—

"বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথাও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল-তরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারি-সমাগমজনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়ন-পথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধি; চন্দ্রকরপ্রতিঘাতী-শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীর-বিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল। হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।"*

দুটি অংশই বঙ্কিম-বিনিন্দিত 'সংস্কৃতানুকারী' বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত, এমন কি সমাস সন্ধি ও তৎসম শব্দের আধিক্য হেতু তারাশঙ্করের কাদম্বরীর রীতিও বলা চলতে পারে। তবে বঙ্কিমের ছাপও স্পষ্ট, ভাষার এ ছন্দ বঙ্কিমের নিজস্ব। তৎসত্ত্বেও দুটি অংশের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে, ভাষায় নয়, অন্যদিকে। প্রথম অংশটি লেখকের চোখ দিয়ে দেখা, দ্বিতীয় অংশটি দেখা কাহিনীর নায়ক হেমচন্দ্রের চোখ দিয়ে; প্রথম অংশটি কাহিনীর সঙ্গে জড়িত, দ্বিতীয় অংশটি জড়িত নায়কের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে, ওটি কেবল কাহিনীর অংশমাত্র নয়, কাহিনীর অঙ্গীভূত। 'সরলতা' বলতে শুধু সহজবোধ্য শব্দসম্ভার বা তাদের সুশৃঙ্খল বিন্যাস বোঝায় না, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যুক্তিবিন্যাস এবং কাহিনীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীদের জীবন বা মনস্তত্ত্বের মধ্যেও বিন্যাস

* মৃণালিনী। ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড।

বোঝায়। এটি অনেক ঔপন্যাসিক বোঝেন না বলে তাঁদের বর্ণনা কাহিনীর পিঠে বোঝা হয়ে থাকে, অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে কাহিনীর পুষ্টিসাধন করে না। দ্বিতীয় অংশে যে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে তা হেমচন্দ্রের বিশেষ মনোভাবের সঙ্গে জড়িত, তার চোখ দিয়ে দৃষ্ট। প্রথম বর্ণনাটির দ্রষ্টা লেখক বঙ্কিমচন্দ্র।

এবারে পরবর্ত্তী উপন্যাস বিষবৃক্ষ থেকে আর একটা নদী-বর্ণনা উদ্ধার করছি, মৃণালিনী প্রকাশের পরে চার বৎসর কাল মাত্র অতিবাহিত হয়েছে, রচনা আরও কিছু আগে, কেননা বিষবৃক্ষ ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। অংশটি পড়লেই দেখা যাবে যে লেখক ইতিমধ্যে কত দ্রুত 'সরলতা ও স্পষ্টতা'র দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

"নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন; তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী

উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।"*

এখানে দেখা যাবে যে সন্ধি সমাসের জট খুলে গিয়েছে, অযথা তৎসম শব্দের আধিক্য আর নাই, তার জায়গায় এসেছে তদ্‌ভব ও দেশী শব্দ, আর পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ থেকে সঙ্গীত আদায় করে নেওয়া হয়েছে, এ নদী নিতান্তই লৌকিক, আমাদের চিরদিনের পরিচিত। মৃণালিনীর গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের বর্ণনা থেকে কত তফাত। গঙ্গাযমুনার বর্ণনায় কেবল নদীদুটিকেই দেখেছিলাম, এখানে নদীর সঙ্গে নদীতীরের সমাজকে দেখতে পাচ্ছি, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতী, কিশোরী, বালক বালিকা সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নদীর দর্পণে প্রতিবিম্বিত। আকাশের পাখীগুলোও বাদ পড়েনি। আর অশথ-পাতার শিষে ঘনীভূত শিশিরবিন্দুটির মত সমস্ত অনুচ্ছেদটির শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূয়োদর্শন গোটা দুই আপ্তবাক্যরূপে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—"হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে, আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে, পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না, তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।" অনুচ্ছেদের শেষে আপ্ত বাক্য প্রয়োগ বঙ্কিমের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। আর সমস্ত নদীদৃশ্যটি নায়ক নগেন্দ্রনাথের অক্ষিগোলকে প্রতিফলিত, "নগেন্দ্রনাথ দেখিতে দেখিতে গেলেন।" এখানে নদী দৃশ্যটির উপরে জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কারণ সন্ধ্যাবেলা এই নদীতেই ঝড় উঠে কাহিনীর তরীকে ভিড়িয়ে দেবে কুন্দনন্দিনীর গ্রামের তীরে। সরলতা ও স্পষ্টতা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র যা বুঝেছেন এখানে তার একটি চূড়ান্ত প্রকাশ।

বঙ্কিমের অন্য রচনা থেকে আরো দুটি নদী বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্রশেখর ও দেবীচৌধুরাণী থেকে।† এ বর্ণনা দুটির ভিন্ন জাত। বঙ্কিমচন্দ্র

* বিষবৃক্ষ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

† চন্দ্রশেখর, তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ, পর্ব্বতোপরি।
দেবীচৌধুরাণী, ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

যে বলেছেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে শব্দের অসাধারণতা মাঝে মাঝে সহ্য করা যেতে পারে, এখানে এ দুটি তারই দৃষ্টান্ত। প্রথমটিতে নদী একটি moral force-এ পরিণত হয়েছে, মানুষের পাপ-পুণ্যের সে যেন বিচারকর্ত্তা। দ্বিতীয়টিতে নদীর ব্যক্তিত্ব ও দেবীর ব্যক্তিত্ব মিলে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছে ; নদীর দিকে তাকালে দেবীকে দেখি, দেবীর দিকে তাকালে নদীকে দেখি। কখনো দেবী, কখনো নদী—দুই-ই সমান রহস্যময়ী। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে শব্দের অসাধারণতার সার্থকতম ব্যবহার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পৌঁছবার আগে আর এমনটি দেখতে পাওয়া যাবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত নিসর্গ বর্ণনায় গদ্যরীতির যে বিকাশ ও অগ্রগতি দেখা গেল তারই প্রায় অবিকল অনুরূপ দেখা যাবে নায়িকা বর্ণনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে রূপবর্ণনার কিছু বাড়াবাড়ি ছিল, সে ঢেউ এসে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, তবে রবীন্দ্রনাথে আর বাড়াবাড়ি নেই, শরৎচন্দ্রে রূপবর্ণনার একেবারেই অভাব। রূপটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার আর প্রয়োজন হয় না, পাঠকের চোখ ইতিমধ্যে বেশ রূপগ্রাহী হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এমন ছিল না, অনেক কথা এখন যা বলবার দরকার হয় না, তখন তা বুঝিয়ে বলতে হতো।

দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার রূপ সবিস্তারে বর্ণিত, এমন কি আশমানীর প্রতিও লেখকের কলম বিরূপ নয়। প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রায় সমস্তটাই তিলোত্তমার রূপবর্ণনা, আর সে বর্ণনা হিন্দিতে যাকে 'নখশীখ' বর্ণনা বলে তাই। আবার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রায় বারো আনা অংশ আয়েষার রূপবর্ণনায় পূর্ণ, সে বর্ণনাও 'নখশীখ'। তুলনায় বিমলা ও আশমানীর বর্ণনা অনেক কম, তারা তো নায়িকা প্রতিনায়িকা নয়, নিতান্তই গৌণ চরিত্র। সবগুলি বর্ণনাতেই কবিত্ব আছে, রূপসন্ধানী দৃষ্টির অভিনবত্ব আছে, কিন্তু এগুলি লেখক কর্ত্তৃক কথিত, ঘটনার স্বাভাবিক প্রবাহের অন্তর্গত নয় বলেই ঘটনা-প্রবাহের পক্ষে বাধাস্বরূপ। পাঠক এগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে ঘটনা-প্রবাহের সন্ধান করে। কাজেই এ সব সরলতা ও স্পষ্টতার পরিপন্থী। দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিমাণে এই ত্রুটি শুধরে নিয়েছেন। সমুদ্রতীরে প্রথম কপালকুণ্ডলা সন্দর্শন উপলক্ষ্যে তার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে কাহিনীর পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল। সমুদ্রের গম্ভীর মনোহর দৃশ্য, সমুদ্র

তীরের ভয়াল রহস্যময় দৃশ্য, সন্ধ্যাসমাগমজনিত অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক—এই সমস্ত ভাবের ঘনীভূত রূপ যেন কপালকুণ্ডলায়। "মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না। নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।"* নবকুমারের বিস্ময় কপালকুণ্ডলা গদ্য কাব্যের একটি প্রধান উপাদান, সেই উপাদানের বহির্মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলা, এ দুয়ে মিলে কপালকুণ্ডলা কাহিনী। তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মোতিবিবির রূপবর্ণনা বিস্তারিত। কিন্তু একটিও নিরর্থক নয়। কপালকুণ্ডলা সন্দর্শনে নবকুমারের যে বিস্ময় উপজাত হয়েছিল, মোতিবিবি সন্দর্শনেও সেই বিস্ময়। "নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।" এখানেও সেই বিস্ময়, যে বিস্ময় কপালকুণ্ডলা কাব্যের একটি প্রধান উপাদান আগে বলেছি। মোতিবিবির রূপের চমক গল্পের স্রোতকে ত্বরান্বিত করেছে, যেমন গল্পের উৎসকে উৎসারিত করে দিয়েছে অনৈসর্গিক-রূপময়ী কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব।

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর বর্ণনা নাতিবিস্তারিত সন্দেহ নাই, ওটুকু নিছক বর্ণনার খাতিরেও চলতে পারে, কিন্তু লেখক তা করেননি, তিনি রূপবর্ণনাকে চরিত্রবিশ্লেষণের কাজে লাগিয়েছেন। কুন্দনন্দিনীতে যে অপার্থিব কিছু আছে, সে যে আর দশজনের মতো শুধু রক্ত-মাংসের উপাদানে গঠিত নয়, সংসারের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে সে যে অনভিজ্ঞ—এই কথাগুলি বোঝাবার উদ্দেশ্যে কুন্দনন্দিনীর রূপ বর্ণিত। আজকালকার ঔপন্যাসিক হলে কুন্দনন্দিনীর মনস্তত্ত্ব বোঝাতে যে কয়টি পরিচ্ছেদ নিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই কয়টি ছত্র মাত্র নিয়েছেন। তাঁর মতো অপ্রগল্‌ভ ঔপন্যাসিক আর আছে কি না জানি না।

আরো পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণকান্তের উইল ও সীতারামের মতো পরিণত কলমের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আর কখনো এক লপ্তে দীর্ঘ রূপবর্ণনা করেননি। রোহিণী ও শ্রীর সাকুল্য রূপবর্ণনা আয়েষা বা তিলোত্তমার সমান না হলেও

* কপালকুণ্ডলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

খুব কম নয়, তবে সে বর্ণনা এক লাগাও নয়। গল্পের প্রয়োজন অনুসারে টুকরো টুকরো ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে, কাজেই তা কাহিনীর ভার না হয়ে অংশ হয়ে উঠেছে। নিসর্গ-বর্ণনা ও রূপ-বর্ণনার ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে গোড়ায় যা ছিল কাব্যধর্ম্মী এবং লিরিক-ভাবাপন্ন শেষের দিকে তা নাট্যধর্ম্মী ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাট্যমঞ্চ বহির্ভূত নাটক।

শেষের দিকের বর্ণনাগুলো গল্পের অঙ্গীভূত হওয়ায় সহজেই প্রবেশ করে পাঠকের মনে, বাধা হতে পারতো প্রথম দিকের সুদীর্ঘ বর্ণনাগুলো, কিন্তু তা যে হয়নি তার কারণ কৌতুকরস ও আত্মীয়তাবোধ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি জানেন এ দুটি তাঁর রচনার বিশেষ গুণ। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের হিউমার প্রসঙ্গে যাকে শুচি শুভ্র হাসি বলেছেন কৌতুকরস তারই বিচ্ছুরিত আভা। এ আভা যার উপরে পড়ে তাকে উজ্জ্বল ও হৃদ্য করে তোলে—দীর্ঘ বর্ণনাগুলোকেও ক'রে তুলেছে। আর আত্মীয়তাবোধের দ্বারা তিনি পাঠক পাঠিকাকে কাছে টেনে এনে আসরভুক্ত ক'রে নিয়েছেন, কারো উত্তরী ধরে টেনে, কারও আঁচল ধরে টেনে বসিয়ে নিয়েছেন কাছে। এই উপায়ে তিনি তাদের গল্পের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নায়ক নায়িকাদের মধ্যে পাঠক পাঠিকাও আছে—আর তারা মোটেই গৌণ পাত্র পাত্রী নন। লেখকে পাঠকে এই সহযোগিতা আছে বলেই দীর্ঘ বর্ণনা ক্লান্তিকর হয়নি—দু'পক্ষের মিলনে এগুলো সহজবাহ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য থেকে এই সহযোগিতার রীতিটি বিদায় নেওয়ায় সাহিত্য-রচনার কাজ দুরূহ হয়ে উঠেছে। সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত বিষয়ের উদাহরণ অনাবশ্যক—তাই সে কাজে নিবৃত্ত থাকলাম।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধজাতীয় রচনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি যে এই শ্রেণীর রচনাতে তাঁর গদ্যরীতির বিশুদ্ধ ও নিরাভরণ মূর্ত্তিটি দেখতে পাওয়া যাবে—উপন্যাসে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুরোধে স্বভাবতই তা শাখা-প্রশাখায় আচ্ছন্ন।

বঙ্গদর্শন পত্র প্রকাশের সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধজাতীয় রচনার সূত্রপাত। এই উপলক্ষ্যে যে 'পত্রসূচনা' লিখিত হয়েছিল, তার কিয়দংশ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে (পত্র সূচনা)। আর বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগকে তাঁর শেষ জীবনের প্রবন্ধ রচনারীতির নিদর্শন বলে গ্রহণ করলে

অন্যায় হবে না। প্রকাশ কালের হিসাবে এ দুয়ে কুড়ি বৎসরের ব্যবধান। মাঝখানে আছে অনেক রচনা ও অনেক ধরণের রচনা। এখন এই সময়ে লিখিত রচনার ধারা অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে রচনারীতির আদর্শ গোড়া থেকেই স্থির ছিল, আত্মশক্তিতে অধিকতর আস্থা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শের দিকে তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সরলতা ও স্পষ্টতার সার্থক সাধনার ফলে প্রকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ তাঁর করায়ত্ত হয়েছে, অযথা অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করেননি, আবার প্রয়োজনের তাগিদে এসে পড়লে ত্যাগও করেননি, আর বিদ্যা প্রকাশ না করেও বিদ্যার যে সারবস্তু 'কালচার'—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন রচনার মধ্যে। কাজের সুবিধা হবে আশায় এখানে তাঁর প্রবন্ধজাতীয় রচনার একটি তালিকা প্রদত্ত হল।*

এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বিষয়ীর চেয়ে বিষয়ের গৌরব অধিক, যুক্তির সূত্রে তথ্য বা ভাবকে গেঁথে তুলতে হয়, অবান্তর কথা বা অনাবশ্যক অলঙ্কার আমদানি করতে গেলে সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার রীতির আত্মপ্রকাশের আদর্শ ক্ষেত্র হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ। উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, আর প্রবন্ধ তাঁর বিশিষ্ট রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দুটি মানুষ ছিল—একজন কবি, একজন নৈয়ায়িক, মূলাজোড় ও ভাটপাড়া কোনটাই দূরবর্ত্তী নয়

* প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল
বিজ্ঞান রহস্য	১৮৭৫
বিবিধ সমালোচনা	১৮৭৬
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী	১৮৭৭
প্রবন্ধ পুস্তক	১৮৭৯
সাম্য	১৮৭৯
কৃষ্ণ চরিত্র	১৮৮৬
বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ	১৮৮৭
ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ, অনুশীলন	১৮৮৮
বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ	১৮৯২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)	১৯০২

কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্য রস-সাহিত্যের অন্তর্গত বিবেচনায় এই তালিকায় ধরা হল না। 'পাঠ্যপুস্তক'গুলোও বাদ দেওয়া হল। গ্রন্থের নাম ও সময় সাহিত্যসাধক চরিতমালা থেকে গৃহীত।

কাঁঠালপাড়া থেকে। এই কবি মানুষটির আত্মপ্রকাশ উপন্যাসে, নৈয়ায়িকের আত্মপ্রকাশ যেমন প্রবন্ধে। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অনেক সরল, সকল শ্রেণীর রচনাতেই তিনি কবি।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন বয়সে লিখিত প্রবন্ধের কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল, প্রবন্ধগুলি বিষয়েও বিভিন্ন। এতক্ষণ সাধারণভাবে যে সব নিয়মের উল্লেখ করেছি, আশা করা যায়, দৃষ্টান্তগুলিতে তাদের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

"আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই—বড় বড় বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব আছে ; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও ধর্মনীতি, এ সকলের অভাব নাই ; চাঁদনীর চকে জুতা কিনিলে বিনামূল্যে অনায়াসে শিখিতে পারা যায়। জুতা বাঁধা কাগজ পড়িলেই হইল। স্কুলের ছেলে বিস্তর ; উমেদারও অনেক ; সকলের চাকুরী জুটে না, কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেন না কেহ পরিশোধের প্রত্যাশা করে না ; মুদ্রাযন্ত্র অতি সুলভ। লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযুক্তি —সুতরাং অন্ন বস্ত্রের যাদৃশ অভাব—বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধের তাদৃশ অভাব নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিবেচনা হইয়াছিল যে, দর্শন বিজ্ঞানাদির কথা যাহাই হউক, কাব্য সমালোচনা কিছু কঠিন ; কেন না দর্শনাদি শিখিলে তদ্বিষয়ে লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য যে, তাহারই কিছু ছড়াছড়ি অধিক। মা সরস্বতীর অনুগ্রহ!" [ভূমিকা, বিজ্ঞানরহস্য]

দুর্গেশনন্দিনীর গদ্যরীতি থেকে লেখক অনেক এগিয়ে এসেছেন। দুর্গেশনন্দিনীর সংস্কৃতবহুল বাক্যগুলি প্রাণায়ামে অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে এক নিশ্বাসে পাঠ অসম্ভবপ্রায়। এখানে ছোট ছোট বাক্য বা বাক্যাংশে মৌখিক আলাপের ছন্দঃস্পন্দ ধ্বনিত, আবার বিষয়ের খাতিরে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ একীভূত হয়েছে বাক্য মধ্যে ; শব্দে গুরুচণ্ডালভেদ আছে—কিন্তু সে ভেদ ব্যবহারের গুণে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

"সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুকায়িত, তখন দেখা

যায়, মণ্ডলের চারি পার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটিমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে 'করোনা' বলেন। কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। কিরীটমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। ঐ সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ, কখন অন্যপ্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল কপিশ।" [আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত]

অক্ষয় দত্ত লিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে উপরি উদ্ধৃত অংশটির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারা যাবে। দুটির বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও একটি গদ্য সাহিত্যের মাত্র অন্তর্গত, অন্যটি সাহিত্যিক গদ্য।

"পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মত হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমিদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, 'তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।' পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমিদারী নিরিক টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির

সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২৲ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা এক টাকা ১৲ দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।" [সাম্য]

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি পুরাপুরি কথ্য ভাষার প্যাটার্ন বা ছাঁচে গঠিত। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার সত্ত্বেও এই রীতিকে কথ্যভাষার নমুনা বলে গ্রহণ করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমন নহে। কিন্তু তাহা হয় না। কৃষকে পেটে খাইলে জমিদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।" [বঙ্গদেশের কৃষক]

এখানেও ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ কিন্তু ভাষার ছাঁচ লেখ্য নয়, কথ্য।

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না। ভিখারী "জয় রাধেকৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধেকৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি;

বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধেকৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।" [প্রথম পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণচরিত্র]

কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধকে ঊনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলা যেতে পারে। এই তিনখানির মতো যুক্তিশৃঙ্খলাসমন্বিত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আর নাই মনে করা অন্যায় নয়। রচনা এখানে সরল ও স্পষ্ট বলাই যথেষ্ট নয়—এ রচনার মেরুদণ্ড একনিষ্ঠ লজিক।

"গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একেবারে দেশত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন?

গুরু। দুঃখ কি?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই? সে কি কথা? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে?

গুরু। তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্ম্মের ফল?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের।

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্ম্মের ফল।"

[অনুশীলন। ধর্ম্মতত্ত্ব]

ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় দীর্ঘ ও দুরূহ গ্রন্থ গুরু-শিষ্য সংবাদে রচিত। স্বল্পাক্ষরে অনেক কথা ও গভীর কথা বলায় বঙ্কিমচন্দ্রের জুড়ি নাই বাংলা সাহিত্যে।

পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এই রীতিটি অনেক পরিমাণে খণ্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যগণের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা আশা করা অন্যায়—কিন্তু এই স্পৃহনীয় রীতির ধারাটি তাঁরা লুপ্ত হতে দেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য যে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য—পরবর্ত্তী কালে তা আগাছার অরণ্যে পরিণত হয়েছে। আর এর জন্য রবীন্দ্রশিষ্য ও রবীন্দ্রবিদ্রোহী দুই পক্ষেরই সমান দায়িত্ব। গ্রীক ভাস্কর্য্যে মেদবাহুল্যহীন পেশীসুঠাম যে সব বীরমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যেন তারই অনুরূপ। ধর্ম্মতত্ত্বের ভাষা আবার তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'সরলতা ও স্পষ্টতা' বলেছেন আলঙ্কারিকগণ তাকেই বোধ করি প্রসাদগুণ বলে থাকেন। প্রসাদগুণ বাচ্যার্থের সহজবোধ্যতা নয়। তা যদি হতো, প্রমথ চৌধুরী বলেন যে তা হলে কালিদাসের চেয়ে মল্লিনাথের টীকায় প্রসাদগুণ বেশি থাকতো, কেন না, যেখানে কালিদাস দুরূহ মল্লিনাথ সেখানে সরল ও স্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর মতে প্রসাদগুণ হচ্ছে মনের আলো। লেখকের মন থেকে ঐ আলো বিষয়ের উপরে ঠিকরে পড়ে তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, সমস্ত সরল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ মনের আলো ব্যাপারটার আমরা ব্যাখ্যা ও বিস্তারসাধন ক'রে বলতে পারি মন ও ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া। মনের নিয়ম মানুষে মানুষে ভিন্ন নয়—তা যদি হতো তবে দাঁড়াবার এক সমতলের অভাবে সংসারটা পাগলা গারদে পরিণত হতো। আর ব্যক্তিত্বে মানুষে মানুষে ভেদ। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এক মানুষ অপর থেকে ভিন্ন। মনের প্রভাবে সাম্য, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসাম্য। একই সঙ্গে পাচ্ছি সাম্য আর অসাম্য। এখন এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনেই ষ্টাইলের চূড়ান্ত রহস্য নিহিত। দুটো দুই জাতের ঘোড়া, ভিন্ন তাদের প্রকৃতি, ভিন্ন পথের দিকে তাদের ঝোঁক। এখন যে সৌভাগ্যবান্ লেখক এই দুইকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে চালনা করতে পারে ষ্টাইল তার করায়ত্ত। আমরা বলি তার রচনায় ষ্টাইল আছে বা তার নিজস্ব একটা ষ্টাইল আছে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র 'সরলতা ও স্পষ্টতা' বলতে এই দ্বিবিধ বস্তুকে—আলো আর শক্তিকে বুঝেছেন। দু'একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে, 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।' এ ভাবটা আমাদের সকলের মনেই কখনো না কখনো উদিত হয়েছে—শুনবামাত্র এর যাথার্থ্য আমাদের মন স্বীকার ক'রে নেয়। এখানে মনের সাম্য ক্রিয়া। কিন্তু এই ভাবটিকে এত অনায়াসে, এত সংক্ষেপে, এমন

সুষ্ঠুভাবে আমরা কয়জন প্রকাশ করতে পারতাম! এখানে ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয়ে উঠে আর দশজন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভেদ ঘোষণা করেছে। 'সুখের কথায় বাঙালীর অধিকার নাই।' এ ভাবটিও হয়তো আমরা অনেক সময়ে অনুভব ক'রে থাকি। ঐখানে মনের ক্রিয়ার মিল। কিন্তু এত অনায়াসে, এত সংক্ষেপে, এত সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ের বাষ্পীভূত অশ্রুকে কি সকলে প্রকাশ করতে পারতাম! ঐখানে লেখকের ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া। সমস্ত শব্দই তো অভিধানে আছে কিন্তু সে সব অচল, অক্রিয়। লেখক যখন তাদের মূলে শক্তি সঞ্চার করে তারা বুলেটের মতো প্রচণ্ড বেগে ছুটে গিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করে। ঐ শক্তিটা জোগায় লেখকের ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ আর লেখকে যে কেবল ভেদ তা নয়, লেখকে লেখকেও ভেদ। এই জন্যে লেখকে লেখকে শব্দ-ব্যবহারে পার্থক্য। আবার সকল লেখকের ব্যক্তিত্বের শক্তি সমান প্রবল নয়, সমান লক্ষ্যমুখী নয়, সমান লক্ষ্যভেদী নয়।

আগেই বলেছি যে ষ্টাইলের বিচারে নামলে, বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হয় যখন আর এগোবার পথ থাকে না, সমালোচক বলতে বাধ্য হয় যে বিষয়টা অনির্ব্বচনীয়। কেন যে একই শব্দ বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার শেষ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে কতকদূর পর্য্যন্ত যাওয়া চলে নিঃসন্দেহ, সেই পথেই চলেছি। একটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে বিচিত্র উপাদান পাওয়া যায়। সবচেয়ে সহজে যেটা চোখে পড়ে, নানা জাতের শব্দসম্ভার, যেমন দেশী বিদেশী সংস্কৃত তদ্‌ভব ইত্যাদি। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করায় লেখকের কৃতিত্ব। ক্রিয়াপদ আর একটি প্রধান উপাদান। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার একটা সঙ্কটের স্থান। প্রত্যেক বাক্যের শেষে নিয়মিত স্থানে ক্রিয়াপদ এসে পড়তে থাকলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে ওঠে। সেটা যাতে না হয় সেইজন্য শক্তিমান্ লেখককে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হয়, কখনো ক্রিয়াপদকে নিয়মিত স্থান থেকে সরিয়ে আনতে হয়, কখনো তাঁকে সশরীরে লোপ ক'রে দিতে হয়, আবার কখনো বা তাকে খণ্ডিত ক'রে হ্রস্ব ক্রিয়াপদে পরিণত ক'রে হাল্কা ক'রে ফেলতে হয়। এতেও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। বিশেষণ আর একটি উপাদান। বিশেষণের সার্থক ব্যবহারেও লেখকের কৃতিত্ব কম নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষণের উপরে বিশেষণ চাপিয়ে বস্তুটির উপরে নানা দিক থেকে আলোক নিক্ষেপ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুর একটি মুখ্য গুণ বেছে নিয়ে তাকে বিশেষিত ক'রে তোলেন। দুই রীতিতেই কৃতিত্বের আবশ্যক। ইচ্ছা করলে একটিকে ক্লাসিকাল রীতির সংযম, অন্যটিকে রোমান্টিক রীতির ঐশ্বর্য্য বলা যেতে পারে। কিন্তু রস-সাহিত্যে বিশেষণ বর্জ্জন সম্ভব নয়, কেন না অনেক সময়েই বিশেষণের চাবি দিয়ে বিশেষ্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। তবু লক্ষ্য করবার মতো এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ দিকের উপন্যাসগুলোয় বিশেষণের বহর অনেক কমে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বেড়েছে বলেই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষণ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে রসসাহিত্যের এলাকার বাইরে এলে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধজাতীয় রচনায় বিশেষণ বিরল, রবীন্দ্রনাথে সুপ্রচুর। বিশেষণের সঙ্গে অলঙ্কারকেও ধরা যেতে পারে, কারণ দু'জনের ক্ষেত্রেই বিশেষণ ও অলঙ্কার একই নিয়ম অনুসরণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে আগে একাধারে কবি ও নৈয়ায়িক বলেছি। যেখানে তিনি কবি সেখানে বিশেষণ ও অলঙ্কার প্রচুর, যেখানে নৈয়ায়িক সেখানে দুই-ই বিরল। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র কবি—তাঁর রচনায় সর্ব্বত্র বিশেষণ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। সর্ব্বশেষে আছে প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ রচনার কৌশল। অনুচ্ছেদ হচ্ছে রচনার unit। অনুচ্ছেদের ইষ্টকখণ্ডের সাহায্যে সমস্ত রচনাটি গঠিত হ'য়ে ওঠে। এই সমস্ত উপাদানের সম্ভারে যে রচনা সৃষ্টি হয়ে উঠবে তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য হবে সরলতা ও স্পষ্টতা, কেননা লেখার উদ্দেশ্য লোককে বুঝানো।

এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার যে আলোচনা করেছি, যে সব উদাহরণ উদ্ধার করেছি—তাতে তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারের কৃতিত্বটি দেখাতে চেষ্টা করেছি—সেই সঙ্গে আরও দেখাতে চেষ্টা করেছি কি ভাবে তিনি ক্রমেই অধিকতর সরলতা ও স্পষ্টতার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। এবারে ভাষার অন্যান্য উপাদান ব্যবহারে তিনি যে কৌশল ও রীতি অবলম্বন করেছেন তা যথাসাধ্য দেখাতে চেষ্টা করবো।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সাহিত্যে হ্রস্ব ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র হ্রস্ব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেননি, যেখানে এরূপ ব্যবহার পাওয়া যায় অনিচ্ছাকৃত, কাজেই রচনার দোষ। অধ্যাপক সুকুমার সেন এরূপ প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন।* মনে রাখা আবশ্যক তখন সংলাপেও পূর্ণাঙ্গ

"*কথোপকথন অংশে ক্রিয়াপদে কথ্য ও লেখ্য ভাষার সংমিশ্রণ সে সময়ের রচনারীতির

ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হতো। তিনি পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের সমস্যাকে দুই ভাবে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। অনেক স্থলে ক্রিয়াপদকে লোপ ক'রে দিয়ে একঘেয়ে ধ্বনির হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, আর অবাঞ্ছিত বোঝা হাল্কা হওয়ায় বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত, সংহত হয়ে উঠে ছিটে গুলির লঘু ক্ষিপ্রতা লাভ করেছে।

"তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী, অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি, তুমি সর্ব্ব সুখের আকর, সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্ব কামনা পূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। তোমাকে নমস্কার।"

[চন্দ্রশেখর, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—প্রকৃতি]

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষা-কালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে।"

[দেবী চৌধুরাণী, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—জ্যোৎস্না]

"রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে-ধোয়া যুঁই ফুলের মতো বড় কোমল প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ, সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিপদে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়।"

[সীতারাম, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—পুরাতন ও নূতন]

"অর্দ্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেবউন্নিসা বাদশাহ-দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মতো কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা।"

[রাজসিংহ, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক—শাহজাদী ভস্ম হইল]

একটি বড় দোষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও এই দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নয়। যেমন—"আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি।" (দুর্গেশনন্দিনী), "কিন্তু দেখো, ভালো করিয়া ব'লো।" (বিষবৃক্ষ), "বেড়াইতে যাবে" (কৃষ্ণকান্তের উইল), "তা মা তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব" (রজনী)।"

এমন উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাবে, বিশেষ ভাবে দেবী চৌধুরাণীতে।

ক্রিয়াপদ লোপের এমন উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাবে। বঙ্কিম-চন্দ্রের বাক্যগুলি বহরে খাটো। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রমাণ বাক্যের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রমাণ বাক্য অনেক খাটো। বাক্যগুলি খাটো বলে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার তিনি সহজেই এড়াতে পেরেছেন, তার উপরে আবার ক্রিয়াপদ লোপ পাওয়ায় সেগুলো সাজ-পোশাকের ভারহীন তাতারী অশ্বের মতো লঘু ক্ষিপ্র গতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। পরবর্তীকালে অধিকাংশ গদ্য-লেখককে প্রয়োজনকালে ক্রিয়াপদ লোপের কৌশলটি অবলম্বন করতে হয়েছে—তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে ক্রিয়াপদ লোপ সম্ভব হয়নি সেখানে তাকে প্রত্যাশিত স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

"দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে।"

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর]

ক্রিয়াপদ লোপ বা ক্রিয়াপদ স্থানান্তর ক'রে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে আসল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের গজকচ্ছপী চাল। যোগ্য হাতের দ্বারা চালিত না হলে বড়ই কর্ণপীড়ার সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র অপরিহার্য্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে দিয়ে নিজের কাজ আদায় ক'রে নিয়েছেন। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—'A good general never blames his tools'—ওস্তাদ সেনাপতি হাতিয়ারের দোষ ধরে না—তাকে দিয়েই নিজের কার্য্যোদ্ধার ক'রে নেয়। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের গজেন্দ্রগমনকে বঙ্কিমচন্দ্র রচনার শোভাযাত্রার মধ্যে যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন—শোভাযাত্রার জৌলুস বেড়েছে।

"সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।…এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা

প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।”

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর]

সমস্ত অনুচ্ছেদটি পড়লে দেখা যাবে যে প্রধান ধাতুটি হচ্ছে ‘দেখ্’। এখন এই দেখ্ ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ‘দেখিলাম’ ও ‘দেখিব’ যথাক্রমে চারবার ও পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে, কর্ণকটু তো হয়ই নি বরঞ্চ সঙ্গীতের পুষ্পবৃষ্টি ক’রে শোভাযাত্রার পথ সুগম ক’রে তুলেছে। একই ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আনাড়ির হাতে বিড়ম্বনা, গুণীর হাতে সঙ্গীত।

আর একটি উদাহরণ দেখা যাক—কমলাকান্তের দপ্তর থেকেই। “হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি···কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে স্বর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন। সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।”

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের পত্র]

কোথাও বা অঙ্কুশ-আঘাতে দ্রুত, কোথাও বা আপন মনে মন্থর পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের সারি চলেছে। যাকে আমরা বঙ্কিমী গদ্যরীতি বলি, বঙ্কিমী গদ্যের সঙ্গীত বলি, তার একটা প্রধান উপায় যুগিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের নিপুণ ব্যবহার। তাঁর পূর্ব্বে বা পরে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ থেকে এমন সঙ্গীত আদায় ক'রে নিতে কাউকে দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন একখণ্ড বাঁশ, তাকে বাঁশীতে পরিণত ক'রে অপূর্ব্ব ভাবে ধ্বনিত করেছেন অপূর্ব্ব সঙ্গীত, অপূর্ব্ব এবং অ-পর। তাঁর পরেও আর কারো কাছে ধ্বনিত হয়নি এ সঙ্গীত।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষণ ও অলঙ্কার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে সেরে নেওয়া যেতে পারে, কেননা, বিশেষণও একপ্রকার অলঙ্কার। সাহিত্যরাজ্যে বিশেষণকে কুহকিনী বললে অন্যায় হয় না। এই কুহকিনী রমণীগণ অপূর্ব্ব সঙ্গীতজালে জড়িত ক'রে সাহিত্যের নাবিকদের দিগ্‌ভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিদের অনেকেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়, কিন্তু শক্ত যাদের প্রাণ, লক্ষ্য যাদের স্থির, তারা কাণ্ডজ্ঞানের দড়াদড়ি দিয়ে বিশেষ্যের মাস্তুলের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে কুহকিনীর মায়া থেকে আত্মরক্ষা করে। বাংলা সাহিত্যে দুই রকমেরই উদাহরণ আছে—কুহকিনীর যাদুতে যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট আর যারা আত্মরক্ষায় সক্ষম। প্রথমটির দৃষ্টান্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনার লক্ষ্য সরলতা ও স্পষ্টতা। বিশেষণ ও অলঙ্কার ব্যবহারেও এই লক্ষ্যানুসারী। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা ও আশমানীর রূপবর্ণনা বিস্তারিত ও জটিল, এখানে তিনি সংস্কৃত কাব্যের ধারাকে যেন অনুসরণ করেছেন, আশমানীর রূপ বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব খুব স্পষ্ট। সংস্কৃত কাব্যে ধীরে সুস্থে দীর্ঘ রূপবর্ণনার যে অবকাশ আছে, আধুনিক উপন্যাসে যে তা নেই, একথা বুঝতে তাঁর কিছু সময় লেগেছে। পরবর্ত্তী উপন্যাস কপালকুণ্ডলাতেও দীর্ঘ বর্ণনা আছে কপালকুণ্ডলার ও মোতি বিবির। কিন্তু তার পর থেকেই এ রীতি অর্থাৎ সংস্কৃতকাব্যের রীতি পরিত্যক্ত—যদিচ বিশেষণ কুহকিনীর মায়াজাল থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পান নি। রস-সাহিত্যে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবও নয়—কিন্তু সর্ব্বদা তিনি লক্ষ্য রেখেছেন যেন বিশেষ্যের মাস্তুল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর রূপবর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্তের কিছু কারণও তিনি দর্শিয়েছেন।

"এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধূতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।" এ বর্ণনারীতি শুধু সংক্ষিপ্ত নয়, বিশেষভাবে বঙ্কিমী। বিশেষণে, বিশ্লেষণে, কৌতুকে, বেদনায় পূর্ণ। "তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।" এই উক্তিটিতে বেদনা, এই উক্তিটিতে কাহিনীর রন্ধ্র। আর বিশ্লেষণ! শরতের যে চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ তাতেও দোষ আছে—রোহিণীও দোষের অতীত নয়। দোষে গুণে দুয়ে সাম্য আছে বটে। সীতারামে শ্রীর বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত, আরো নিবিড়ভাবে কাহিনীর অঙ্গীভূত, অর্থাৎ এ বর্ণনায় প্রয়োজন কাহিনীর, শ্রীর বা লেখকের নয়।

"তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণা, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

বর্ণনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বর্শা নিক্ষেপে কাহিনীর মর্মভেদ হয়ে ট্র্যাজেডির উৎস বেরিয়ে এসেছে।

"যেখানে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখ দিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মতো, চারিদিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পাড়য়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ

মূর্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"

এ রূপবর্ণনা আয়েষা, তিলোত্তমার রূপবর্ণনার ন্যায় লেখক কর্তৃক অঙ্কিত নয়—এর শিল্পী ঘটনাচক্র, এর দ্রষ্টা কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ। এ বর্ণনা নাটকীয়। এটুকু যথাস্থানে এসে পড়ায় গল্পের স্রোত নূতন গতি পেয়েছে। তিলোত্তমা, আয়েষার রূপবর্ণনা বাদ পড়লেও গল্পের ক্ষতি হয় না। সেইজন্যই বলি রোহিণী ও শ্রী প্রভৃতির রূপবর্ণনা সরলতা ও স্পষ্টতার অনুকূল; তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রভৃতির বর্ণনা ঐ দুই গুণের পরিপন্থী না হলেও অনুকূল নয়।

রস-সাহিত্যের বাইরে প্রবন্ধজাতীয় রচনায় এসে পড়লে বিশেষণ ও অলঙ্কার ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সংযম প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের, যে কোন রচনায় দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যাবে। তবু হয় তো তুলনামূলক আলোচনায় কিছু সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য মিলিয়ে পড়লেই প্রভেদটা কোথায় বুঝতে পারা যাবে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনার উত্তরস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা প্রবন্ধ লিখিত। বিষয় এক, ব্যবহার ভিন্ন। দুটিই সার্থক রচনা—অথচ রীতিতে কী প্রভেদ! এ প্রভেদ দুটি মনের। আগেই বলেছি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক, প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কবি।

ঊনবিংশ শতকের লেখকদের যুক্তিনিষ্ঠ মন প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ রচনায় সহজ নিপুণতা দেখিয়েছিল। বিদ্যাসাগর, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের যে-কোন রচনার দিকে তাকালেই বিষয়টি অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে। রস-সাহিত্য ও প্রবন্ধাদিতে অনুচ্ছেদ রচনা ঠিক এক নিয়ম অনুসরণ করে না, খুব সম্ভব প্রবন্ধাদিতে অনুচ্ছেদ রচনা অপেক্ষাকৃত সরল, কেননা, argument বা যুক্তি এবং তথ্যবিন্যাস প্রধান চালক। রস-সাহিত্যে চালক অনেক, কখনো ঘটনা, কখনো যুক্তি, কখনো ভাবাবেগ, কখনো বা কল্পনা—সেইজন্যে অনুচ্ছেদ রচনা কিছু আয়াসসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ক্ষেত্রেই সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের অন্তর্গত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হল। কিন্তু তার আগে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঊনিশ শতকের লেখকদের তুলনায় বিংশ শতকের লেখকদের অনুচ্ছেদ রচনার কৃতিত্ব অনেক কম—বোধ করি

এর একমাত্র ব্যতিক্রম রামেন্দ্রসুন্দর ও প্রমথ চৌধুরীর রচনা। একেবারে হাল আমলে অনেকের রচনায় বাক্য ও অনুচ্ছেদের প্রভেদ প্রায় ঘুচে গিয়েছে—প্রত্যেকটি বাক্য একটি অনুচ্ছেদে পরিণত। অনুচ্ছেদ ব্যূহ, বাক্য সৈন্য। এ যেন রণক্ষেত্রে অসংখ্য সৈন্য আছে, কিন্তু সৈন্যসমাবেশে ব্যূহ নাই। সৈন্যদল এখন জনতায় পরিণত হয়েছে। এ আর যাই হোক সাহিত্যের পথে শুভ স্থচী নয়।

"কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্যব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগসম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্ত্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহার জন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই একলক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এইদিকে এই একলক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মূল কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক

অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" [বাহুবল ও বাক্যবল]

বাহুবলের স্বরূপ, পশুদের ও মানুষের বাহুবলের প্রভেদ, সামাজিক, নিয়মের সঙ্গে বাহুবলের সম্বন্ধ প্রভৃতি এর চেয়ে পরিষ্কার ভাবে, এর চেয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিচার করা আর সম্ভব নয়। বিচারের বা বিশ্লেষণের বা বিন্যাসের সরলতম পন্থা অবলম্বন অনুচ্ছেদ রচনার মূলগত রহস্য। এখানে সেই রহস্য লেখকের করায়ত্ত।

এবারে আর দুটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করছি যদিচ দুটিই রস-সাহিত্যের অন্তর্গত। প্রথমটিতে দেখা যাবে যে প্রতাপের মনের গতি কি বিচিত্র যুক্তি অনুসরণ করে আত্মগ্লানি থেকে কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। একটি ব্যক্তিগত সমস্যা বৃহৎ রাজনৈতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসেরও এই একই গতি। অনুচ্ছেদটির মধ্যে বীজাকারে সমগ্র কাহিনীর গতি নিহিত। অনুচ্ছেদ রচনায় বঙ্কিমের অসামান্যতা এখানে তুঙ্গ স্পর্শ করেছে।

"প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, 'আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।' কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, 'আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।' অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরেও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসংকার করিতে হইবে—

নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য ; কেন না ইহাদের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।" [চন্দ্রশেখর]

পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদটিতে হৃদয়াবেগ ও কল্পনায় জড়িয়ে গিয়েছে। কোকিলের কুহুকে অবলম্বন ক'রে যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখানো হয়েছে, সে সৌন্দর্য্যের মূল আসলে রোহিণীর মনে। তাই ঐ কোকিলের কুহু, নিসর্গের সৌন্দর্য্য আর রোহিণীর হৃদয়াবেগ তিন একত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে অনুচ্ছেদটিতে। এখানে যাঁর কলম চলেছে তিনি কবি—আগের দুটিতে তিনি ছিলেন নৈয়ায়িক।

"আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধিপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে, স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল ! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—'কু উ'। তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।" [কৃষ্ণকান্তের উইল]

ষ্টাইলের মূলে যে উপাদানগুলি আছে, যাদের ষ্টাইলের বহিরঙ্গ বলা যেতে পারে, যথাসাধ্য তার আলোচনা করলাম। কিন্তু এ-ই তো সব নয়। ষ্টাইলের মূলে আরো কিছু আছে, যাকে বলতে পারা যায় ষ্টাইলের অন্তরঙ্গ। এটি বিশেষ মনোভাব বা মেজাজ নয়, মনের ভাব ও মেজাজ ক্ষণে

ক্ষণে বদলায়। এমন চঞ্চল বস্তুকে স্থায়ী বনিয়াদ রূপে গ্রহণ করা চলে না। অন্ধকার সমুদ্রের নাবিকের পক্ষে যেমন ধ্রুবতারা, চৌম্বক শলাকার পক্ষে যেমন উত্তরমেরুবিন্দু, সমস্ত চঞ্চলতার মধ্যে এই রকম একটা কিছু থাকা সম্ভব সাহিত্যিকের মধ্যে। সেই ধ্রুবস্থির লক্ষ্যই ষ্টাইল গ'ড়ে তোলে, তাকেই বলা যেতে পারে ষ্টাইলের অন্তরঙ্গ। এখন এ ধারণা অন্য লেখকের পক্ষে সত্য কিনা জানি না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যে সত্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক নিবন্ধে ষ্টাইলের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—যদিচ ঐ শব্দ দুটি ব্যবহার করেন নাই। ঐ নিবন্ধে বারোটি সূত্র আছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটি অন্তরঙ্গ বিষয়ক, তন্মধ্যে আবার তৃতীয় ও চতুর্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।*

বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন—"॥ ৩ ॥ যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। ॥ ৪ ॥ যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনো হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।"

রচনাটি প্রচার পত্রে ১২৯১ সালের মাঘমাসে (১৮৮৫) প্রকাশিত। কাজেই তাঁর বক্তব্যকে পরিণত জীবনের মত বলে গ্রহণ করলে অন্যায় হবে না। রচনাকাল পরিণত বয়স হলেও লেখকজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা বোধ করি তাঁর গোড়া থেকেই ছিল। অবশ্য অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধারণাটি ক্রমেই অধিকতর বদ্ধমূল হচ্ছিল, শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল মনে করা অন্যায় হবে না যে, যে-রচনায় দেশের, সমাজের, মানুষের হিত হল না সে রচনাকে তিনি নিতান্ত পণ্ডশ্রম বলে মনে করতেন। ঠিক কবে থেকে এ মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বলা সহজ নয়, হয় তো কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশের সময় থেকে, হয় তো বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় থেকে, কিম্বা হয় তো

* বহিরঙ্গের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে কয়েকটি সূত্রের বিশ্লেষণ করেছি।

তারো আগে থেকে—মৃণালিনীর নায়ক হেমচন্দ্রের দেশোদ্ধার সঙ্কল্প হয় তো লেখকেরই মনের প্রক্ষেপ।

সাহিত্য শব্দের নানাজনে নানারকম অর্থ ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সহিত শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন, যাতে লেখকের সহিত পাঠকের মিলন ঘটে। কালিদাসের 'বাগর্থবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতি-প্রত্তয়ে'—স্মরণ করলে মনে হয় তাঁর মতে শব্দের সহিত অর্থের অঙ্গাঙ্গী যোগ সাধনেই সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন অর্থ করেছেন।—তিনি মনে করেন যে সহিত শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন নয়। তাঁর মতে স+হিত শব্দের পরিণাম সাহিত্য, অর্থাৎ যে রচনা মানুষের, সমাজের, দেশের হিতসাধনে সমর্থ—তা-ই সাহিত্য। এখন, সাহিত্য শব্দের এই ব্যুৎপত্তি ও সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কিত পূর্ব্বোক্ত ধারণা দুটিই সমসূত্রে অবস্থিত, একসূত্রে বিধৃত। হিতেচ্ছা সংযুক্ত, হিতেচ্ছা উদ্ভূত রচনাই সাহিত্য। আমার এই অনুমান ও ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্যজীবনের গোড়া থেকেই বঙ্কিমের পথ সুনির্দ্দিষ্ট ছিল—আর সে পথ সরল ও স্পষ্ট, কেন না মানুষের মনের যতগুলি বৃত্তি আছে হিতসাধন ইচ্ছার ন্যায় সরল ও স্পষ্ট আর কিছুই নয়। নিতান্ত অগুণী ও সামান্য লোকেরও অপরের হিতেচ্ছা পোষণ করতে বাধা নাই। এই হচ্ছে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ষ্টাইলের অন্তরঙ্গ—তাঁর সাহিত্যতরণীর ধ্রুবতারা। আর তার সঙ্গে, তার অনুকূলে মিলিত হয়েছে ষ্টাইলের বহিরঙ্গ—এই দু'য়ে মিলে দুয়ের সহযোগী হস্তক্ষেপে গড়ে তুলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ষ্টাইল বা গদ্যরীতি—বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য কলমের ফলশ্রুতি উচ্চারণ করবার সময় হল। *

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে যে যার পিছনে প্রাচীন গ্রীকদের প্রভাব নাই তা পাশ্চাত্য দেশে চলেনি। এই প্রবচনের অনুসরণ ক'রে তিনি বলেছেন যে বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সমান সার্থকতায় বলা চলে যে যার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের করস্পর্শ নেই তা বাংলা দেশে, বাংলা সাহিত্যে চলেনি।

* ফারসীতে কলম শব্দের একটি অর্থ ষ্টাইল। ষ্টাইলের বা রীতির বদলে এই অর্থে কলম শব্দটির ব্যবহার কি বাংলায় চালানো যায় না?

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লিখবার প্রচেষ্টা হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখেননি উপন্যাস চলেনি বাংলা সাহিত্যে; তাঁর আগে মাসিকপত্র বের হয়েছে কিন্তু বঙ্গদর্শন বের হওয়ার আগে মাসিক-পত্র শিকড় চালিয়ে দিতে পারেনি বাঙালীর রসলোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তিকে এত সংক্ষেপে এত সুন্দরভাবে আর কে প্রকাশ করতে পেরেছেন জানি না। রামেন্দ্রসুন্দরের ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে আমাদের বক্তব্য যথাসাধ্য বলতে চেষ্টা করবো।

বিদ্যাসাগর মধ্যগা গদ্যরীতির উদ্ভাবনকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্র সেই রীতিটি গ্রহণ ক'রে তার উপর ব্যক্তিত্বের ছাপ বসিয়ে দিয়ে তাকে বিশেষভাবে নিজের ক'রে নিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ অথচ তাঁর গদ্যরীতি ব্যক্তিত্বের ছাপ বর্জ্জিত। অন্যপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র আপন সংহত পুরুষ—তাঁর যা কিছু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁর গদ্যরীতিতে। অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর গদ্যরীতিকে বুঝতে ভুল হয় না। কিন্তু যেহেতু তাঁর গদ্যরীতির মূল হচ্ছে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত মধ্যগারীতি সেই জন্যই বঙ্কিমের পরে বঙ্কিমের শিষ্যগণ তাঁর গদ্যরীতিকে অনুসরণ করেও নিজেদের ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন সাহিত্যে। বঙ্কিমের ভাষার প্রভাব ছোট ছোট অনেক বঙ্কিম গড়েনি, শক্তিমান লেখকদের সম্মুখে সার্থকতার পথ খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমের ভাষা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সর্ব্বজনীন। এটি বঙ্কিমের গদ্যরীতির একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আর প্রতিভার স্পর্শে ভাষার সেই শক্তি তিনি আনলেন যাতে রঙফলানো সম্ভব হল, ছবি ফোটানো সম্ভব হল, সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় ফুটে উঠল, অর্থাৎ ভাষা ভাবের বাহনের স্তর থেকে রসের বাহনের স্তরে উন্নীত হল। এই প্রথম বাঙালী পাঠক বাংলা গদ্যসাহিত্য থেকে রসের তৃষ্ণা মেটাতে সমর্থ হল। ফলে হল এই যে বাংলাসাহিত্য-বিমুখ পাঠক বাংলাসাহিত্যের দরবারে আসতে সুরু করলো। এতদিন যারা স্কটের উপন্যাস দিয়ে বকলমে তৃষ্ণা মেটাচ্ছিল এবারে তারা ঘরের দরজায় রসের ভাগীরথীকে লাভ করে নিজের দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করতে সুরু করলো। সরাসরি দেশাত্মবোধের উদ্বোধনের অনেক আগে বাঙালীকে দেশ, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন করে তুললেন। এটি করলেন তিনি নিছক ভাষার যাদুতে। বঙ্কিমের গদ্য দেশাত্মবোধের 'সোনার মন্দিরে'র প্রথম দরজাটা খুলে দিল।

প্রবন্ধজাতীয় রচনায় তিনি যে গদ্যরীতি অনুসরণ করলেন মূলতঃ তা অভিন্ন হলেও তার ঝোঁকটা রসের দিকে নয়—ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ বা চিন্তার দিকে। তাঁর উপন্যাসের ভাষা যেমন রসের বাহন, তাঁর প্রবন্ধের ভাষা তেমনি মনীষার বাহন। চিন্তাবীর হিসাবে রামমোহনের স্থান বঙ্কিমের নীচে নয়—কিন্তু সে চিন্তার ফসল যে বাংলাভাষায় ফলেনি তার কারণ রামমোহনের সময়ে ভাষা মনীষার বাহন হয়ে উঠবার ক্ষমতা লাভ করে নি। সেই জন্যই রামমোহনের মনীষার ফসল হয় ইংরেজিতে নয় এমন বাংলা গদ্যে যা এ যুগে অচল।

নূতন, জটিল ও সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমকে বিচিত্র শ্রেণীর শব্দ আমদানি করতে হয়েছে, তবে মোটের উপরে তাঁর টান সংস্কৃত, সংস্কৃতজ ও দেশী শব্দের দিকে। আলালের প্রশংসা করা সত্ত্বেও তিনি যতদূর সম্ভব ফারসী শব্দ এড়িয়ে চলেছেন। প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার অনেক শব্দ তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে তিনি কেবল পথিক ছিলেন না, পথিকৃৎও ছিলেন। ঐ যে পণ্ডিতীরীতি ও বিষয়ী লোকের রীতির উল্লেখ করেছি—যা নাকি বিদ্যাসাগরী মধ্যগারীতির মূলে—বঙ্কিমের শেষ জীবনের উপন্যাসে, বিশেষভাবে তাঁর প্রবন্ধাদিতে, সেই দুই রীতি আরো কাছাকাছি এসে পড়েছে—খুব নিরিখ করে না দেখলে ভেদ বুঝতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ বাংলা গদ্যরীতির বিভিন্ন ধারা ভাষার স্বকীয় নিয়মানুসারে যে পথে চলছিল বঙ্কিমের শেষ জীবনের রচনায় তা প্রায় একাত্ম হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগর ভাষা-দেহ থেকে পণ্ডিতী বর্ব্বরতা ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা মোচনের কাজ সুরু করেছিলেন, বঙ্কিম প্রায় তা শেষ করে আনলেন আর সেই সঙ্গে ভাষায় দিলেন রসের ঐশ্বর্য্য ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা। গোড়ায় যে কথাটি বলেছিলাম এবারে তারই পুনরাবৃত্তি করে শেষ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় ভাষাবৃক্ষের সরল সবল সতেজ কাণ্ডটি উন্নীত হয়ে উঠেছিল, বঙ্কিমের প্রতিভায় তাতে শ্যামল শোভন সরস শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব দেখা দিল। ভাষাবৃক্ষ এখন আর শুধু প্রাণবন্ত নয় লক্ষ্মীমন্তও বটে। কিন্তু বৃক্ষের উপমাকেই যদি অনুসরণ করতে হয়, তবে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাতেই শেষ করা চলে না, ফুল ফলের প্রবাহ বেয়ে তার ভবিষ্যৎ সুদূর-প্রসারী। সেই সুদূর প্রসারের মধ্যে ভাষার পরবর্ত্তী ইতিহাস নিহিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পরে উল্লেখযোগ্য বাঙালী লেখকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল মনে করা অন্যায় নয়।* এঁদের অনেকেই বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুগামী ও বঙ্গদর্শনের লেখক সম্প্রদায়ভুক্ত। কয়েকজন অবশ্য ব্যতিক্রম আছেন। কাজেই এখানে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, ভাষা-রীতিতে যাঁরা বঙ্কিমের অনুগামী আর যাঁদের ভাষারীতি কিছু স্বতন্ত্র। এ ছাড়াও আলোচনার একটি তৃতীয় পর্য্যায় সম্ভব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে। প্রথম দুইখানি পুস্তকে তিনি বঙ্কিমের ভাষানুগামী; বেনের মেয়ে ও প্রবন্ধাদিতে আর বঙ্কিমের অনুগামী নন, একেবারে স্বতন্ত্র।†

বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের কোন লেখকই সাহিত্য-প্রতিভায় বঙ্কিমের সমতুল্য নন। তাঁদের মধ্যে মাথায় ছোট-বড় আছে কিন্তু সকলেরই মাথা বঙ্কিমের মাথার অনেক নীচে। বঙ্কিমের ভাষারীতির আসল পরীক্ষা হয়েছে তাঁদের হাতেই। প্রথমতঃ তাঁরা জ্ঞানের ও রসের নানা ক্ষেত্রে বঙ্কিমের রীতিকে দেশময় চারিয়ে দিয়ে তাকে ব্যাপকতা দিয়েছেন। আর নানাক্ষেত্রে ব্যবহার করতে গিয়ে ভাষার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য আবিষ্কার করেছেন, দেখেছেন যে এ ভাষা সর্ব্বত্র সমান পটু, কোন কাজে এর ন্যূনতা ধরা পড়েনি। তার পরে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমানের হাতে পড়ে এ ভাষায় মুদ্রাদোষ দেখা দেয়নি। মুদ্রাদোষ হচ্ছে

* এর অনেক কারণ হওয়া সম্ভব। শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত লোকের বাংলা লিখবার আগ্রহবৃদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু এই সঙ্গে আরো দুটি কারণ আছে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত এবং সর্ব্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বজনের পায়ে চলার উপযোগী ভাষার পথ নির্ম্মাণ।

† ভাষারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী যে সব লেখক এই গ্রন্থভুক্ত হয়েছেন, কাজের সুবিধার জন্য এখানে তাঁদের একটা তালিকা দেওয়া হল।

সঞ্জীবচন্দ্র,	শিবনাথ শাস্ত্রী,	স্বর্ণকুমারী দেবী,
কালীপ্রসন্ন ঘোষ,	নবীনচন্দ্র সেন,	জগদীশচন্দ্র বসু,
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ,	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোঃ,	বিপিনচন্দ্র পাল,
চন্দ্রনাথ বসু,	মীর মশারফ হোসেন	দীনেশচন্দ্র সেন,
রাজকৃষ্ণ মুখোঃ,	রমেশচন্দ্র দত্ত,	পাঁচকড়ি বন্দ্যোঃ,
তারকনাথ গঙ্গোঃ,	চন্দ্রশেখর মুখোঃ,	ললিতকুমার বন্দ্যোঃ,
অক্ষয়চন্দ্র সরকার,	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু,	প্রভাতকুমার মুখোঃ,
	অশ্বিনীকুমার দত্ত.	

ভাষার স্রোতের মুখে শ্যাওলা, দেখা দিলেই বুঝতে হবে যে স্রোত বন্ধ হয়ে নদী মরতে বসলো। এখানেই সাহিত্যে স্বল্প-শক্তিমান লেখকের সার্থকতা। তাদের হাতেই হয়ে থাকে ভাষার প্রাণশক্তির চরম পরীক্ষা। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা আবশ্যক যে বঙ্কিমের অনুগামীগণের সকলেই যে বঙ্কিমী ভাষারীতিতে সর্ব্বৈবভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন একথা সত্য নয়। ওরই মধ্যে স্বল্লায়তনে অনেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ভাষাকে অক্ষয় সরকার বা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষা বলে ভুল করার কারণ নেই। আবার ভাষারীতিতে সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের অনুগামী হলেও সহৃদয়তা ও কবিত্ব তাঁর রীতিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেয়, পালামৌ ভ্রমণ বঙ্কিমের কলম থেকে বের হতে পারত না, অন্ততঃ তার অনুরূপ কিছু বের হয়নি। বঙ্কিমের ভাষারীতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার অনেক কথাই আণুবীক্ষণিক আকারে অনুগামীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য—এই পর্য্যন্ত বলে আমরা প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করবো।

ভুদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তাঁর কোন কোন রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের আগে প্রকাশিত। তাঁর প্রথম বই শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের প্রকাশকাল ১৮৫৬ সাল, আর তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৮৯২ সাল, ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব তাঁর সাহিত্যজীবন বঙ্কিমের চেয়ে কিছু দীর্ঘ। ইতিহাসিক উপন্যাস ও পুষ্পাঞ্জলি বাদ দিলে তার বাকি সমস্ত রচনাই প্রবন্ধ জাতীয়, প্রথমোক্ত দু'খানি রস-সাহিত্যের অন্তর্গত। কাজেই তাঁর ভাষারীতি বিচারের সময় দেখতে হবে যে রসসাহিত্য সৃষ্টিতে ও প্রবন্ধাদি সৃষ্টিতে তাঁর কলমের সার্থকতা কতখানি। ভূদেবের ভাষা রসসাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সরস নয়। প্রবন্ধ রচনার সহজাত কলম নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। শুধু যে ভাষার অনুপোযোগিতাই রসসাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় হয়েছিল তা নয়, কাহিনী বিন্যাসের ও পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁর ছিল না, ফলে বঙ্কিমের আগে রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করলেও সার্থক কিছু রচনা ক'রে যেতে পারেননি। তাঁর ভাষারীতির পরিণত উদাহরণ সামাজিক প্রবন্ধ নামে গ্রন্থে। এখানা কেবল ভূদেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের মনীষার ক্ষেত্রে যে সামান্য কয়েকখানি সুমহৎ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক প্রবন্ধ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর কিছু আদৌ এদের সমকক্ষ আছে কি না সন্দেহ। সামাজিক প্রবন্ধের ভাষার মতো এমন যুক্তি শৃঙ্খলিত, নিরলঙ্কার, সরল ও স্পষ্ট ভাষা বাংলা সাহিত্যে বিরল। অলঙ্কারগ্রহণ প্রবণতা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। অলঙ্কারের সাহায্য ছাড়া আমরা বৈজ্ঞানিক সত্যকেও প্রকাশে অক্ষম—এ চিন্তার দীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক প্রবন্ধের ভাষা তাই এত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত গুণ সত্ত্বেও বইখানি যে বিস্মৃত প্রায় তার কারণ ভাষার ঐ অনন্যসাধারণ রীতিটি। বঙ্কিমচন্দ্রের রসসাহিত্যের ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চোখ অলঙ্কারবহুল ভাষার জৌলুসে অন্ধপ্রায়, নিরলঙ্কার ভাষাকে আমরা নীরস বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বোধহয়, প্রধানতঃ এই কারণেই আমরা সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম, উদাসীনতা কালক্রমে বিস্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ প্রভাবের সময়ে ভূদেব লিখেছেন, কিন্তু কি চিন্তায়, কি ভাষায় সর্ব্বৈবভাবে তিনি বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত। সামাজিক প্রবন্ধের ভাষারীতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথিত বিষয়ী লোকের রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তারপরে মার্জ্জিত রুচি, শিক্ষিত বুদ্ধি ও গভীর মনীষা ঐ ভাষারীতি থেকে যাবতীয় ক্লেদ ও গ্রাম্যতা নিষ্কাশিত করে দিয়ে তাকে এক প্রকার তপঃক্লিষ্ট শুচিতা দান করেছে। এ ভাষায় না আছে আবিলতা না আছে বহুলতা, না আছে অলঙ্কার না আছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব। বিষয়গৌরবে গরীয়ান প্রবন্ধের আদর্শ ভাষা। এ ভাষারীতি চিরকালের জন্য অস্ত গিয়েছে মনে করবার কারণ নাই। অলঙ্কারবহুল ভাষার আদর এখন কমে আসবার মুখে, আরো কমে এলে বাঙালী পাঠক সামাজিক প্রবন্ধের ভাষাকে নূতনভাবে আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হয়ে যাবে।*

কেশবচন্দ্র একাধারে ধর্ম্মগুরু, সমাজসংস্কারক, বাগ্মী ও সাংবাদিক। ধর্ম্মগুরুরূপে তাঁকে অনেক গভীর অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে হয়েছে, সমাজ-সংস্কারকরূপে তাঁকে বহু বিষয়ে লিখতে হয়েছে, সাংবাদিকরূপে তাঁকে সকল বিষয় সরলভাবে প্রকাশ করতে হয়েছে, আর বাগ্মীরূপে ভাষা ও স্বরের বিশেষ ভঙ্গীতে শ্রোতার মন বিচলিত করতে হয়েছে। আর এই

* বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত ভূদেবের রচনার দৃষ্টান্ত—আওরঙ্গজেবের পত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট পত্র, পানিপথের যুদ্ধ, সামাজিক প্রকৃতি—উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ।

প্রত্যেকটি অভ্যাস দাগ রেখে গিয়েছে তাঁর ভাষার উপরে। তাঁর রচনায় যে অনেক জায়গায় মধ্যম পুরুষের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ কখনো তিনি শ্রোতাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, কখনো বা বিষয় বা ব্যক্তিকে সম্মুখে কল্পনা ক'রে নিয়ে বক্তব্য বলছেন।

"শাক্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে? তোমার যে এত বড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে!! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল?"

এ ভাষা বাগ্মিতার ভাষা। শুধু কলমের মুখে এ ভাষা আসবার নয়, কণ্ঠের সঙ্গে কলম যুক্ত হলে তবে এ ভাষা ধ্বনিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যে যে ধর্ম্মোপদেশের শাখা দেখা দিয়েছে—তার মূল ছাঁচটা এই রকমের। সে ধর্ম্মোপদেশ লিখিত হলেও তাতে বাগ্মিতার সুর বাজে কেননা লিখবার সময়ে লেখক নিজেকে বক্তা ও পাঠককে শ্রোতারূপে কল্পনা ক'রে নেয়। মনে রাখতে হবে যে পাঠক ও শ্রোতা এক নয়, পাঠক প্রথম পুরুষ, শ্রোতা মধ্যম পুরুষ। এ প্রভেদটি গুরুতর ও গভীরার্থদ্যোতক। আবার যাঁরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বা ধর্ম্মোপদেষ্টা নন অথচ বাগ্মীপুরুষ তাঁদের অনেক রচনাও বাগ্মিতার প্রভাবে গঠিত, উদাহরণ স্বরূপ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাম করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র এক বছরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বঙ্কিমসাহিত্যের প্রভাব কালেই তাঁর সমস্ত রচনা লিখিত, কিন্তু কোথাও বঙ্কিমপ্রভাবিত মনে হয় না। তার কারণ বঙ্কিমের ও কেশবচন্দ্রের সাধনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, মতে পথে তাঁদের মধ্যে কোথাও মিল আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া বঙ্কিম মূলতঃ সাহিত্যিক, কেশবচন্দ্র মূলতঃ সাংবাদিক, ঈশ্বর গুপ্তের পরে শ্রেষ্ঠ বাংলা সাংবাদিক।*

এবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।† হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান ষ্টাইলিষ্ট বা রীতিবিশারদ। আর

* কেশবচন্দ্রের রচনার উল্লেখ—রাজা রামমোহন রায়।

† গ্রন্থে উল্লিখিত রচনার বিবরণ: তৈলদান; ত্রয়ী; প্রেমিক প্রেমিকা, কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে; মায়ার স্বামীর মুক্তি।

স্বীকার করতে বাধা নাই যে আমি তাঁর ভাষারীতির বিশেষ ভক্ত। এই কারণেও বটে আবার বাংলা ভাষারীতির ইতিহাসে তাঁর ষ্টাইলের গুরুত্ব বিবেচনাতেও বটে আলোচনা কিছু বিস্তারিত ভাবে করবার ইচ্ছা।*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার স্বকীয়তা তাঁর বেনের মেয়ে (১৯২০) উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে সবচেয়ে পরিস্ফুট। তাঁর কাঞ্চনমালা (১৯১৬) ও বাল্মীকির জয় (১৮৮১) প্রথম দিকের রচনা, দুখানিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল, বাল্মীকির জয় ১২৮৮ (১৮৮১) সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ (১৮৮২-৮৩) সালে। দুখানি গ্রন্থের ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনীবিন্যাসে তো আছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেকনিকে কাটিয়ে উঠতে তাঁকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে। বেনের মেয়ে ১৩২৫ (১৯১৮-১৯) সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, যদিচ কাহিনীবিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রীয় টেকনিক দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল দুইয়ের কথা বলা হল, বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি হতে তাঁর স্বকীয় রীতির বিবর্ত্তনের ইঙ্গিতও দেওয়া হল, তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে দুজনের ভাষায় ঐক্য আছে। দুজনেরই ভাষা মূলতঃ যুক্তিসিদ্ধ মনের ভাষা। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রচুরপরিমাণে কবিত্বরস আছে, তৎসত্ত্বেও তাঁর মন মূলতঃ নৈয়ায়িকের মন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার চরম উৎকর্ষ তাঁর উপন্যাসগুলিতে নয়, তাঁর প্রবন্ধাবলীতে এবং কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় তাঁহার নৈয়ায়িক মন স্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ায়িক মন, যদিচ বাল্মীকির জয় এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদ্বয়ে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মন মূলতঃ কল্পনাপন্থী। প্রচুর কল্পনার জোগান না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ষ্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক ষ্টাইল পদচারী পথিক, তাকে অনুসরণ কঠিন নয়। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাকে অনায়াসে অনুসরণ করেছেন। হরপ্রসাদ শেষপর্য্যন্ত স্বকীয়তায় পৌঁছেছেন; অক্ষয় সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সে

* আলোচনার অনেক অংশ আমার কোন পূর্ব্ব রচনা থেকে গৃহীত।

কথা প্রযোজ্য না হলেও তাঁদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয়নি। কল্পনার সম্বল না নিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে গিয়েছেন, তাঁদের কজনের সম্বন্ধে এমন কথা সাহস করে বলা যায়!

এখানে আর-একটা জটিল সমস্যা এসে পড়ল, নৈয়ায়িকের মন আর কল্পনাপন্থীর মন। বাঙালী সমাজের সমষ্টিগত মনে এই দুটি উপাদানই আছে; বাঙালী নৈয়ায়িকও বটে, আবার কল্পনাপ্রবণও বটে। যে বাঙালী নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করেছে, সেই বাঙালীই বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছে—বাংলাদেশের মানস-চিত্রে ভট্টপল্লী ও নানুর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কাঁঠালপাড়া হতে ভাটপাড়া অধিক দূর নয়, নৈহাটি হতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নৈয়ায়িক-বংশের সন্তান।

আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ভাষা সম্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করেছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর-একটা জল্পনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। এ দেশের রাজা ইংরেজ না হয়ে ফরাসি হতে পারত, এক সময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটলে বাংলা সাহিত্য কি আকার লাভ করত? ইংরেজি সাহিত্য কল্পনাপ্রবণ, তাতে কাব্যটাই প্রবল; ইংরেজি গদ্য কল্পনা-প্রবণের গদ্য, সে গদ্য মূলতঃ কাব্যধর্ম্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তার প্রভাবে বাঙালী মনের কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পেয়েছে, বাঙালীর কাব্য যেমন সতেজ হয়ে উঠেছে গদ্য তেমন হতে পায়নি; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম্ম বাংলা গদ্যে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। ফরাসি জাত এ দেশের রাজা হলে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে এর বিপরীত প্রক্রিয়াটা হত মনে করলে অন্যায় হবে না। ফরাসি সাহিত্য যুক্তিপন্থী, তার গৌরব গদ্য। ফরাসি কাব্য গদ্যধর্ম্মী, অর্থাৎ যুক্তির পথ ছেড়ে সে-কাব্য অধিকদূর যেতে সম্মত নয়। কর্নেই ও রাসিনের নাটক নৈয়ায়িক মনের কাব্য। ব্যাপকভাবে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়লে বাঙালীর নৈয়ায়িক মন সমর্থন পেত। কাব্যাংশে বাংলা সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হত কি না জানি না, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, বাংলা গদ্য একপ্রকার স্বচ্ছতা সরলতা ঋজুগতি ও দীপ্তি লাভ করত, বর্ত্তমান বাংলা গদ্যে যার একান্ত অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে যে গদ্য বাহির হয়েছে, যে গদ্যকে বাংলা গদ্যের নিয়ম না বলে নিয়মের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজপথ হয়ে উঠত। এখন

শাস্ত্রী মশায়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হলে সেটা বড় সড়কের উপরে হতে পারত। ডুপ্লের কূটনীতির জয় হলে ভট্টপল্লী বাঙালী মনের রাজধানী হতে পারত। কিন্তু এসব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক; হয়তো এইটুকু অর্থ এতে আছে যে, বাঙালী মনের গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ষ্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বকীয় ষ্টাইলের নমুনারূপে বেনের মেয়ে হতে দুটি অংশ তুলে দিচ্ছি। প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি জলাশয়ে মাছ-ধরার বর্ণনা।

"ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রং করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতক-গুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চকচকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চকচকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোনালি রং পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামিশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হ'য়ে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপ্‌ঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব।"

দ্বিতীয় বর্ণনাটি গাজনের শোভাযাত্রার। হাতির উপরে রাজগুরু ও গুরুপুত্র চেপেছেন, তাঁদেরও দেখতে পাব—

"তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট

নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সর্বাঙ্গে শিঙ্গার করা, বড় বড় রাঙা রাঙা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটা ছোকরা, তেমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র; মাথাটি মুড়ান, বোধ হয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়, গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রংটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে; চোখ দুটি পটল-চেরা; ঠোঁট দুটি পাতলা অথচ লাল; গাল দুটি বেশ গোলগাল, দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, কপালখানি ছোট, কম চওড়া; দুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে।"

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলছি। প্রথম লক্ষণীয়, এর ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা, খেয়ালের ডাণ্ডা মেরে ক্রিয়াপদগুলির হাড়গোড় ভেঙে দিলেই সাধুভাষা কথ্যভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবু এ মুখ্য ভাষা, যেহেতু এর বিন্যাস এমন যে, সাধারণ কথাবার্তা বলতে যেটুকু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জোর দরকার এতে ততোধিক জোরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রম্ভালাপের সময় কথা বলছি এ চৈতন্য সব সময় হয় না, এই গদ্য পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম, তদ্‌ভব ও খাঁটি দেশী শব্দ কেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে খোপে-খোপে কেমন জোড়া লেগে গিয়েছে। এর তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশীর মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।

বাংলা গদ্যরীতির মূলে তিনটি মৌলিক নীতি আছে বলে উল্লেখ করেছেন

শাস্ত্রী মশাই, ফারসীবহুল আদালতী রীতি, সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী রীতি, আর উভয়ের মধ্যস্থ বিষয়ী লোকের রীতি যাতে নাকি দেশী শব্দের প্রাধান্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বনিয়াদ এই শেষোক্ত রীতি। কিন্তু গোড়াতেই এ রীতিতে তিনি পেঁৗছাননি। বাল্মীকির জয় ও কাঞ্চনমালায় স্পষ্টতঃ তাঁর আদর্শ বঙ্কিমী রীতি। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি—রচনার বিষয়ান্তর গ্রহণ ও অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ফলে তিনি বেনের মেয়ে প্রবন্ধের ভাষারীতিতে পেঁৗছেছেন। এ রীতি তাঁর স্বকীয়—আর বাংলা গদ্যরীতি-সমূহের মধ্যেও বিশিষ্ট। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভাষার সুদূরপ্রসারী প্রকাশশক্তি এর নাই,সত্য, কিন্তু তেমনি সত্য এ রীতিকে অপরের পদাঙ্ক বলে ভুল করা চলবে না। বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি যে-সব একান্ত স্বকীয় রীতির উদ্ভব হয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষা তাদের অন্যতম। বিষয়ী লোকের রীতি তার বনিয়াদ, বঙ্কিমী রীতি তার আদর্শ, কিন্তু পরিণত ফলশ্রুতি একান্তভাবে হরপ্রসাদীয়। বোধ করি বঙ্কিমী রীতির চরম সার্থকতা হরপ্রসাদীয় রীতিতে, কেননা তার ফলে আর একটি অনু বঙ্কিম সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে নূতন লেখকের। আমার বিবেচনায় বঙ্কিমী রীতির জের টেনে সার্থকতার ক্ষেত্রে এই পর্য্যন্তই আসা সম্ভব।

এবারে আমরা এমন কয়েকজন লেখকের উল্লেখ করবো যাঁদের ভাষারীতি আদৌ বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রভাবিত নয়। তাঁরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কিন্তু মনে হয় যেন অন্য দেশে বসে লিখেছেন। অন্য দেশ সত্য তবে সে দেশ বাংলা দেশ। বঙ্কিমের ভাষারীতির সমান্তরাল প্রবাহিত তাঁদের ভাষারীতির ধারা। বঙ্কিমের ভাষার ভরা ভাদ্রের স্রোতে যখন বাংলা সাহিত্যের শ্রীমন্ত সদাগরের ধনজনেপূর্ণ নৌবহর নূতনতর ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে ভাসমান তখন এই পার্শ্ববর্তী গাঙিনীর তীর ও নীর শূন্যপ্রায়। তবু এই গাঙিনীর ক্ষীণ ধারাটির মূল্য কম নয়, কেননা, উৎসমূলের বিচারে বঙ্কিমের ধারার চেয়ে এই ধারাটির গুরুত্ব অনেক বেশি—এর উৎস দেশের মাটির গভীরে নিহিত। বঙ্কিমের ধারাই এখন প্রবল এবং প্রধান জলময় রাজপথ। কিন্তু এ বাংলা দেশ। ভাগীরথী ও পদ্মার প্রাধান্য নিতান্তই আপেক্ষিক। আজ পদ্মা প্রবলা কিন্তু কালান্তরে ভাগীরথী যে রসপ্রবাহকে আকর্ষণ করে নিয়ে প্রবলতরা হয়ে উঠবে না—কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। এই ধারাটির দুর্ভাগ্য এই যে কোন মহৎ সাহিত্যিক এই ধারার কাছে

আত্মসমর্পণ করেননি, যদি ভবিষ্যতে কখনো কোন মহৎ সাহিত্যিক এই ধারাকে আপন কল্পনার ময়ূরপঙ্খী চালনার পথ হিসাবে গ্রহণ করেন তবে হয়তো দেখা যাবে বঙ্কিমী নদীর তীরবর্ত্তী মেলার জনতা ভেঙ্গে এই গাঙিনীর তীরে এসে ভিড় জমিয়েছে। হেমন্ত দ্বিপ্রহরের এই নিরর্থক কল্পনার অবসান ক'রে এবারে তথ্যের পর্য্যায়ে নেমে আসা যেতে পারে।

বঙ্কিমের ভাষারীতির সমান্তরালভাবে আর একটি ভাষারীতি প্রবাহিত যার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতির রচনা। কালীপ্রসন্নের বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে, এবারে অপর তিনজনের ভাষা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য বলতে চেষ্টা করবো।*

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়সে বঙ্কিমের দুই বছরের ছোট আর রবীন্দ্রনাথের একুশ বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব তাঁর উপরে থাকবার কথা নয়—কেননা, রবীন্দ্রনাথের কলম তৈরি হয়ে উঠবার আগেই তাঁর নিজের কলম পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু যখন দেখি যে বঙ্কিমের ভাষা-প্লাবনের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যোগেশ বিদ্যানিধি প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিক নন, বৈজ্ঞানিক, তবু তাঁর ভাষা বঙ্কিমের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বেড়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক নন; তাঁর ভাষা সম্পূর্ণ নিজস্ব, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জ্জিত। আবার তাঁদের তিনজনের ভাষার মধ্যে স্বকীয় ছাপ ও গৌণ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এ ভাষারীতি মূলতঃ এক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বিষয়ী লোকের ভাষা বলেছেন এ ভাষার মূল সেই ভাষা। কিন্তু আগে বলেছি যে বিদ্যাসাগরের ও বঙ্কিমের ভাষাও তাই। তবে দুয়ে প্রভেদ কোথায়? বিদ্যাসাগর বিষয়ী লোকের রীতিটি গ্রহণ করে তাকে যথাসম্ভব সংস্কৃত করে নিজের কাজের উপযোগী করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিম নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের হাত থেকে সেই সংস্কারসাধিত রীতিটি, আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাকে বঙ্কিমের হাত থেকে। এই ভাবে ভাষা

* গ্রন্থ মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার উদাহরণ: চিঠি পত্র; গীতাপাঠের ভূমিকা; আর্য্যামি এবং সাহেবি আনা॥ যোগেশচন্দ্রের রচনার উদাহরণ: ভোজবিদ্যা॥ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষার উদাহরণ: পত্র; পত্র; বর্ত্তমান ভারত; বাঙ্গালা ভাষা॥

উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশ্রী হয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, যোগেশ বিদ্যানিধি ও বিবেকানন্দ এই বর্দ্ধিতশ্রী ভাষারীতিকে গ্রহণ না করে একেবারে গোড়ায় ফিরে গিয়ে মূল অবিকৃত রীতিটি গ্রহণ করেছেন। দুই-ই মূলতঃ এক কিন্তু কার্য্যতঃ ভিন্ন, তাই সব সময় এদের মূলগত ঐক্য ধরা পড়তে চায় না। তার উপরে আবার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ, তাঁরা অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভা বলে ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছেন, তার ফলেও মূলের ইতিহাস অনেকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-প্রতিভায় তাঁদের সমকক্ষ নন বলে, সাহিত্য তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নয় বলে ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে চেষ্টা করেননি, অনেকটা একমেটে অবস্থায় রেখে গিয়েছেন। এই কারণে তাঁদের ভাষায় মূলের প্রকৃতি বেশ স্পষ্ট।

আরও এক কথা। বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ এঁদের ভাষা। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার সত্ত্বেও এঁদের ভাষাই কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠ নমুনা, কেননা, বাঙালীর মুখের ইডিয়াম এঁদের ভাষায় যেমন ধরা পড়েছে এমন বঙ্কিমের ভাষায় নয়—আর রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর যেসব রচনা কথ্যভাষার নমুনা ব'লে উল্লিখিত হয়ে থাকে তাতেও নয়। আমার কেমন যেন বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির দুটি ধারা। একটি কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ অনুসৃত—অপরটি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত। প্রথমটির মূল বিষয়ী লোকের রীতি, দ্বিতীয়টির মূল বিষয়ী লোকের রীতি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের হাতে যে রূপ গ্রহণ করেছে সেই রীতি, অর্থাৎ সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা। শেষোক্ত রীতিটি যে প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠেছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির কলমের গুণ। তাই একথা নিশ্চয় ক'রে বলা উচিত নয় যে মহৎ সাহিত্যিকের কলমের স্পর্শ পেলে প্রথম রীতিটি কোন কালে প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠবে না। ভাষার বর্ত্তমান প্রবণতা সেইদিকে চলেছে বলেই মনে হয়। এবারে আমরা বঙ্কিমী যুগের অবসানে এসে পড়েছি—এখন নূতন পটোত্তোলন হবে রবীন্দ্রনাথের যুগে।

॥ রবীন্দ্রযুগ ॥

১৮৯৪—১৯৪১

যুগাবসানের প্রদোষদীর্ঘ দিনের আলোয় আর রাতের অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে পাঞ্জা-কষাকষি চলতে থাকে, তখন না-দিবা না-রাত্রি। যুগাবসানের ক্ষেত্রেও এই রকম নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতেই অবসিত হয়নি, আরো কিছুদিন জের টেনে চলেছে। রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রনাথের তিরোধান সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সাহিত্যে যুগের চাল গোপন বলেই তার বিচার কঠিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ লিখতে সুরু করেছেন আর স্বভাবতই সেকালের প্রায় সমস্ত লেখকের মতোই তিনি বঙ্কিম-প্রভাবিত কলম ধরেছেন। যখন তাঁর গদ্যের কলম পরিণত হয়ে উঠেছে, রচনার ছটায় স্বকীয়তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে—তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর রচনায় অবিরল। সেই প্রভাবের জের কাটতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে। সেই বিস্তারিত আলোচনায় নামবার আগে প্রাথমিক কিছু ভূমিকা করে নিতে চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখতে সুরু করেন তখন তিনি পূর্ব্বসূরিদের কাছ থেকে কিছু পাননি বললেই হয়—কেবল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে একটি পথনির্দ্দেশ ছাড়া। সেইজন্য বঙ্কিমের রচনা একান্ত ভাবে পূর্ব্বসংস্কারমুক্ত, পড়তে বসলে কোন পূর্ব্বসূরিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। এ সুবিধাও বটে আবার অসুবিধাও বটে। সুবিধা এই জন্যে যে বেশ লঘুচিত্তে পথ চলতে পারা যায়—এমন কি অনেক সময় চলবার পথটাও তৈরি ক'রে নিতে হয় বলে তৈরি-পথ পাওয়ার কৃতজ্ঞতার দায়ও বহন করতে হয় না। আর অসুবিধা। মহৎ সাহিত্য কতকগুলি পূর্ব্বসংস্কারের ভিত্তির উপরে গঠিত হয়ে ওঠে বলে সেই ভিত্তির আশ্রয় না পাওয়ায় অনেক সময়ে লেখককে বিব্রত বোধ করতে হয়। বাইরে থেকে আসবে ট্রাডিশন বা সংস্কার, আর ভিতর থেকে আসবে ফ্রিডম বা মুক্তির প্রেরণা। এইভাবে ভিতরে বাইরে, সংস্কার ও মুক্তির টানাটানিতে মহৎ সাহিত্য গড়ে ওঠে। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে আশঙ্কা ছিল পূর্ব্বসংস্কারের ভার লঘু বলে তাঁর রচনা একসেন্ট্রিক বা উন্মার্গগামী হয়ে উঠতে পারে। তা যে হয়নি তার মূলে আছে বঙ্কিমের অসামান্য বিচারবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথকে অন্ততঃ দু'জন শক্তিশালী পূর্ব্বসূরির ঋণ বহন ক'রে যাত্রা সুরু করতে হয়েছে

—মধুস্থদনের ও বঙ্কিমচন্দ্রের। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সে পূর্ব্বসংস্কার খুব গুরুভার ছিল না। সহজেই তাকে স্বীকার ক'রে আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছেন তিনি। পূর্ব্বসূরির পদাঙ্ক পাননি বলেই মধুস্থদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথমে পদক্ষেপ করতে হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। রবীন্দ্রনাথকে সে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। তাই তিনি নিঃশেষে ও নিঃসপত্নভাবে নিজেকে দান করতে পেরেছেন বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হিসাবে শুধু শক্তিশালী নন অসামান্য সৌভাগ্যবানও বটেন। নব্য বাংলা সমাজের ঠিক যে সময়টিতে জন্মালে পূর্ণ বিভূতি প্রকট সম্ভব তখনি হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। কুড়ি বৎসর আগে বা কুড়ি বৎসর পরে এই প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তার এই পরিমাণ ফল পাওয়া যেত কি না সন্দেহ।

আরও এক কথা। রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোন সাহিত্যিক গদ্য পদ্যের.জোড় কলম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। মধুস্থদন গদ্য লিখতে পারতেন না; বঙ্কিমচন্দ্র পদ্য লিখতে পারতেন না—যদিচ কবিত্বগুণ তাঁতে যথেষ্ট ছিল। যদিচ রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্য পদ্যের জোড়া কলম ছিল তবু তাঁর পদ্যের কলম তাঁর গদ্যের কলমকে যে পরিমাণে প্রভাবিত ও চালিত করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর কবিতার যাবতীয় গুণ, তাঁর গদ্যে। বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে তাঁর পদ্যের কলমটাই যেন মাঝে মাঝে গদ্যের ছদ্মবেশ পরে। এ যেন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ। এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এখন এইটুকুই যথেষ্ট, পরে আবার স্থত্রটি অনুসরণ করতে হবে।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের স্থচনা ধরলে—উনত্রিশ বৎসর তাঁর সাহিত্যজীবন। আর এই সমস্তটাই নব্য বাঙালীর ইতিহাসের একটিমাত্র পর্ব্বের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ছেষট্টি বৎসর। এত দীর্ঘ সময় কোন দেশেই কোন সময়েই একই পর্ব্বের মধ্যে অতিবাহিত হয় না, এক্ষেত্রেও হয়নি। রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ব্বাহ্নে ও পরাহ্নে অনেক প্রভেদ, পর্ব্বে পর্ব্বে পড়েছে এর উপরে নানা ভাবের ছায়াতপ। তুলনায় বঙ্কিমসাহিত্য অনেক সরল, ও যেন একটিমাত্র শিলাখণ্ডে গঠিত। দুজনের সাহিত্যেই বাঙালীর জীবনের বাহন, তবে যে প্রভেদ দেখি, তার কারণ ইতিমধ্যে বাঙালীর জীবনে অনেক যুগান্তর ঘটে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভারসাম্যের উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালে এ ভারসাম্য বিচলিত হয়নি। আর এই ভারসাম্যের প্রভাবেই তাঁর রচনারীতিও একটা ভারসাম্যের সন্ধান করেছে—অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করেছে—এ কথারও উল্লেখ করেছি, বলেছি যে ষ্টাইলে শুধু লেখকের ছবি নয়, যুগের ছবিও ধরা পড়ে, বঙ্কিমের ষ্টাইলে তাঁর যুগ প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে সুরু করেন তখনো এ ভারসাম্য অটুট ছিল—ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়েছে ধীরে ধীরে, নানা ঘটনার প্রতিঘাতে, প্রধানতঃ আর্থিক বিপর্য্যয় ও ইংরাজশাসনের প্রতি অবিশ্বাসে। কাল গণনায় ১৮৯৪ থেকে ১৯৪১ সাল সাতচল্লিশটি মাত্র বৎসর—যুগ গণনায় তার চেয়ে অনেক বেশি—"এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর।" একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রী-অভিষেক নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বিষয়টা ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় মন্ত্রী অর্থাৎ বড়লাটের পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে মন্ত্রী-নির্ব্বাচনটা ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক হোক। আবার ১৯৪১ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে লিখেছিলেন সভ্যতার সংকট নামে দীর্ঘ জীবনের উপান্ত বাণী। এখন এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে যে দূরত্ব তা 'সা' থেকে 'নি'র দূরত্ব। প্রথম প্রবন্ধে ইংরাজশাসনের প্রতি যে গভীর আস্থা প্রকাশ হয়েছে সাতচল্লিশ বৎসরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গিয়েছে—কানাকড়িও বাঁচেনি।

মন্ত্রী-অভিষেক কেন? "আমাদেরই সুবিধার জন্য। কারণ ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই, যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য ইংরাজের ইহাতে আনুষঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না। তবে কি আশা লইয়া আজ আমরা এখানে সমবেত হইতাম! তবে আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র আমাদের মনে উদয় হইবার বহু পূর্ব্বেই বিলাতের নির্ম্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা নিরঙ্কুর হইয়া লোপ পাইত।"*

* মন্ত্রী অভিষেক—র-র, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড।

এবার সভ্যতার সংকট থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা যাক—"ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোন অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ-শাসনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোন পাশ্চাত্ত্যজাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্ত্যজাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।"*

দুটি প্রবন্ধ, দুটির দূরত্ব কালগত নয় ভাবগত, একটিতে পূর্ণ আস্থা আর একটিতে সম্পূর্ণ অনাস্থা। তুলনীয় মৃণালিনীর মাধবাচার্য্যের স্বদেশোদ্ধার ব্রত ও আনন্দমঠের সত্যানন্দের স্বারাজ্যস্থাপন আকাঙ্ক্ষা। প্রভেদ অকিঞ্চিৎ-কর, কেবল ডিগ্রির প্রভেদ। দুই দুস্তর দূরত্বকে সংক্রামিত করে বিরাজ করছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন। এখন সমাজের এই ভাবব্যতিক্রম, যার অপর নাম ভারসাম্যে বিচলন তাঁর রচনারীতিতে প্রতিফলিত হবে না এ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিচার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেকাংশে এই ভারসাম্যের অভাবের কার্য্যকারণের অনুসন্ধান। এতদিন যে গদ্যরীতি একটিমাত্র খাতকে অবলম্বন ক'রে প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল, ভিতর থেকে নাড়া খেয়ে নদীগর্ভ উঁচু হয়ে যাওয়ায় তা দ্বিধা ত্রিধা হয়ে কালক্রমে শতধা হয়ে পড়লো। এক রবীন্দ্রনাথের কলমেই দেখা গেল যুগে যুগে অনেক রকম গদ্যরীতি, অবশেষে এমন এক সময় এলো যখন অবহেলিত মরা গাঙটাই প্রবলতর হয়ে উঠল—"কথ্যরীতি" স্থায়ী আসন লাভ করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ভারসাম্যে বিচলন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইংরাজশাসনের শুভকারিতা ও ইংরাজশাসকের ন্যায়নিষ্ঠায় বাঙালীর তেমন

* সভ্যতার সংকট, র-র, ২৬ খণ্ড।

আর আস্থা নাই, তার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী, তার চাকুরীর আসনেও ঘটেছে সঙ্কোচ, আর সর্ব্বোপরি ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে অপসারিত হওয়ায় এক কলমের খোঁচায় বাংলাদেশ ভারতশাসনতন্ত্রের সদর থেকে মফঃস্বলে পরিণত হয়েছে। এ ১৯১১ সালের ঘটনা। ১৯১৪ সালে বাধলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এখন, এইসব ঘটনাপুঞ্জ তলে তলে বাঙালীর চিত্তে যে পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছিল তারই একটি রূপ প্রকাশ পেল সবুজপত্রে প্রকাশিত ভাষার নূতন কলমে বা ষ্টাইলে। এ ১৯১৫ সালের ঘটনা। এ হচ্ছে প্রথম লক্ষ্যগোচর স্থচনা। তার পর থেকে পরিবর্ত্তনের স্রোত এমন উত্তাল হয়ে উঠেছে যে পাকা মাঝি রবীন্দ্রনাথের নৌকাও অনেক সময়ে তাল সামলাতে পারেনি। সেই পরবর্ত্তী ইতিহাস পরে বিবৃত হবে। এখন পিছিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটা খসড়া দিতে চেষ্টা করবো। তার পরে আবার প্রয়োজন হলে সমাজপরিবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাবে।

বাংলা গদ্যের শক্তি, সীমা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যত পরীক্ষা করেছেন এমন আর কেউ নয়? এইসব পরীক্ষা চালাতে গিয়ে পর্ব্বে পর্ব্বে তিনি নূতন গদ্যরীতির প্রবর্ত্তন করেছেন। তৎসত্ত্বেও স্থূল বিচারের উদ্দেশ্যে তাঁর গদ্যরচনাকে তিন অতিপর্ব্বে ভাগ করা চলে। প্রথম থেকে আরম্ভ করে চোখের বালি, নৌকাডুবিতে এসে একটা পর্ব্বের শেষ হয়েছে। তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বের স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়—প্রধানতঃ গোরা, জীবনস্মৃতি ও চতুরঙ্গ এই সময়ের রচনা। শেষ পর্ব্বটা দীর্ঘ। ঘরে বাইরে থেকে সুরু করে তিন সঙ্গী, সভ্যতার সংকট।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের উপরে যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা অল্পবিস্তর সকলের রচনাতেই পড়েছে—রবীন্দ্রনাথের প্রথম অতিপর্ব্বের রচনাও মুক্ত নয়—যদিচ বঙ্কিমের গদ্যরীতির ছাঁচ ও ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বকীয়তাও দেখা দিতে সুরু করেছে। বৌঠাকুরাণীর হাট থেকে কতকটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

"সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ঐ দিকে কোথায় আছে।......... বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে

যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ পর্য্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?"*

এখানে বঙ্কিমের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। সেই ছোট ছোট বাক্য, সেই প্রশ্নাত্মক বাক্য—প্রশ্নের মধ্যেই যার উত্তর নিহিত। এগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষভাবে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। নাতিপরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে।†

* বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সুরমার মৃত্যু।

† এই সময়ে লিখিত গদ্য সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকটি রচনা বিশেষভাবে বঙ্কিম কর্তৃক প্রভাবিত, তাও আবার শুধু রীতিবিচারে নয়—চিন্তার ধারাতেও বটে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত রচনাটি জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামে মাসিকপত্রে ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।—বাঙ্গালা-সাহিত্যে গদ্য, সুকুমার সেন, পৃঃ ৮১-১৯০, ৩য় সং।

(১) "মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত হয় ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়।"

নিম্নে উদ্ধৃত রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের—নাম গীতিকাব্য, প্রকাশ কাল বৈশাখ ১২৮০, বঙ্গদর্শনপত্র।

"যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখনো ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়া দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী।"

এ দুয়ে মিল যে শুধু রীতিগত নয়—চিন্তার ধারাগত, পাশাপাশি দুটি রচনা পড়লেই স্বীকার করতে হয়। বস্তুতঃ এই পর্ব্বে লিখিত যাবতীয় গদ্য রচনা, কি মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, কি করুণা, সমস্তই বঙ্কিমী গদ্যরীতির ছাঁচে ঢালাই। ভিখারিণী, ঘাটের কথা, রাজপথের কথাও ব্যতিক্রম নয়। আর শুধু গদ্যরীতিই বা কেন, কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনেও বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট। বৌঠাকুরাণীর হাট বহুলাংশে বিষবৃক্ষের ছাঁচে রচিত। নিরীহ সুরমার আত্মহত্যা

গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে বক্তব্য বিষয়ের উপরে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যতই নিজস্ব বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততই তিনি বঙ্কিম-প্রভাব মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে এ প্রভাব মুক্ত হতে তাঁকে চোখের বালি ও নৌকাডুবি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঐ দু'খানি উপন্যাসও সাধুভাষায় লিখিত। ভাষায় যদি বা বঙ্কিমের গদ্যরীতির ধ্বনি না শুনতে পাই, প্রতিধ্বনি না শুনে উপায় নাই। আবার নৌকাডুবির প্রথম কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যে দ্রুতহস্তে সমগ্র গল্পের ভূমিকা নির্ম্মাণেও বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ হস্ত মনে পড়ে।

কিন্তু শুধু এইটুকু বললে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাপ্রতিভার প্রতি অন্যায় করা হবে। এই অতিপর্ব্বের মধ্যেই এমন স্তর রচনা দেখা দিতে আরম্ভ ক'রেছে যার মধ্যে খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো বঙ্কিমপ্রভাব আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়; কিন্তু মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এখানে রবীন্দ্রনাথ অনন্যপ্রভাবিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ও ছিন্নপত্র ভাষারীতিতে নূতন পথ প্রদর্শন করে—যে পথকে পরবর্ত্তী কালে তিনি প্রশস্ততর ও সুগমতর ক'রে তুলেছেন। কিন্তু 'চিঠিপত্রে' যেখানে কথ্যভাষা প্রত্যাশিত, সাধুভাষাটাই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন বললে অন্যায় হবে না যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাধুভাষা বা পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের রীতি ব্যবহার করেছেন সেখানে বঙ্কিমের প্রভাব এড়াতে পারেননি, যেখানে হ্রস্বক্রিয়াপদের রীতি ব্যবহার করেছেন—তিনি সেখানে স্বকীয় ও স্বাধীন। এ থেকে এমন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নয়, অনেকে করেছেন, যে সাধু ক্রিয়াপদটাই বুঝি বঙ্কিমীভাষার সুনিশ্চিত লক্ষণ, যেমন গদ্যে ও পদ্যে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ যথাক্রমে বিদ্যাসাগরের ও মধুসূদনের রচনার সুনিশ্চিত লক্ষণ। রীতিবিচার যে এত সহজ নয় সেই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয়। রুক্মিণীর অতৃপ্ত প্রেম ও আত্মনিগ্রহ হবার পরিণাম মনে আনে। সেই যে বাল্যকালে তিনি বঙ্গদর্শনের পাতা থেকে সকলকে বিষবৃক্ষ পড়ে শোনাতেন সেই সুখস্মৃতির প্ররোচনায় বিষবৃক্ষ তাঁর কাছে বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনা করতে গেলেই তাঁর মনে পড়েছে বিষবৃক্ষ। রবীন্দ্রনাথের এই বয়সের রচনা সম্বন্ধে যাঁরা আরো অধিক জানতে চান অধ্যাপক সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'র ৫ম পরিচ্ছেদ দেখতে পারেন।

করছি। তা যদি হতো তবে জীবনস্মৃতি, গোরা ও চতুরঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ বঙ্কিমকে স্মরণ করিয়ে দিত।

গোরা, জীবনস্মৃতি ও চতুরঙ্গ, বিশেষভাবে প্রথম দু'খানি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভাষার মধ্যগারীতির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন—অবশ্য তাঁর মতো প্রচণ্ড সাহিত্যিক পার্সনালিটিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যতখানি কাছাকাছি আসা সম্ভব। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট পদাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও সে পদাঙ্ক বাঁচিয়ে পাশ দিয়ে চলবার রাস্তা আছে। এ ভাষাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করলে খুদে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে না—গ্রহণকারীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবার আশা থাকে। শরৎচন্দ্র বলেছেন যে, তিনি পঞ্চাশবার গোরা পড়ে ভাষার মহড়া দিয়েছিলেন। কথাটা সত্য বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্রের প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ঋজু নিরলঙ্কার ভাষা গোরার ভাষাকে মনে করিয়ে দেয়। • এমন কি আমার বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ভাষার ভিত্তিও গোরার ভাষা; উভয় ক্ষেত্রেই ঋজু, তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ প্রসাদগুণ। অলঙ্কার রবীন্দ্রসাহিত্যের, কি গদ্যের কি পদ্যের, প্রধান লক্ষণ। সেই অলঙ্কার প্রাচুর্য্যের চাপ এই সময়ের রচনায় কিছু কম, অলঙ্কারবর্জ্জন একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ও অনুভূতির medium অলঙ্কার। বিশেষণ ও অলঙ্কারে আপেক্ষিক বিরলতা, অলঙ্কারে ও শব্দসম্ভারে স্বতো-বিরুদ্ধের মিশ্রণ, ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা তাঁর গদ্যরীতিকে এমন একটা আত্মনিষ্ঠ ভারসাম্য দান করেছে যার একমাত্র তুলনা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যার অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনায় আর পাই না। এই ভারসাম্যের বারে বারে উল্লেখ করেছি বঙ্কিমের রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে। ভাষায় এই ভারসাম্য ভাষাব্যবহারকারীর, ভাষার পাঠকের অর্থাৎ সমাজের ভারসাম্যের একটা বহিঃপ্রকাশ। এখানেই বাঙ্গালী সমাজের ভারসাম্যের শেষ মুহূর্ত্ত, এর পরে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে—ভাষারীতিরও। তার পরে যখন মনে পড়ে গোরার প্রকাশ কাল ১৯১০, জীবনস্মৃতির প্রকাশকাল ১৯১২, বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯১৪, আর সবুজ পত্রের প্রকাশ ১৯১৫—তখন ভাষার বিবর্ত্তনে আর সমাজের বিবর্ত্তনে মিলে নিদারুণ অবস্থাটা ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

এর পর থেকে অর্থাৎ 'ঘরে বাইরে'র সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য—পদ্যও বটে—বিচলিত ভারসাম্য সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। এ যেন

চলন্ত রেলগাড়ীতে ব'সে লেখা, চলার তাল লেখার অক্ষরগুলোকে নাড়া দিয়ে আপন স্বাক্ষর রেখে যায়, এমনকি প্রথম শ্রেণীর গদির উপরে ব'সে লিখলেও চলার ছন্দের চিহ্ন থাকবেই।

দীর্ঘজীবী শক্তিমান লেখককে জীবনের শেষে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হয় তাকে একই রীতিতে লিখে যেতে হবে নয় নিত্যনূতন রীতি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ, হয় তাকে নিজের অনুকরণ করে যেতে হবে নয় নিজের বিকাশ ঘটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথকেও এ সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত হতে হয়েছে। তাঁর অসামান্য নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা। কিন্তু সমস্ত শক্তিরই একটা সীমা আছে—কেননা লেখকের প্রতিভা অনন্য-নির্ভর নয়, ভাষার ও সমাজের সীমাই তার সীমা। যখন সেই সীমাকে সে বাড়িয়ে দেয় ভাষা ও সমাজের সহযোগিতাতেই দেয়, ভাষার শক্তিকে ও সমাজের সহযোগিতাকে কতক দূর পর্য্যন্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তি টেনে নিয়ে যেতে পারে—অনন্তকাল পর্য্যন্ত পারে না। ভাষা, সমাজ ও নিজের শক্তির সীমা বুঝতে পারাও প্রতিভার একটি লক্ষণ। এখন রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনার ক্ষেত্রে (পদ্যরচনার ক্ষেত্রেও বটে) নিজের কীর্ত্তি ও সীমাকে অতিক্রম করতে গিয়ে নূতন নূতন রীতির উদ্ভাবন করেছেন একথা নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু একেবারে শেষ জীবনের রচনা, যেমন শেষের কবিতা ও তিনসঙ্গী পড়তে পড়তে অনেক সময়ে মনে হয় যে দুর্ব্বল বাংলা ভাষার মেরুদণ্ডের উপরে অত্যন্ত বেশি চাপ দেওয়া হয়েছে। শেষের কবিতায় "রবি ঠাকুরের" উপরে * অমিতের উষ্মা আসলে রবীন্দ্রনাথের উপরে রবীন্দ্রনাথেরই উষ্মা। অমিতের হাত দিয়ে নিজের গদ্যরীতিকে চাবকে নূতনতর চালে চলাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাবান্ ভাষার অন্ধিসন্ধি ও হাড়হদ্দ সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি জানতেন যে এমন করে বেশি দূর চাবকে চালানো যায় না, ভাষার সহিষ্ণুতার উপরে অত্যাচার হয়। তাই তিনি ভাষা ছেড়ে রেখাকে ধরেছেন। তাঁর ছবি তাঁর সাহিত্য রচনারই অনুক্রম; লেখার যেখানে শেষ, রেখার সেখানে আরম্ভ।

এখন এইভাবে নিজেকে নিজে অতিক্রম করতে যাওয়ার ফলে তাঁর শেষ জীবনের গদ্যরীতি অনেক সময়ে চলার স্বাভাবিক ছন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

* বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শেষের কবিতা।

সার্কাসে যে খেলোয়াড় বিচিত্র ব্যায়াম কসরৎ দেখায় তা সার্কাসেই শোভা পায়, সেই চালে সরকারী সড়কে চলতে গেলে বিড়ম্বনা না হ'য়ে যায় না। শত রকমের অলঙ্কার, বিচিত্র কল্পনাবিলাস, নানা জাতের শব্দসম্ভার, আর সর্ব্বোপরি একটি অসাধারণ মনের মনস্বিতা ও খেয়াল এমন আষ্টেপৃষ্ঠে পাঞ্জা ক'ষে দিয়েছে এইসব রচনার উপরে যে তা মন দিয়ে চোখ দিয়ে উপভোগ করবার, কিন্তু মারাত্মক মন্ত্রঃপূত এ-সব বস্তু স্পর্শ করবার যোগ্য নয়। এ-সব সৃষ্টি না হলে বাংলাসাহিত্য দীনতর হয়ে থাকতো নিঃসন্দেহ—তৎসত্ত্বেও ভুললে চলবে না ঐ অলৌকিক জাদুতে মুগ্ধ হয়ে তাকে মডেলরূপে গ্রহণ করবার চেষ্টা না করাই উচিত। ও পক্ষীরাজ সাধারণের বাহন নয়। কিন্তু একথা সকলে মনে রাখেনি। এখানে একটি বিষয় সসঙ্কোচে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্যের প্রভাব আমাদের গদ্যসাহিত্যের উপরে শুভঙ্কর হয়নি। দোষটা আমাদেরই, কারণ আমরা বুঝতে চাইনি যে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন সাধারণের আসন নয়। ওর প্রভাবে দেশটা খুদে খুদে অষ্টাবক্রে ভরে যাওয়ার আশঙ্কা—একটাও আস্ত স্বাভাবিক মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

বঙ্কিমীরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি তর্ক তুলেছিলাম, বলেছিলাম যে প্রবন্ধজাতীয় রচনাতেই বঙ্কিমীরীতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দৃশ্যমান, আরও বলেছিলাম যে সাংবাদিকতার অভ্যাস গদ্যরীতির বিবর্ত্তনে শুভ সহায় হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে। এক্ষণে রবীন্দ্র-গদ্যরীতি প্রসঙ্গে এই দুটি তর্ক তুললে কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাক। সম্পাদক ও প্রধান লেখক হিসাবে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথকে সাময়িক পত্রের ভার বহন করতে হয়েছে, কাজেই যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথকেও সেই অর্থে সাংবাদিক বলতে পারা যায়। সাংবাদিকতার অভ্যাস বঙ্কিমকে সাময়িক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করেছে, রস-সাহিত্যের সীমানাবহির্ভূত বহুতর বিষয়ের প্রতি তাঁকে সচেতন ক'রে তুলেছে, আর সর্ব্বোপরি তাঁর গদ্যরীতির মেদবাহুল্য ঝরিয়ে দিয়ে তাতে ব্যায়ামবীরের দেহের স্বাস্থ্যঘন ঋজুতা অর্পণ করেছে। এই জন্যেই বঙ্কিমের প্রবন্ধে গদ্যরীতির বিশুদ্ধতর মূর্ত্তি দেখা যায় বলেছি। রবীন্দ্রনাথের বেলায় প্রথম দুটি সার্থকভাবে প্রযোজ্য; সাময়িক ঘটনা ও রস-সাহিত্যের বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখতে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু সাংবাদিকতার অভ্যাস তাঁর গদ্যরীতিকে সে ঋজুতা, বা নিরলঙ্কারতা,

বা ক্ষিপ্রতা দান করেছে এমন মনে হয় না। তিনি রস-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে একই ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন—সেই জন্যই তাঁর প্রবন্ধসমূহ, বোধ করি বিনা ব্যতিক্রমে, এক অর্থে রস-সাহিত্যের অন্তর্গত। বিষয়ীকে অন্তরালে রেখে বিষয়কে মুখ্য করে তোলাতেই প্রবন্ধকারের মুন্সীয়ানা। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিষয় ও বিষয়ী দুটিই মুখ্য, অধিকাংশ স্থলে বিষয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে বিষয়ীর মাথা, এমনকি নিতান্ত তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলোতেই। নিছক যুক্তির সূত্র অনুসরণ করে চলেছেন এমন সম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রায় চোখে পড়ে না, কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। একে তো যুক্তির সূত্র অতিশয় ক্ষীণ, তথ্যের সম্বলও নামে মাত্র, তদুপরি ভাষা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, তার উপরে যখন মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস কোটালের বন্যার মতো এসে পড়ে * তখন সমস্ত রচনাটি প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্তর থেকে অকস্মাৎ কাব্যের জগতে উন্নীত হয়। তত্ত্ব হিসাবে, চিত্র হিসাবে, রস-সাহিত্য হিসাবে এসব অংশ শিরোধার্য্য—কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এ না প্রবন্ধের ভাষা না প্রবন্ধের ভাব। সত্য কথা বলতে কি রবীন্দ্রনাথের মন মেজাজ ও কলম প্রবন্ধকারের নয়। প্রবন্ধকারের মন মেজাজ ও কলম নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রামেন্দ্রসুন্দর ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি জন্মেছিলেন। সাহিত্যগুণে, চিত্র তত্ত্ব প্রভৃতির বিচারে রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিপুল রচনা-সাহিত্য এঁদের সকলের রচনার উপরে স্থান পাবে নিশ্চয় কিন্তু সে প্রবন্ধ হিসাবে নয়—প্রবন্ধের ঠাট, প্রবন্ধের চাল, প্রবন্ধের চলন, প্রবন্ধকারের মন, মেজাজ ও কলম—সে সব একেবারেই ভিন্ন।

তবে প্রবন্ধকারের একটি গুণ রবীন্দ্রনাথে সুপ্রচুর ছিল। এই গুণটির ইংরাজি নাম urbanity; নাগরিকতা শব্দটি এক্ষেত্রে চলে কি না জানি না। বড় একটি নগরে বাস করলে বহুতর ও বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা মানুষের মনে যে একটি সংস্কারমুক্ত উদার ভাব এনে দেয় তাকেই বোধ করি বলা হয় নাগরিকতা বা urbanity গুণ। বঙ্কিম, ভূদেব, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ও প্রমথ চৌধুরী ভিন্ন এই গুণটি থেকে আমাদের অধিকাংশ লেখক বঞ্চিত। urbanity দূরে থাক অনেকে suburbanity পর্য্যন্ত পেঁছিতে পারেননি—চিন্তায়, মননে ও দৃষ্টিতে নিতান্তই গ্রাম্য, মুখ খুলতেই পল্লীসমাজ কথা বলে ওঠে। বলা বাহুল্য. গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যতা, উপনাগরিকতা

* পদাঙ্ক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নববর্ষ দুঃখ।

ও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত। কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘকালের রাজনৈতিক পরাধীনতা তার মাশুল আদায় ক'রে নিয়েছে এইসব শ্রেষ্ঠ মনীষীর কাছ থেকেও। বঙ্কিমচন্দ্র কারণে অকারণে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের আঘাত দিয়েছেন, তাদের যারা গুরু বলে মনে করে—বিশেষভাবে প্রাচ্যবিদ্যার গুরু বলে— তাদের গুরুতর দণ্ড দিতে কার্পণ্য করেননি। এ এক রকম গ্রাম্যতা। গ্রামের মানুষ গ্রামান্তরের মানুষকে কিছুতেই বড় বলে স্বীকার করবে না। রবীন্দ্রনাথে এ দোষ কম, তবে আছে। একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি।

'পাঠসঞ্চয়' একখানি পাঠ্যপুস্তক, গল্প প্রবন্ধের সমষ্টি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের। "বিখ্যাত পর্য্যটক ষ্টানলি সাহেব মধ্য আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত যে সকল গল্প প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।" এই ভূমিকাটুকু ক'রে লেখক বলছেন যে মধ্য আফ্রিকাবাসীদের ধারণা এই, এক ভেকদম্পতি থেকে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টি হয়েছে। উত্তম। এবারে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন—"মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোলুশ্যন থিওরি যে বহু পূর্ব্বে আফ্রিকা-দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ; কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনো তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্প চূর্ণ করে।" এ কি রবীন্দ্রনাথের উক্তি? তবে যারা সংস্কৃত কাব্যে পুষ্পক রথের বর্ণনা পড়ে প্রাচীন ভারতে এরোপ্লেন ছিল বলে গর্ব্ব করে তাদের দোষ কি? ডারুয়িনের জাতির রাজশাসনের তিক্ততা ক্ষণকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত উদার মনের উপরে গ্রাম্যতা দোষের ছায়া নিক্ষেপ করেছে। তবে সৌভাগ্য-বশতঃ এই রকম এক-আধটা উদাহরণ ছাড়া এ দোষ রবীন্দ্রসাহিত্যে একান্ত বিরল। এক-আধবার'এ রকম দোষ না হওয়াই অস্বাভাবিক। পরাধীন জাতি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, আয়ার্ল্যাণ্ড ও বাংলা দেশ করেছে, কিন্তু সে সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জিত হয় কি না সন্দেহ।*

এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারা গেল যে বিশুদ্ধ প্রবন্ধকারের মন, মেজাজ ও কলম রবীন্দ্রনাথের নয়। সাংবাদিকতার অভ্যাস সত্ত্বেও তাঁর কলম রস-সাহিত্যের রীতি পরিত্যাগ করে নাই। সেই জন্য তাঁর গদ্যরীতির

*পাঠসঞ্চয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণে এই মন্তব্যটি বাদ দেওয়ায় আমাদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

নির্জ্জলা মূর্ত্তি দেখবার জন্যে বিশেষভাবে প্রবন্ধসাহিত্যে প্রবেশের আবশ্যক নাই। প্রবন্ধ ও রস-সাহিত্যে তাঁর সমান স্বভাব।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অলঙ্কারের বিশেষ স্থান। 'অলঙ্করণ' শব্দটির মধ্যে একটি নিষেধাত্মক সতর্ক-বাণী আছে মনে হয়—প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যেন বলেছেন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। কি বর্ণালঙ্কারে, কি স্বর্ণালঙ্কারে। বঙ্কিমচন্দ্রও ভাষান্তরে ঐ কথাই বলেছেন—"অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না।" এ নিঃসন্দেহ সতর্কবাণী। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে এ-সব সতর্ক বাণী চলবে না। অধ্যাপক সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখেছেন—"উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের মৌলিকতায় ও অর্থালঙ্কারের ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ সকল কবিকে হার মানাইয়াছেন, কালিদাস-বাণভট্টকেও। ইংরেজি হইতে নেওয়া অলঙ্কারবস্তুও রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতায় অপরূপভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে।"* এখন এ দুই প্রায় পরস্পরবিরোধী উক্তি কি ভাবে সমন্বিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে? আবার অধ্যাপক সুকুমার সেনের শরণাপন্ন হতে হল। "রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার অলঙ্কৃতি বিভূষণভার নয়। তাহা স্বাভাবিক ও সহজাত সৌন্দর্য্য।"† আমরা এই ভাবটিকেই আগে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ও অনুভূতির medium বা বাহন অলঙ্কার। প্রবন্ধকারের পক্ষে যেখানে নির্গুণ চিন্তা অত্যাবশ্যক রবীন্দ্রনাথ সেখানেও অলঙ্কারের বাহন প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কল্পনার স্ফটিকে বিচ্ছুরিত হয়ে নির্গুণ চিন্তা বিচিত্র অলঙ্কার রূপে প্রকাশ পায়। খুব সম্ভব নির্গুণ চিন্তার শুভ্র কিরণের মধ্যেই সমস্ত অলঙ্কার আত্ম-গোপন ক'রে থাকে—তেমন তেমন কল্পনার স্ফটিকের সাহায্য পেলে শুভ্র এক বিচিত্র বহু রূপে প্রতীয়মান হয়। খুব সম্ভব এই কথাটিই অধ্যাপক সুকুমার সেন বোঝাতে চেয়েছেন—রবীন্দ্রসাহিত্যে অলঙ্কার বিভূষণ নয়। কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো একেবারে অঙ্গীভূত। এই ভাবটিকেই

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, তৃতীয় সং, পৃঃ ১৬১।

† তদেব, পৃঃ ১৭৪।

রূপান্তরে বলা যেতে পারে। আদিম সমুদ্রমন্থনের শেষে নিরাবরণ নিরাভরণ উর্ব্বশী যখন প্রথম আবির্ভূত হ'ল বিস্মিত দর্শকের চোখে নিশ্চয় তাকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা বলে মনে হয়েছিল। অলঙ্কার নয় দেহের স্বাভাবিক সহজাত সৌন্দর্য্য। রবীন্দ্রসাহিত্যলক্ষ্মীর অলঙ্কারগুলিও সেই রকম;—অপসরণযোগ্য ও বাহির থেকে আরোপিত কিছু নয়, দেহীর অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র; মুক্তাবিন্দুতে কম্পমান তরল জ্যোতির ন্যায় এ বস্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের লাবণ্য। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সমধিক প্রযোজ্য। এই অনির্ব্বচনীয় ভাবটিই কখনো ঘনীভূত হয়ে অলঙ্কারবিশেষ রূপে প্রকাশিত, কখনো বা অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থায় স্মিত কৌতুক রূপে উচ্ছলিত, আর, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মনোজ্ঞতা রূপে সঞ্চারিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনায় নামলে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে স্মরণ করে রাখতে হবে। মহাসমুদ্রে জল কোথাও তরল কোথাও ঘনীভূত তুষার, তবু বস্তুতঃ দুই এক। রবীন্দ্রসাহিত্যে অলঙ্কার কোথাও প্রচ্ছন্ন কোথাও প্রকট, বস্তুতঃ দুই এক, সে বস্তুর নাম লাবণ্য বা মনোজ্ঞতা বা স্মিতরসজাত প্রসন্নতা। রস-সাহিত্যে অলঙ্কারের ক্ষেত্র প্রশস্ত, জ্ঞানাত্মক সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় এ নিয়ম অচল। রসাত্মক, জ্ঞানাত্মক, এমনকি নিতান্ত কর্ম্মাত্মক রচনাতেও, যেমন অনেক প্রয়োজনীয় চিঠি ও অনুজ্ঞাপত্রে, অলঙ্কারের ব্যবহার সমান প্রবল। এখানে বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করবো। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। রচনাটি রসাত্মক নয়, এমন কি পুরাপুরি জ্ঞানাত্মকও নয়, কর্ম্মাত্মক বললেই এর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। দেশের একটি রাজনৈতিক সঙ্কটকালে অবরুদ্ধকণ্ঠ দেশবাসীর মুখে ভাষা ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় সমাজের সম্মুখে পথের নির্দ্দেশ দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই এটি লিখিত। সভ্যতার সঙ্কটের মতো এটিও একাধারে বাণী ও নির্দ্দেশ। এ শ্রেণীর রচনা যথোচিত সরল হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় কেননা আদেশ বা নির্দ্দেশের উপরে ভাষ্যের আবশ্যক হলে তার শক্তির অপহ্নব ঘটে। কিন্তু কবি এ চিরাচরিত নীতি মানেননি, স্বাচরিত রীতি অবলম্বন ক'রে প্রবন্ধটি লিখেছেন। প্রবন্ধটির প্রথম এগারটি বাক্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়—তিনটি মাত্র ছোট ছোট বাক্য বাদে আর আটটি বাক্যই অলঙ্কার।

শুধু তাই নয় তৃতীয় বাক্যটির ছয়টি অংশ, সেই ছয়টি আবার ছয়টি অলঙ্কার। নিরলঙ্কার বাক্য তিনটি আকারে ছোট, উদ্ধার করা সহজ তাই তাদের সশরীরে এখানে হাজির করছি।

"ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইয়া গেল।" ২য় বাক্য। "ছেলাবেলা হইতে কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়।" ৬ষ্ঠ বাক্য। "যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না"। ৭ম বাক্য। "আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্য করিয়াছি।" ৮ম বাক্য। এদের মধ্যে ২য় বাক্যটিকে চেপে ধরলে অলঙ্কারের আভাস পাওয়া যাবে—কেননা ওর মধ্যে ঝাপসাভাবে নদী বা সমুদ্র অতিক্রমের ভাবটা রয়ে গিয়েছে।

এবারে আর দুইজন বিখ্যাত লেখকের, বঙ্কিমচন্দ্রের ও ভূদেবের, প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক কি ফল পাওয়া যায়।

ভূদেবের 'সামাজিক প্রকৃতি, উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ' নামে প্রবন্ধটি লওয়া যাক।* প্রবন্ধটির প্রথম এগারটি বাক্যের মধ্যে একটিও অলঙ্কার নাই, তবে ৯ম বাক্যের 'মৃত্যুগ্রাস'কে অলঙ্কার বলা চলে। প্রবন্ধের বিষয়টি দুরূহ, অলঙ্কার প্রয়োগে বোধের সৌকর্য্য হতে পারতো কিন্তু ভূদেব সে লোভ সম্বরণ করেছেন। (প্রবন্ধের নামটিই যে উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ)।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধের নাম 'মহাভারতের ঐতিহাসিকতা',† কৃষ্ণচরিত্রের অংশ। প্রথম এগারটি বাক্যের মধ্যে একটিও অলঙ্কার নাই। এখানেও বিষয় দুরূহ, অলঙ্কার যোগে দুরূহ বিষয়কে সুহ করবার রীতি সুপ্রচলিত। সে লোভ বঙ্কিম পরিত্যাগ করেছেন। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেক সহজ, কিন্তু তিনি অলঙ্কার ছাড়া পদচালনা করেননি। কেন এমন হল? যদি বলো যে লেখকের ধাত বা স্বভাব তবে সংক্ষেপে সব মিটে যায়, ব্যাখ্যা করবার কিছু থাকে না। আমাদের বিশ্বাস ব্যাখ্যার আবশ্যক আছে। তার আগে একটা কথা সেরে নি। আলঙ্কারিক রীতি রবীন্দ্রনাথের কিছু ক্ষতি করেছে, প্রসঙ্গতঃ দেশের লোকেরও। তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাময়িক প্রবন্ধগুলির যে প্রভাব হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, লেখকের মন ও শ্রোতার মনের মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়েছে অলঙ্কারগুলি। নির্দ্দেশ ও

* পদাঙ্ক : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

† পদাঙ্ক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রেরণা প্রাঞ্জল, ঋজু ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন—নতুবা তার শক্তি পুরা কাজ আদায় করতে পারে না, এ ক্ষেত্রে পারেনি। নেপোলিয়ানের রণাঙ্গনে প্রদত্ত হুকুম যদি ভিক্টর হুগোর ছাঁদে লিখিত হতো তবে আর অষ্টারলিজের যুদ্ধ জয় করতে হতো না। রবীন্দ্রনাথের বাণী ও নির্দ্দেশবাহী প্রবন্ধের সঙ্গে গান্ধীজি ও স্বামীজির প্রবন্ধের তুলনা করলেই প্রভেদটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ওঁদের ভাষা কর্ম্মীর হাতে হাতিয়ার, রবীন্দ্রনাথের ভাষা কবির হাতে ইন্দ্রধনু। প্রয়োজনের সীমানাকে অতিক্রম ক'রে বিস্তারিত তার সৌন্দর্য্য। বিশেষ সময়ের বিচারে তার ন্যূনতা যদি স্বীকৃত হয় তবু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে সময়কে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে তার রসরূপ—যেখানে সে সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সূত্রাকারে স্পষ্টাক্ষরে সাহিত্যের রীতি ও নীতিগত আদর্শ ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তেমন না করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রসাত্মক বাক্য রচনাকেই তিনি কাব্যের তথা সাহিত্যের আদর্শ বলে মনে করেন। শেষ জীবনের একটি রচনায় ওরই বিস্তারসাধন ক'রে বলেছেন যে "সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হ'লেই তাকে বলে সাহিত্য।"* "সত্য" বলতে Truth ও Fact দুই-ই বোঝায়—তত্ত্ব ও তথ্য। এই Fact বা তথ্য হচ্ছে জ্ঞানাত্মক ও কর্ম্মাত্মক প্রবন্ধের উপাদান। এখন Fact বা তথ্যকে রসাত্মক ক'রে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধাত্মক রচনায় তাঁর কবির কলম অত্যন্ত বেশি সচেতন হ'য়ে উঠে প্রত্যেকটি রন্ধ্র, প্রত্যেকটি ফাঁক রসে পূর্ণ করে দিয়েছে—যাকে বলে "every rift with ore"! এই রসসৃষ্টির প্রকাশ বিচিত্র অলঙ্কারে। এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে অলঙ্কার প্রয়োগে বাধা নাই, বাক্যকে রসাত্মক ক'রে তোলাও আবশ্যক—কিন্তু একটা সীমা পর্য্যন্ত। তথ্য দিয়ে যেখানে পাঠককে স্বমতে আনতে হবে, পাঠকের মনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি করতে হবে, সেখানে দেখতে হবে যেন রসের ভারে তথ্যের বিকার না ঘটে। বিয়ে বাড়ীতে উৎসবের দিনে বাড়ীর চাকর-বাকরগুলোও একটু ভালো পোষাক পরে—কিন্তু সে পোষাক এমন হয় না যাতে বরের পোষাককে ছাপিয়ে যায়। যে রচনায় বিষয়ের মুখ্যতা, সেখানে গৌণ যদি পোষাকের জৌলুষে মুখ্যকে ছাপিয়ে ওঠে তবে তাকে একটি গুরুতর ত্রুটি মনে করতে হবে। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের সামাজিক রাজনৈতিক ও

* বাঁশরি, ১ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক।

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে অনেক জায়গায় এই ত্রুটি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও সত্যাত্মক বাক্যকে রসাত্মক করে তুলেছেন—কিন্তু সর্ব্বদাই দৃষ্টি রেখেছেন যাতে পোষাকের জৌলুষে মুখ্য গৌণে এক না হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সমজাতীয় প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লেই আমাদের বক্তব্য, আশা করি, বুঝতে পারা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক ও রবীন্দ্রনাথের রায়তের কথা, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা শাসনের ফল ও রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রী-অভিষেক এ বিষয়ে তুলনার ক্ষেত্র। সব ক'টি রচনাতেই সত্যকে রসরূপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে রস "সত্য"কে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলেছে বলে মনে হয় না। ইচ্ছা ক'রেই রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনা মন্ত্রী-অভিষেকের উল্লেখ করলাম, মনে রাখতে হবে যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সত্যের রসাত্মকতা আরো বেড়েছে। এমন যে হয়েছে তার প্রধান কারণ লেখকের প্রতিভার বিশেষ ধর্ম্ম, আবার সেই সঙ্গে কালের ধর্ম্মও আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতির প্রভাবে বাংলা-সাহিত্যে যে Moral Force সঞ্চারিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে তাতে Aesthetic শক্তির আতিশয্য ঘটে। তাঁর শেষ জীবনের রচনায় এই প্রভেদ অতিশয় প্রোচ্চারিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বঙ্গসাহিত্যের অধি-দেবতার সিংহাসনে ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি, রবীন্দ্রনাথের যুগে সেখানে আসীন হলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। কিন্তু সে যুগও অবসিত হতে চলল—এখন সেখানে উপবিষ্ট হতে চলেছেন বুধ—ধর্ম্মে যিনি বৈশ্য।

এতক্ষণ যা বোঝাতে চেষ্টা করছি তার মর্ম্ম—রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির কলমের গদ্য, তার ধর্ম্ম কাব্যধর্ম্ম। যাঁর মধ্যে সুপ্রচুর কবিত্ব গুণ নাই, তিনি কখনো এ গদ্য লিখতে পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রস-সাহিত্যে যে রোমান্টিক গদ্যের আবির্ভাব দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনায় তারই পূর্ণ বিকাশ। কেবল যুক্তি নয়, তত্ত্ব নয়, তথ্য নয়, সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রকাশের আনন্দ, কোন কিছু জানাবার জন্যে তেমন নয়—"শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে", একটি আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দময় বেদনায় স্ফীত ধমনীর মতো জীবনরসে চঞ্চল এই গদ্য। বস্তুতঃ অনেক সময়েই এ গদ্য পদ্যের মাঝখানে দু-এক ধাপের মাত্র ব্যবধান। গদ্যে ও পদ্যে রোমান্টিক ধর্ম্মকে রবীন্দ্রনাথ সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাই এখন ইতস্ততঃ পথান্তর সন্ধানের আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের স্বাধর্ম্য প্রমাণ করতে গবেষণার প্রয়োজন হয় না, স্থূল দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে। নিম্নলিখিত অংশে রবীন্দ্রনাথের বিশেষণ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য তথা তাঁর কবিধর্ম্ম খুব স্পষ্ট।

"বাংলাদেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্ত্তী গাছপালার মধ্যে সূর্য্যাস্ত—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা। আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্ত্তী আকাশের সঙ্গে কী একটি স্নেহভারবিনত মৌনম্লানমিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহ-বিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ ক'রে দেয়, সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তা হলে কী একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত বেজে ওঠে।"*

এ কাব্যের বস্তু, লীলাচ্ছলে গদ্যের পোষাক পরেছে, আগে যাকে বলেছি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পুরুষবেশ ধারণ। কিন্তু হলে কি হয়, অঙ্গদ ও কবচকুণ্ডলেও দেহের কাঞ্চী কেয়ূর ও স্বর্ণবলয়ের চিহ্নগুলো চাপা দিতে পারে-নি। বিশেষণ প্রয়োগের রীতিটি লক্ষণীয়। "বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা।" বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণার মধ্যে, "চিরবিরহবিষাদের" মধ্যে যে ঈষদুচ্চারিত অনুপ্রাস তাতে কেবলই কি বস্তুর গুণ প্রকাশ হচ্ছে—কবির চলতে পারার, "নামের নেশার" আনন্দ কি প্রকাশিত হচ্ছে না? "গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত!" সুকুমার শব্দ সমাবেশে যে সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গীতে কবিরও স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে যেমন পাচ্ছে নক্ষত্রলোকের স্বরূপ। বিশেষণের পরে বিশেষণ চাপিয়েও কবির তৃপ্তি নাই, কি জানি যদি কোন অনুল্লিখিত থাকে। রোমান্টিক কাব্যে কবির প্রকাশের আনন্দ ছাড়িয়ে যায় বস্তুকে, এখানেও সেই একই লক্ষণ। এ কি ছদ্মবেশী কবিতা নয়? কিণাঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে স্বর্ণালঙ্কারের দাগগুলি সহজেই চোখে পড়ে। আরও গোটাদুই উদাহরণ দেখা যাক।

---

* ছিন্নপত্র, ১৩৩৫ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭।

"এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠ্‌তো, শরতের আলো পড়তো, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্ব্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকতো তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্য সনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে।" *

দ্বিতীয় উদাহরণটি পদাঙ্কে উদ্ধৃত হয়েছে। † সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত বসুন্ধরা কবিতাটি একবার পড়লেই উল্লিখিত গদ্যের সঙ্গে পদ্যের রক্তসম্বন্ধ বুঝতে পারা যাবে—এ যেন যমজ ভাইবোন, যা কিছু প্রভেদ তা কাপড়ের ও অলঙ্কারের।

গোড়ায় আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যকে বয়স অনুসারে তিন পর্ব্বে ভাগ ক'রে নিয়েছি, এখন আবার সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা যেতে পারে। আমরা বলেছিলাম যে তাঁর প্রথম জীবনের গদ্যে বঙ্কিমের প্রভাব সুপ্রচুর যদিচ সেই প্রভাবের সমান্তরালভাবেই দেখা দিয়েছে কবির স্বকীয়তা। আরো বলেছিলাম যে বঙ্কিমপ্রভাবিত গদ্যের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে হ্রস্বক্রিয়াপদের বা কথ্য ভাষার রীতি, তাতে বঙ্কিমের প্রভাব নাই বললেই হয়। এখন, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা যে কয়টি গুণকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেয়েছে তন্মধ্যে এই কবিত্বগুণটি প্রধান। এই কবিত্বগুণ আবার রচনার বস্তু ও বাচন দুয়েতেই। এই শ্রেণীর রচনার কথা বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতেই পারতেন না। মধ্য পর্ব্বের গদ্যরচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, শুধু একটা বিষয়ের

* ছিন্নপত্র, ১৩৩৫ সং, পৃঃ ১৬৩ ১৬৪

† ঐ ঐ পৃঃ ১৭০।

উল্লেখ করা হয়নি। বাংলা গদ্য রচনার সুরু থেকেই স্বতোবিরুদ্ধের মধ্যে মিলনের চেষ্টা চলেছে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এ প্রচেষ্টা অনেকদূর অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবণতাকে আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। চতুরঙ্গে এর দৃষ্টান্ত মিলবে। অধ্যাপক সুকুমার সেন চতুরঙ্গের ভাষারীতি সম্বন্ধে লিখেছেন—"সাধুভাষায় লেখা হইলেও চতুরঙ্গ-এর রচনারীতি কথ্য-ভাষার। সর্ব্বনাম পদগুলির রূপ প্রায়ই সবই কথ্যভাষার, বাক্য ছোট ছোট।"*

অধ্যাপক সেনের মন্তব্য অযথার্থ নয়। হ্রস্ব ক্রিয়াপদের বা কথ্যভাষার সঙ্গেই হ্রস্ব সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আরও একটু এগিয়ে যেতে চান বলেই খুব সম্ভব হ্রস্ব সর্ব্বনামকে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের বা সাধুভাষার মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের রীতিতে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে চতুরঙ্গকে সর্ব্বশেষ বলা যেতে পারে।† বোধ করি এ পথে আর অধিকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় বলেই অতঃপর তাঁকে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ভাষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এবারে আরম্ভ হল তাঁর গদ্যরচনার শেষ পর্ব্ব।

রবীন্দ্রগদ্যের তৃতীয় বা শেষ পর্ব্বে নানা রীতির গদ্যরচনা আছে। রীতি নানারকম হলেও তার সাধারণতম লক্ষণ হচ্ছে হ্রস্ব ক্রিয়াপদ। আগে বলেছি যে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা গদ্যের একটি প্রধান সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ থেকে সঙ্গীত আদায় ক'রে নিয়েছেন—যার প্রতিধ্বনি পরিণত রবীন্দ্রগদ্যেও শুনতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের তোড়ে ক্রিয়াপদ অনেক জায়গায় লোপ পেয়ে গিয়েছে—তাতেও এক রকম সঙ্গীত বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী প্রভৃতিতে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ হ্রস্বাকারে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় স্থানচ্যুত হয়ে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের স্থষ্টি করে রসের স্থষ্টি করেছে। এখন, তৃতীয় পর্ব্বে গদ্যের যে নানা মূর্ত্তি দেখা গেল তারও একটি প্রধান কারণ হ্রস্ব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-কৌশল। গদ্যকবিতা নামে পরিচিত রচনার মূলেও এই কারণটি বিদ্যমান। কবির শেষ জীবনের এটি একটি প্রধান স্থষ্টি। কিন্তু প্রশ্ন এই—এ কোন্ পর্য্যায়ে পড়বে, গদ্যে না পদ্যে? কবি একে গদ্যছন্দ বলেছেন, গদ্যকবিতা

* বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সং, পৃঃ ২০২।

† এর পরেও সামান্য কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

বলেছেন, রচনাবলীতে কাব্য ও কবিতা পর্য্যায়ে এ ছাপা হয়েছে, পাঠকসাধারণেও একে কবিতা, কবিতার এক বিশেষ পর্য্যায় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তবু সকলে নিঃসন্দেহ হয়েছে মনে হয় না, আমার নিজের সন্দেহ দূর হয়নি—এ গদ্য না পদ্য!

কবি বলেছেন যে এই শ্রেণীর রচনার পূর্ব্বসূত্র 'লিপিকা'র রচনাগুলি, কিন্তু তখনো পূর্ব্বসংস্কারের ভীরুতা থাকায় সে-সব টানাভাবে সাজিয়ে অনুচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, ছন্দানুগভাবে সাজিয়ে শ্লোক সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গদ্যকবিতায় সেই ত্রুটির সংশোধন হয়েছে। কবির কথা শিরোধার্য্য করেও ভেবে পাইনে কেন এসব রচনাকে পদ্য বলে গ্রহণ করব, কেন এদের গদ্যের নূতন রীতি বলে গ্রহণ করবো না। যদি বলা যায় যে এদের ধর্ম্ম কাব্যের, তবে তার উত্তর—রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ধর্ম্মই কাব্যের, রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য কাব্যধর্ম্মী। যদি বলা যায় যে, কাব্য যে বিশেষ রসোদ্বোধনের দাবী রাখে এদের তা আছে, তবে তার উত্তর রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্য রচনাই সে দাবী করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত ও কাব্যে উপেক্ষিতার উল্লেখ করা চলে, বিচিত্র প্রবন্ধের মাভৈঃ কেকাধ্বনি প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে,—যদিচ এসব রচনার ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ। আবার যদি বলা যায় যে এইসব গদ্যকবিতায় এমন সব বস্তু বা অনুভূতি বা তত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে যা গদ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ যুক্তিও টিকবে মনে হয় না। ছিন্নপত্রের অনেক পত্রে এমন সব বস্তু বা অনুভূতি বা তত্ত্ব আছে—যে-সব প্রকাশের নিমিত্ত নূতন বাহনের প্রয়োজন হয়নি। এর পরেও যদি বলা হয় যে এইসব রচনায় একটি ছন্দ আছে, তবে তদুত্তরে বলতে পারা যায় যে সুষ্ঠু গদ্য মাত্রেই ছন্দ বর্ত্তমান। আমার বিশ্বাস সকলে কবির কথা আপ্তবাক্য রূপে স্বীকার করে নিয়েছে, কেউ ধীরভাবে বিচার করেনি। এসব রচনা ছন্দানুগ শ্লোকরূপে সজ্জিত না হয়ে টানা লাইনে অনুচ্ছেদরূপে সজ্জিত হলে ইঙ্গিত সত্ত্বেও এগুলি গদ্য বলেই গৃহীত হতো, কবির ঘোষণা সত্ত্বেও লিপিকা গদ্যরচনা বলেই পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তিনি জানেন যে ছন্দের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য তাদের প্রধান গুণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে যথাসাধ্য রাশ টেনে এদের সংযত করে রেখেছেন, তৃতীয় পর্ব্বে রাশ দিয়েছেন আলগা ক'রে। আর ঐসব গুণ কবির প্রশ্রয়ে

প্রোচ্চারিত হয়ে উঠে এই রীতিটির সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত অনেক রকম গদ্যরীতির মধ্যে 'গদ্য কবিতা' একটি রীতি। ওর শ্লোকসজ্জাই পাঠকের চোখকে বিভ্রান্ত করেছে। শ্লোকসজ্জার মধ্যে ওর অনধিকার প্রবেশ, টানাভাবে সজ্জিত অনুচ্ছেদই ওর স্বাভাবিক আশ্রয়। এখানে সেইভাবে সাজিয়ে দেখাতে চেষ্টা করবো যে সজ্জান্তরে রসের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

'পুনশ্চ' গদ্যকাব্যের অন্তর্গত কোপাই কবিতাটিকে গ্রহণ করা যাক। প্রথমে কবিকর্তৃক শ্লোকবন্ধে সজ্জিত রূপ।

"পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেন না নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশ বন, আম বন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ,
পুকুরের ধারে শর্ষে ক্ষেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউ গাছে দিনরাত মর্ম্মর ধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল ধরা ক্ষেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্ম্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।"

এবারে শ্লোকটি সজ্জিত হচ্ছে অনুচ্ছেদাকারে।

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়, মনে মনে দেখি তাকে। এক পারে বালুর চর, নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—অন্য পারে বাঁশ বন, আম বন, পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে, অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ—পুকুরের ধারে শর্ষে ক্ষেত, পথের ধারে বেতের জঙ্গল, দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত, তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউ গাছের দিনরাত মর্ম্মর ধ্বনি। ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া, ফাটল-ধরা ক্ষেতে ওদের ছাগল চরে, হাটের কাছে টিনের-ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ—সমস্ত গ্রাম নির্ম্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।

অনুচ্ছেদ সজ্জায় এর রসের হানি হয়েছে বলে তো মনে হয় না। পদ্যের পোষাক পরে এলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ বৃহন্নলা, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন। বর্ত্তমানে বৃহন্নলা বলেই এর পা দু-খানিতে নৃত্য কিছু প্রকট, কণ্ঠে সঙ্গীত কিছু প্রোচ্চারিত। কিন্তু পৌরুষ তো এত সহজে ঢাকা পড়ে না—শ্লোকসজ্জার তৃতীয় ছত্রের 'কেননা' শব্দটিতে ওর মণিবন্ধের কিণাঙ্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। "নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত"। এ যে যুক্তির পদক্ষেপ, একান্ত ব্যক্ত, পদ্যের যুক্তির মতো আদৌ প্রচ্ছন্ন নয়। বিষয়টা ছিন্নপত্রের যে-কোন চিঠির—বাচনে কিছু প্রভেদ ঘটেছে নিঃসন্দেহ—কিন্তু তাতে করে পদ্যের জগতে পৌঁছয়নি, গদ্য জগতের প্রান্তেই নূতন ভিটে বেঁধেছে।

ঐ পুনশ্চ কাব্য থেকেই আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রচনাটির নাম—নাটক। প্রথমে শ্লোকবন্ধ।

"নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি।
অর্জ্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্ব্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জ্জুন বললেন, 'দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।' "

এবারে অনুচ্ছেদ করে সজ্জিত।

নাটক লিখেছি একটি। বিষয়টা কী বলি।

অর্জ্জুন গিয়েছেন স্বর্গে, ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে। উর্ব্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে তাকে বরণ করবেন ব'লে। অর্জ্জুন বললেন, 'দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী, অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা, অনিন্দিত তোমার মাধুরী, প্রণতি করি তোমাকে। তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।'

অনুচ্ছেদরূপে সজ্জিত অংশের রসোদ্বোধনে ক্ষমতা কি কম? আমার চোখে তো কোন ন্যূনতা ধরা পড়ে না। কেউ কেউ বলতে পারেন পাঠকের চোখ

ও কণ্ঠকে যথাযথভাবে চালিত করবার উদ্দেশ্যেই শ্লোকবন্ধের সৃষ্টি। এ যুক্তিটাও কমজোরি। এক সময়ে ছিল বটে, বিদ্যাসাগরের ও মধুসূদনের সময়ে, যখন পাঠককে নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক বেশি কমা, সেমিকোলন প্রয়োগ করতে হতো। কিন্তু এখন একশ বছরে পাঠক তৈরি হয়ে উঠেছে, বিশেষ রবীন্দ্রনাথের নিত্যনূতন রীতির সঙ্গে তাল রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালী পাঠকের রুচি ও রসগ্রহণ ক্ষমতা বেশ স্থিতিস্থাপক হয়ে উঠেছে। এখন আর শ্লোকসজ্জার সোপানশ্রেণী তৈরি ক'রে তাকে রসের স্বর্গের পথের সন্ধানদান অনাবশ্যক। তা ছাড়া কোন্ পাঠক কখন্ ভুল ক'রে বসবে, সেইদিকে চোখ রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তো আর কাজ চলে না। মূঢ়তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো নিরর্থক আর কি হতে পারে।

কবি মনে করেন যে গদ্যকবিতার মস্ত একটা সুবিধা এই যে তাতে আলঙ্কারিক অংশ হাল্কা, তাই সে বেশ জোরে পা ফেলে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। ঘর ও ঘোমটায় আবিষ্ট বঙ্গরমণী যেমন বিহারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গিয়ে ঘোমটা ঘুচিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। তিনি বলছেন—"কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্কা হ'য়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু-নীচু বিচিত্র জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।"*

গদ্যের ক্ষেত্রে এসে কাব্যের অলঙ্কার ঝরে গিয়েছে বা কমে গিয়েছে এ কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। গদ্যকবিতাগুলো পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে যে অলঙ্কারের বৈচিত্র্যেই এর প্রধান ঐশ্বর্য্য। এ প্রসঙ্গে তুলনীয় 'সোনার তরী' কাব্যের বসুন্ধরা ও 'পত্রপুট' কাব্যের পৃথিবী। বসুন্ধরায় অলঙ্কার আছে অনেক কিন্তু পৃথিবী কবিতাটিতে অলঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নাই বললে অন্যায় হয় না। পৃথিবী কবিতাটির অলঙ্কারের চমক বাদ দিলে যা থাকে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

* গ্রন্থপরিচয়, পুনশ্চ।

আর এক জোড়া প্রাসঙ্গিক কবিতা নেওয়া যাক। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের বন্দীবীর ও 'শেষ সপ্তকে'র তেত্রিশ সংখ্যক কবিতাটি—যার গল্পাংশ ঐ একই। বন্দীবীর পদ্যছন্দে লিখিত ও অলঙ্কার-বহুল, পরবর্ত্তী কবিতাটি অলঙ্কারবিরল আর গদ্যছন্দে লিখিত। অনেকেই শেষের রচনাটিকে শ্রেষ্ঠতর মনে করবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কি অলঙ্কারবিরল গদ্যছন্দের খাতিরে? গদ্যছন্দে বালকবীরের আত্মবলিদান অধিকতর মহিমময়, গল্পের পরিবেশ অধিকতর বাস্তবসম্মত অর্থাৎ গল্পাংশেই এর শ্রেষ্ঠতা। পদ্যছন্দ বা গদ্যছন্দের সঙ্গে শ্রেষ্ঠতার কোন সম্পর্ক নাই। শুধু এ কবিতাটি নয়—রবীন্দ্রনাথের যে গদ্যকবিতাগুলি জনপ্রিয় সেগুলি হয় গল্প নয় গল্পের আভাস যুক্ত, ছন্দের উপরে তাদের জনপ্রিয়তার নির্ভর নয়। ভাষার কাঠামো বা ভাষারীতির বিচার যেখানে চলছে সেখানে অবান্তর বিষয় এনে ফেলে বিচারে বিভ্রম ঘটাই স্বাভাবিক, তাই গল্পের আকর্ষণ, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়ে নিছক রীতিটার বিচার আবশ্যক। সে বিচারে, আমাদের মতে, গদ্যকবিতা বলে পরিচিত এই রচনাগুলি কাব্যগুণে ও কাব্যধর্ম্মে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ গদ্য ছাড়া কিছুই নয়। আরো বক্তব্য এই যে শ্লোকবন্ধে সজ্জিত না হয়ে অনুচ্ছেদাকারে সজ্জিত হলে এদের রসহানি ঘটতো এমন মনে করবার কারণ নেই।

এবারে গদ্যছন্দে লিখিত ও সরাসরি গদ্যে লিখিত কয়েকটি অংশ মিলিয়ে দেখা যাক রসের তারতম্য ঘটেছে কি না।

'ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়ায় খোলা জানালার কাছে। বাইরে, একটা তাল গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর; জামের ডালে ব'সে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে, কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল ঝিলমিল করছে; আমার জানালার কাছ পর্য্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা; নদীতে নেমেছে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো; তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ।" *

* গ্রন্থ পরিচয়, পুনশ্চ।

এবারে এর গদ্য কাব্য রূপ—

"ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তাল গাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারই চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে চলা পথ
রাঙামাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধূলোয়;
বাতাবি নেবু ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেশারেশি,
সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়,
চামেলিলতা লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
নদীতে নেমেছে ছোট একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারই এক পাশে অনেক কালের চাঁপা গাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।"*

দুটি অংশই অলঙ্কারবিরল—তবু অলঙ্কার বা অলঙ্কারের আভাস কিছু অধিক গদ্যছন্দে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। গদ্যছন্দের যে-সব কবিতায় গল্প বলা হয়েছে বা গল্পের আভাস দেওয়া হয়েছে তাতে অলঙ্কার অপেক্ষাকৃত অল্প—কিন্তু অন্যসব কবিতায় অলঙ্কারটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর রচনাকে পদ্য বলে চালাতে গিয়ে তার মৌলিক ত্রুটি ঢাকবার উদ্দেশ্যে

* পুনশ্চ।

প্রয়োজনাতিরিক্ত অলঙ্কার আমদানী করতে হয়েছে। অলঙ্কারবিরলতা এদের স্বাধীনতা দিয়েছে একথা সর্ব্বথা গ্রাহ্য নয়, যেখানে চালচলনের স্বাধীনতা সত্যই আছে সেখানে তার কারণ গল্পের গতি। গল্পের অশ্ব যেখানে টান দিয়েছে সেখানে অনাবশ্যক অলঙ্কারগুলো আপনি ঝরে পড়ে গিয়েছে।

গদ্যকবিতাকে টানা লাইনে সাজিয়ে দেখেছি যে তাতে রসহানি বা মর্য্যাদাহানি ঘটে না এদের। এবারে আর এক ভাবে ঐ কথাটাই প্রমাণ করা যেতে পারে—তাতেও এদের মৌলিক গদ্যত্বই ধরা পড়বে।

'শেষের কবিতা' থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি।

"এমন সময়ে আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘন ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘন বর্ষণে গিরি নির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্য চেরাপুঞ্জির ডাক বাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।"

এখন এই ছত্রগুলির ছত্রভঙ্গ ঘটলেই কি রসের জোয়ার আসতো? রীতি তো রসকে বাড়িয়ে দেবার জন্যেই—যে রীতিতে রসবৃদ্ধি ঘটে না তা নিতান্তই নিরর্থক। এবারে 'ছেলেবেলা' থেকে।

"আমাদের ঐ বট গাছটাতে কোন কোন বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো ক'রে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষ কালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"

অনতিস্পষ্ট ছন্দকে অনুসরণ ক'রে একে শ্লোকসজ্জায় সাজানো অসম্ভব নয়—কিন্তু তাতে কি সুবিধাটা হবে জানি না। এবারে আর একটা অংশ 'তিন সঙ্গীর' অন্তর্গত শেষ কথা থেকে।

"পলাশ ফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শাল

গাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যবসাদাররা মৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফুল। ঝির ঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা।"

শ্লোকের প্রসাধন চাপালে এর আর এমন কি সৌন্দর্য্য বাড়বে? আসল কথা হচ্ছে ১৮০১ সালে যে গদ্যরীতির সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে তা একটা পরম পরিণতি লাভ করেছে—সম্মুখে আর এগোবার পথ ছিল না। লতা যখন লতিয়ে চলে মনে হয় বুঝি তার তরল গতি দিগন্তের সীমা পর্য্যন্ত চলবে, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এক জায়গায় এসে পুষ্পিত পরিণামে তাকে থামতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় গদ্যরীতিকেও থামতে হয়েছে। ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য তিনি অনেক বর্দ্ধিত করেছেন সত্য, ভাষার মধ্যে যে-সব সম্ভাবনা বীজাকারে ছিল তাদের ব্যক্ত ক'রে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু লেখকের প্রতিভা যতই মহনীয় হোক তারও সীমা আছে, ভাষার শক্তি যতই সম্ভাবনাপূর্ণ হোক তারও সীমা আছে—অন্ততঃ সাময়িক ভাবে। কথাটা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। তাঁর শেষ বয়সের বিচিত্র গদ্যরীতি (এবং পদ্যও) নিজেকে অতিক্রমের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি আলোচনার সময়ে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা রইলো। এবারে রবীন্দ্রগদ্যরীতি সম্বন্ধে ফলশ্রুতি উচ্চারণ করবার পালা।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গদ্য লাভ করেছিল দার্ঢ্য, যুক্তিনিষ্ঠা এবং লাবণ্য। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ ক'রে দিলেন নমনীয়তা, কমনীয়তা ও কাব্যশ্রী, যার ফলে অন্তর্লোকে ও বহির্বিশ্বে সঞ্চরণের ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে গেল ভাষার। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যদি হয় অর্জ্জুন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা বৃহন্নলা, দু'জনেই স্বরূপে এক, কেবল রূপে ভিন্ন। অর্জ্জুনে যে তেজ প্রকট, বৃহন্নলায় সেই তেজ প্রসাধনে প্রচ্ছন্ন। নৃত্যকলার সে আচার্য্য বটে কিন্তু প্রয়োজন হলেই সেই বেশটাকে ঘুচিয়ে দিতে দ্বিধা করে না, তখন বীণা ফেলে দিয়ে তার হস্ত ধারণ করে গাণ্ডীব আর মণিবলয়ভ্রষ্ট মণিবন্ধে বেরিয়ে পড়ে শতযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কিণাঙ্করেখা, বুঝতে পারা যায় সৌন্দর্য্যের ছদ্মবেশের তলে শৌর্য্যের বহ্নিশিখা তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অচপল আছে। এই হচ্ছে রবীন্দ্রগদ্যরীতির পরিণাম।

এবারে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বাংলা নাট্য সংলাপে গদ্যরীতি

সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নিতে চাই।* বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটকের ভাষা এখনো গ'ড়ে ওঠেনি, এখনো ট্রাজেডির ভাষার পরিণাম হয় অশ্রুপাতে যেমন গিরিশচন্দ্রে, নয় ধনুষ্টঙ্কারে যেমন দ্বিজেন্দ্রলালে, নয় তত্ত্বের কুজ্ঝটিকায় যেমন রবীন্দ্রনাথে অবসিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কমেডি বা প্রহসনের ভাষা স্বাস্থ্যে ও লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে গড়ে উঠেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে প্রহসনের ভাষা আজ বেশ পরিণত। মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাস্তবানুগ, বিষয়ানুগ ও চাতুর্য্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও কিছু অধিক। কলকাতাশ্রয়ী, মধ্যবিত্ত সমাজের ভাষাকে গিরিশ-চন্দ্রের চেয়ে আর কেউ বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছেন মনে হয় না। দীনবন্ধু ও মধুসূদন ধরে দিয়েছেন পাত্র-পাত্রীর মুখের যথার্থ কথাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক—নাটকে সেটা গুণ নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা হস্তক্ষেপ মাত্র ধনুকের টঙ্কার তুলতে থাকে—সে ধনুকও যুদ্ধের অস্ত্র নয়—ধুনকরের যন্ত্র। এমন ভাষারও যে এক সময়ে আদর হয়েছিল ভাবলে কালের রুচির বৈচিত্র্যে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাংলা সাহিত্যে নাটকের শাখাটাই সব চেয়ে দুর্ব্বল কাজেই তার গদ্যরীতির আলোচনাও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পগুরু। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আসরেও তাঁর আসন কম প্রশস্ত নয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রাপ্য সম্মান পেয়েছেন মনে হয় না—শিল্পখ্যাতির অন্তরালে তাঁর সাহিত্যকীর্ত্তি যেন চাপা পড়ে গিয়েছে—তাই কিছু বিস্তারিতভাবে তাঁর রচনার গদ্যভঙ্গির আলোচনা করলাম। †

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিলে যে কয়জন লেখক গদ্যরচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, গদ্যরচনাভঙ্গির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাঁদের আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের মনের ছাপ গদ্যভঙ্গির

---

* পদাঙ্ক: দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়—নিমচাঁদের স্বগতোক্তি। গিরিশচন্দ্র—জনা। অমৃতলাল বসু—কালাচাঁদের বাহাদুরি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—বিক্ষুব্ধহৃদয়, চাণক্য।

† পদাঙ্ক: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিলাদিত্য; বুদ্ধ মহিমা; লুকিবিদ্যে; পাখির প্রশ্ন; শিল্প ও ভাষা; সৌন্দর্য্যের সন্ধান; ঘরোয়া; ঘরোয়া; জোড়াসাঁকোর ধারে; জোড়াসাঁকোর ধারে; জোড়াসাঁকোর ধারে; জোড়াসাঁকোর ধারে; জোড়াসাঁকোর ধারে।

অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় আমার একটি পূর্ব্ব লিখিত রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছি।

উপরে যাঁরা এঁকে দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি আছে, কিন্তু তার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কারও প্রভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয় একক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিজস্ব গদ্যরীতি আছে; কিন্তু তাঁর রচনার কাঠামো বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের গদ্য। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গদ্যরীতি বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা না পেলে এঁদের গদ্যরীতি সম্ভব হত কি না সন্দেহ। বীরবলী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পায়। পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবের সময়েও শরৎচন্দ্র গদ্যরচনায় যে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর মনীষা প্রকাশ পায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির উপরেই তাঁর ষ্টাইল প্রতিষ্ঠিত। এদের সকলের মতই এবং সকলের চেয়ে বেশি করে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ রাজকাহিনী (১৯০৯), নালক (১৯১৬) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তার চরম ঘরোয়া (১৯৪১) এবং জোড়াসাঁকোর ধারেতে (১৯৪৪)। এই ষ্টাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা অতিশয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একাধিক ষ্টাইল ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের ষ্টাইল একাধিক নয়। অবনীন্দ্রনাথও একটিমাত্র ষ্টাইল ব্যবহার করেছেন। বাংলার ব্রত (১৯১৯) ও বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে (১৯২১-২৯ প্র. ১৯৪১) যে প্রভেদ তা কেবল বিষয়বস্তুর পার্থক্যেই ঘটেছে; সে প্রভেদ কেবল শাখাপ্রশাখায়, মূল কাণ্ডটা একই।

সাহিত্যের ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। এদের নাম দেওয়া যেতে পারে গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ এবং লেখনীস্পন্দ। কাব্যে এই তিন স্পন্দই অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং উদাহরণও প্রচুর মিলবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকেই সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হতে পারে।

'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতা বাক্যস্পন্দের অন্তর্গত; মুখের বাক্যভঙ্গিকে সামান্য আয়াসে বাঁকিয়ে তার সঙ্গে ছন্দের জ্যা যুক্ত ক'রে এই কাব্য গঠিত। গদ্যকবিতাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু তাকে পদ্যের কোঠায় না ফেলে গদ্যের কোঠায় ফেলে বিচার করাই উচিত।

লেখনীস্পন্দের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ কবিতা। এ বাক্যভঙ্গিও নয়, গীতিভঙ্গিও নয়; কলমের ডগা ছাড়া এ বস্তু লিখিত হতে পারে না। মানুষ কথা বলে, মানুষ গান করে, আবার মানুষ লেখে।

প্রাচীনকালে মানুষ কেবল কথাই বলত এবং গান করত; তখন লিখত না। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসে মানুষ মসীজীবী বা লেখক হয়ে পড়েছে। এই লিখনশীলতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। লিখনশীলতা মানুষের প্রকাশের সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক কথা যা না বাচ্য, না গেয়, তা লেখ্য। লেখনীর ঘটকালি না ঘটলে তা কখনো প্রকাশ পেত কি না সন্দেহ। ভাষা ও ছন্দ কবিতা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গীতিস্পন্দের উদাহরণ অবিরল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই গীতিস্পন্দ আছে; সুরযুক্ত বলে যে আছে তা নয়, গীতিস্পন্দ আছে বলেই সুরযুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ গীতিস্পন্দপ্রধান। সুরে গীত না হলেও এগুলি গীতিকবিতা, ইউরোপীয় অলংকারশাস্ত্রমতে লিরিক।

এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও এই তিন স্পন্দের লীলা দেখা যায়। সীতার বনবাসের স্পন্দ লেখনীস্পন্দ; ও-জিনিস গীত হবার নয়, উক্ত হবার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য, বীরবলী গদ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বাক্‌স্পন্দপ্রধান; কমলাকান্তের দপ্তরও তাই। প্রত্যেকটারই আদর্শ মুখের ভাষা; কোনোটাতে বেশি, কোনোটাতে কম এই মাত্র। গীতিস্পন্দের উদাহরণ গদ্যে বিরল। 'লিপিকা'র কোনো কোনো অংশ, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার কোনো কোনো কবিতা গীতিস্পন্দপ্রধান।

বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য। অবনীন্দ্রনাথের ষ্টাইলে যে স্বকীয়তার উল্লেখ করেছিলাম তা এইজন্যই। এ দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একেবারে দ্বিতীয়রহিত না হলেও নিঃসন্দেহ তিনি প্রধান।

সাহিত্যের এই গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দের মধ্যে গীতিস্পন্দ প্রাচীনতম; কারণ মানুষ কথা বলবার আগে গান করতে শিখেছে, আর তার লিখতে শেখা সে তো সেদিনের কথা। সে এত অল্পদিনের কথা যে কলমের সঙ্গে আজও তার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া যেন হয়নি; মনের অনেক কথাই আজও মানুষ কলমে প্রকাশ করতে অর্দ্ধক্ষম মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যাঁরা লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষা নিয়ে বিতর্ক বাধিয়ে থাকেন, তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক, সাহিত্যের ভাষা দুটি মাত্র নয়, তিনটি; লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষার সঙ্গে গেয় ভাষাকে যোগ করতে হবে। আর, লেখ্য ও মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল ক্রিয়াপদগঠনের মাত্র

নয়, ছন্দের প্রভেদ রয়েছে, আর ছন্দের প্রভেদ যে আছে তার কারণ ভাবের ও বিষয়ের প্রভেদ।

মানুষের প্রাচীনতম ভাবের বাহন গান, গদ্য পরবর্তী যুগের। আবার গদ্যের মধ্যে প্রাচীনতম—গীতিস্পন্দযুক্ত গদ্য। মানুষের অধিকাংশ রূপকথা এই গীতিস্পন্দের গদ্যে কথিত। কিন্তু রূপকথা যখন থেকে লিখিত হতে আরম্ভ হল, তখন গোলমাল বাধল। যা গীতিস্পন্দে কথিত হত লিখবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তা লেখ্য ও মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হল, কদাচিৎ কখনো গীতিস্পন্দযুক্ত ভাষায় লিখিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি রূপকথাকে রূপকথার ভাষায় অর্থাৎ গীতিস্পন্দের ভাষায় লিখেছেন। তাঁর পরিণত ষ্টাইলের মধ্যে বহু যুগের মায়ের কোলের দোল ও মাতামহীর মুখের সুর সঞ্চিত হয়ে আছে; তাঁর রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্রীর (১৯১৫) গদ্য পঠিত হবামাত্র এই সুর গুঞ্জরিত হয়ে উঠে মানুষের শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তখনই ব্যক্তির শৈশব আর মানুষের শৈশব এক সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়ে নিবিড় রূপকথার অপরূপ রাজ্যের সৃষ্টি করতে থাকে। রূপকথা-কথন কঠিন, আর রূপকথা-লিখন? —অবনীন্দ্রনাথের রচনা না পেলে অসম্ভব বলেই মনে হত।

আজকাল গণচৈতন্য প্রসঙ্গে গণশিল্পের কথা শোনা যায়। কালীঘাটের পট নকল করে ছবি আঁকা বা চাষার কাহিনী নিয়ে গল্প নাটক রচনা গণশিল্প নয়; কারণ, গণত্ব ঘটনার মধ্যে নাই; যে-মন রচনা করছে তার উপরেই সব নির্ভর করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের মন সাম্প্রদায়িক মন, সে মনের যোগ্য বাহন লেখ্য ভাষা, লেখাতে মানুষে মানুষে তফাত; আবার অল্প লোক লিখতে জানে, অধিকাংশই জানে না। অর্থাৎ, লেখ্য ভাষা এমন একটা পথ যে-পথের সন্ধান "গণ" জানে না, আর জানলেও সে সংকীর্ণ পথে জনতার স্থান সংকুলান হবে না। এক মাত্র গানের প্রাচীনতম ও উদারতম জগন্নাথক্ষেত্রে সকল মানুষের স্থান আছে। যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটেনি তখন থেকে গানের সঙ্গে জাতিহিসাবে মানুষ পরিচিত, গানের মারফতে মানুষে মানুষে পরিচয়; সে পরিচয় আজও সুপ্ত ভাবে মানুষের মনে সঞ্চিত আছে। গানের সুরে তা জেগে ওঠে। জেগে উঠে শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের বাঁধ ভেঙে সব একাকার ক'রে দিয়ে মানবসমাজকে এক ক'রে দেয়। চাষার বিষয়ে লিখিত নাটক গণসাহিত্য নয়; এমন কি খাঁটি চাষার লিখিত রচনাও

গণসাহিত্য নয়। কারণ সে পথ জনগণমনের পথ নয়, পরীক্ষা কঠিন নয়। গণ নাটকের আসরে কোনো প্রকৃত "গণ"কে বসিয়ে দিলে সে কিছুই বুঝতে পারবে না। আমাদের গণ সাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লেখা। রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মে থাকুননা কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মেছেন যেখানে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর আসন, যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলে চিরকালের শিশু। অভিজাত ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গণসংগীত যে কি ভাবে গিয়ে পৌঁছায় জানি না: হয়তো যে দাসীদের দ্বারা শৈশবে তিনি পালিত হয়েছিলেন, তাদের মুখের কাহিনীতে, গলার সুরে রূপকথার দীক্ষা তিনি পেয়ে থাকবেন; হয়তো মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই রূপকথার রসপান করেছিলেন; হয়তো প্রতিভার দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে তার সূচনা ছিল। কিংবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভিজাতে দরিদ্রে যে দুস্তর বাধা আমরা কল্পনা করে থাকি তা সত্য নয়: অন্তরঙ্গ কোনো মিল আছে নতুবা কলকাতার ধনীর ঘরে সমাজ ছাড়া, ঘরের ঘরকুনো একটি বালক কোন্ মন্ত্রে গণসাহিত্যের রাজা হয়ে উঠল। পরীক্ষাও কঠিন নয়। ভূতপত্‌রী, বুড়ো আংলা (১৯৪১), রাজকাহিনী পড়ে শোনাও, শ্রেণী-শিক্ষা-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে বুঝবে, বুঝে আনন্দ পাবে। অক্ষর-পরিচয়ের উপরে এদের রস নির্ভর করে না। অক্ষরগুলো ন্যূনতম অংশ। এমন কথা বাংলা সাহিত্যের ক'খানি পুস্তক সম্বন্ধে বলা যায়! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্নতম আসনে বসেছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মত, মাটির উপরে বসেই তিনি মাটির মানুষের মন কেড়ে নিয়েছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।

গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যের উপজীব্য কি? বাক্যস্পন্দপ্রধান গদ্যে তর্ক বির্তক করা চলে, তা সামাজিক মনের বাহন। লিখনস্পন্দপ্রধান গদ্যে চিন্তা করা চলে। গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে, সে গল্প রূপকথার গল্প। রূপকথার গল্পে এবং অন্য গল্পে মূলে একটা প্রভেদ আছে। অন্য গল্পের মত রূপকথায় রিয়ালিজমের স্থান নাই। আজ যা রিয়ালিজম্ কাল

তা রিয়ালিজম্‌-বর্জ্জিত ; সাহিত্যে নিত্যই একটা রিয়ালিজম্‌-বর্জ্জনের প্রক্রিয়া চলছে। কাহিনী থেকে রিয়ালিজমের বিষ ঝরে গেলে তবেই তা রূপকথায় স্থান পাওয়ার যোগ্য হয়। এই রিয়ালিজম্‌ বর্জ্জনের জন্য কি সময় দরকার ? ঠিক কতটা সময় লাগবে তা ইতিহাসের গতির উপরে এবং লেখকের শক্তির উপর নির্ভর করে ; সামান্য নিয়মের দ্বারা নির্দ্দেশ করা চলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নেপোলিয়নের জীবনী এবং ইতিহাস বাস্তব ব্যাপার। টলষ্টয়ের "ওয়র আণ্ড পীস" উপন্যাসে তা একদফা রূপান্তরিত হয়েছে। এ বই লিখনস্পন্দপ্রধান ভাষায় লিখিত। কারণ, এই গল্পের সূত্রে লেখক মানব জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তনীয় কথা বলতে চেয়েছিলেন। আবার নেপোলিয়নের কাহিনী নিয়ে ফরাসী কবি বেরেঞ্জার গান লিখেছেন ; তাতে অনুভূতির কথা আছে, চিন্তার কথা নাই। এ হল বাস্তব ঘটনার আর এক রকম রূপান্তর। আবার এই একই কাহিনী হার্ডির হাতে "দি ডাইনাষ্ট্‌স" কাব্যে জন্মান্তর পেয়েছে। কিন্তু কোনোটাই রূপকথার পর্য্যায়ে পড়ে নাই। বরঞ্চ বেরেঞ্জারের কোনো কোনো গান রূপকথার সীমার মধ্যে যেন এসে পড়ে। বেরেঞ্জারের একটি গান আছে—একজন বৃদ্ধ সৈনিক, সে নেপোলিয়নকে দেখেছিল, ছোট ছেলেদের গল্পচ্ছলে বলেছে, আমি তাঁকে এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে বহু রাজার দ্বারা অনুসৃত হয়ে যেতে দেখেছি। এ প্রায় রূপকথার পর্য্যায় ভুক্ত। নেপোলিয়নের ইতিহাস বাস্তব বিষয় বর্জ্জিত হয়ে একটি ছত্রে সত্যতর হয়ে উঠেছে। সমগ্র ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ওই একটি ছত্রে ঘনীভূত। রিয়ালিজম্‌ সত্য, অতি-রিয়ালিজম্‌ বা সুপার-রিয়ালিজম্‌ সত্যতর, রূপকথার কারবার এই সুপার-রিয়ালিজমের উপাদান নিয়ে। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের রিয়ালিজমের উপাদান এখনো সম্পূর্ণরূপে খসে যায়নি। ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনীতি এখনো সক্রিয়। হয়তো পাঁচশ বছর পরে কিংবা হাজার বছর পরে নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের বিরাট ঈগলকে রূপকথার রূপার খাঁচায় ভরবার সময় আসবে, তখন নেপোলিয়ন আর সম্রাট থাকবেন না, তিনি Jack the Giant killer জাতীয় একটা রূপকাহিনীতে পর্য্যবসিত হবেন—যে বামন জ্যাক একাকী ইউরোপীয় বহুরাজক অরাজকতার দৈত্যকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিল। বাস্তব জ্যাক ও জায়েন্টের কাহিনীর মূলে বহু যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচণ্ড একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা আছে ; এখন তা প্রমাণের পরপারবর্ত্তী

অনুমানের রাজ্যে গিয়ে পড়েছে। প্রমাণের কম্পাসে রিয়ালিজমের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়; রূপকথার রাজ্যের জাদুমন্ত্রপড়া বাতায়ন থেকে যে দুস্তর সমুদ্র দেখা যায় তার এক মাত্র কম্পাস—অনুমান। সে কথা প্রমাণ যোগ্য নয়, অনুমান যার একমাত্র সম্বল, তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা চলে না, চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের দ্বারাই তা প্রকাশযোগ্য। সেই জন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা।

অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা, তাঁর প্রথম গ্রন্থ থেকে শেষতম 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অবধি সবই রূপকথা। তাঁর সমস্ত রচনা যেন এক খানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুন্তলীকৃত হয়ে খুলে চলেছে, প্রথম দিকে তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়। কিন্তু কালক্রমে তা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনোখানে ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), শকুন্তলার (১৮৯৫) ছাপ; কোনোখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সুতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চীর খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ ছাপ দেখছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলে এর যে-কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলে কোনো একখানা বই পড়লে একরকম সব বই পড়ার কাজ হয়ে যায়।

ক্ষীরের পুতুল তো প্রকৃত রূপকথার বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা রূপকথা নয়; কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাতের ফলে শকুন্তলা-কাহিনী এখন রূপকথার বস্তু হয়ে উঠেছে। রাজকাহিনী ঐতিহাসিক; ইচ্ছা করলে ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ যোগে দেখা যেতে পারে, তাতে ইতিহাসের রস পাওয়া যাবে। কিন্তু লেখক ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ ফেলে রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়েছেন; ফলে কাছের জিনিষ তথ্য বর্জ্জন করতে করতে দূরে সরে গিয়ে রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে (দূরবীক্ষণ দূরের জিনিষ কাছে টেনে আনে; ওটা রিয়ালিজমের সত্য)। ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতার বুনানি এতই সূক্ষ্ম যে, আছে কি না সন্দেহ হয়; বৈদেশিক রূপকথার রাজার সেই নূতন পোষাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। বুড়ো আংলার কাহিনী মূলত বিদেশী হলেও মনে রাখতে হবে রূপকথায় দেশ-

বিদেশের রিয়ালিজম্-গত প্রভেদ নাই, সেখানে সব দেশেই এক দেশ ; সব মানুষই এক মানুষ, অর্থাৎ শিশু। রূপকথার রাজ্যই আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত অখণ্ড পৃথিবী ; রূপকথার শ্রোতা শিশুই আন্তর্জ্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত জাতিসম্প্রদায়-ধর্ম্ম-দেশ-বিমুক্ত মানব ; রূপকথার সত্যযুগ ইতিহাসের বিস্তৃতির পরপারবর্ত্তী অতীতকালে, কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নয়।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব এই যে, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সামসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করেছেন। এ কেমন ক'রে সম্ভব হলো ? আগে বলেছি যে, রূপকথায় পরিণত হতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তা বলি নাই, কারণ তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হলেও তা এত শীঘ্র রূপকথায় রূপান্তরিত হওয়ার অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলা দেশের একটা বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্প দিন গত হলেও ইতিমধ্যেই যেন বহুযুগ আগে গিয়ে পড়েছে। সেদিনের পল্লী-কলকাতার সঙ্গে আজকার যান্ত্রিক-কলকাতার যে প্রভেদ তা কেবল সময়ের নয় দুই জীবন ভঙ্গির প্রভেদ। পল্লীর জীবন ভঙ্গি থেকে আজ আমরা বহু দূরে চলে এসেছি ; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহু কালের তফাত ঘটে গিয়েছে ; প্রায় 'এই জনমে ঘটালে মোর—জন্মজনমান্তর' গোছের। দুয়ের রসই আলাদা। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সময়ের দুরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হয়ে চেপে ব'সে তাকে নূতন অর্থ, নূতনতর দুরত্ব দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নামে একটি শিশুর জন্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ নামে মহাকবির মৃত্যু সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে (রিয়ালিজম্ বলে আশি বছর কয়েক মাস) এই বাড়ীতে ঘটে গিয়েছে। এ যে কত বড় পৃথিবী-নাড়া-দেওয়া ঘটনা তা চোখে দেখেছি বলেই বিশ্বাস হচ্ছে না, বিস্ময় বোধ হচ্ছে না। চোখে না দেখে ইতিহাসে পড়লে বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। এই সামান্য আশি বছরের উপর অনেক শতাব্দীর ভার যেন ঘনীভূত। সামান্য অঙ্গারের উপর ভূস্তরের দুর্ব্বহ চাপ পড়ে হীরকের সৃষ্টি করে। সামান্য কয়েক বছরের উপর বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত

হয়ে একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করেছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজম্; রূপকথা প্রকৃতির হীরক।

তৃতীয়ত, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও নিজস্ব একটি গদ্যরীতি ছিল; সে রীতির মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেরণা আর লক্ষণীয় গুণ ছিল ভাষার প্রসাধন-কলা। কিন্তু তার প্রধান ক্রটি এই যে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশী ও অন্যান্য ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের যোগাযোগে যে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতি গড়ে ওঠে সে রহস্যটি আয়ত্ত করবার সুযোগ তিনি পাননি। দীর্ঘ আয়ুর সৌভাগ্য লাভ করলে এ রহস্য তাঁর করায়ত্ত হতো নিঃসন্দেহ, আর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের আসরেও তার আসন আরও উঁচুতে পড়তো; এখনো তাঁর আসন অবহেলার যোগ্য নয়। কনারকের মত গদ্যের উদাহরণ রবীন্দ্র ও বঙ্কিম সাহিত্যের বাইরে বোধ করি নাই।*

বাংলা দেশে বিশুদ্ধ প্রবন্ধকারের মন মেজাজ মনীষা ও কলম নিয়ে যে কয়েকজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ভূদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও প্রমথ চৌধুরী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের প্রবন্ধ অতুলনীয় কিন্তু বিশুদ্ধ প্রবন্ধকার তিনি নন, জাতিবৈর ও ব্যক্তিগত রুচি মনে মনে তার রচনার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়ে তাকে হাল্কা প্রতিপন্ন করে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ঐশ্বর্য্য বিস্ময়কর—কিন্তু যুক্তি ও তথ্যের সম্বলদীনতা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রধান ক্রটি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে আরও একটু সরসতা, আরও একটু মানব হৃদয়ের স্পর্শ থাকলে একালের পাঠকের চোখে তার মূল্য বোধ করি এমন কমে যেত না। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রধান ক্রটি সচেতন চতুরতা আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গুরুত্বহ্রাস। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত অথচ সরসতা, প্রাঞ্জলতা ও মনীষার স্বকীয়তায় মণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ পূর্ব্বোক্ত দোষ ক্রটি থেকে সর্ব্বৈব মুক্ত। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত এই ভাষারীতি, আর এই মানসিক আবহাওয়া। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবেশ ও গভীর ভাবে প্রবেশ সত্যই বিস্ময়কর—আর তার উপরে বিস্ময়কর সরস ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাবে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা।

* পদাঙ্ক: বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—হৃদয়াঞ্জলি; কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা; কনারক।

তিনি সর্ব্বদা নিজেকে অন্তরালে রেখে বিষয়কে প্রকাশ করেছেন, তথাপি পাঠক বুঝতে পারে যে কাছেই কোথাও পথ প্রদর্শক আছেন, প্রয়োজন কালে তাঁর সহৃদয় হস্তের স্পর্শ পাওয়া যাবে। নিছক প্রবন্ধকার হিসাবে বিদেশী সাহিত্যের মাপ কাটিতেও রামেন্দ্রসুন্দর ও ভূদেব সগৌরবে উত্তীর্ণ হবেন সন্দেহ নাই।*

ইতিমধ্যে আবার কালান্তর ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের জীবন পরমায়ুর পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলে পড়েছে। বঙ্কিম যুগের অবসানে যেমন কিছুকাল ধরে নূতন পুরাতনে মিশল চলেছিল—এখনো আবার তেমনি মিশল চলছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কলম একাধারে সেই নূতনের স্রষ্টা এবং নূতনের নির্দ্দেশে চালিত। ঊনবিংশ শতকে সমগ্র ভারতে সর্ব্ববিষয়ে বাঙালীর অগ্রনীয়তা ছিল, তা এখন আর নেই। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে বাঙালীকে ধরে ফেলেছে, বাঙালীর প্রাধান্য আর তারা তেমন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে রাজি নয়; আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর নূতন প্রতিযোগী জুটেছে, চাকরির ক্ষেত্রেও। আর কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় বাংলা দেশ কেন্দ্র থেকে কোণে পরিণত হয়েছে। তারপরে, রাজনীতি ও রাজরোষের আবর্ত্তে পড়েছে বাঙালী। ঊনবিংশ শতকে একটি উদার কালচারের স্রষ্টা ও পোষক ছিল যে সমাজ—এখন তা রাজনৈতিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক চাপে বিভ্রান্ত। নূতন যুগের বাঙালী আর আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল, উৎসাহ উদ্যম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত স্থিরলক্ষ্য সমাজ নয়—এখন সে নোঙর-ছেঁড়া নৌকা, পুরাতন ঘাট ছেড়েছে, নূতন ঘাট কোথায় জানে না। এই তো অবস্থা। বঙ্কিম যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালী যদি হয় গোরা, মনে রাখতে হবে গোরা উপন্যাসের ঘটনাকাল আনুমানিক ১৮৮২ সাল, তবে নূতন যুগের প্রতিনিধি অমিত রায়। দু' জনের চরিত্রের প্রভেদ যুগচরিত্রের প্রভেদ। গোরার জীবন বাণী যদি হয় 'চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না', অমিত রায়ের জীবন বাণী যেন তারই প্রতিবাদ। গোরার কাজ করবার মতো উৎসাহ ছিল, অমিত রায়ে তার অভাব বলে সে কেবলই কথার চুল চিরে চিরে বুদ্ধির বাহাদুরি দেখায়। এই মনোভাবের সাহিত্যিক

* পদাঙ্ক: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ঈশ্বরচন্দ্র: বিদ্যাসাগর; মুক্তি; বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মন্দিরের সৌন্দর্য্য।

রূপ দেখা দিল প্রমথ চৌধুরীর কলমে। শেষ তিনটি শব্দের স্থলে সবুজ পত্রে লিখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু না, সবুজ পত্র বললে ভুল হবে। সবুজ পত্রের প্রধান পোষ্টা ও লেখক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হ্রস্বক্রিয়াপদের রীতিকে স্বীকার ক'রে নিলেও তার রচনায় যে কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ভাবের বৃহৎ ব্যাপ্তি, যে উদার বাণীরূপ আছে প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তার অভাবটাই বৈশিষ্ট্য। প্রমথ চৌধুরীর জগৎ অমিত রায়ের জগৎ—সে জগতের নাম দেওয়া যেতে পারে চায়ের টেবিলের জগৎ। সেখানে কথাবার্ত্তা চাপা গলায়, সেখানে হাসি পরিমিত, বাণী পরিমিত, ভাষার পদক্ষেপ পরিমিত আর সেখানে ভাষার সঙ্গীত পেয়ালার চামচে টুংটাং ধ্বনি। বাংলাসাহিত্যে এ সব লক্ষণ নূতন ও যুগ-চিত্তের বাহন। প্রমথ চৌধুরীর নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে এসব কথা বলছি না, বরঞ্চ প্রশংসাই করছি। একটা নূতন যুগের ভাবসাব, চরিত্র ও বক্তব্যকে প্রতিভার আতস কাঁচে সংহত ক'রে শিখা জ্বালিয়ে তোলা কম শক্তির পরিচয় নয়। ওর মধ্যে নিন্দনীয় যদি কিছু থাকে তবে তা যুগধর্ম্ম নিহিত, কিন্তু বোধ করি তাও নয়, কেন না, যুগধর্ম্ম নিন্দনীয়ও নয়, প্রশংসনীয়ও নয়—যা তাই; নিন্দা প্রশংসা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহ বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ও নূতন একটি রীতির স্রষ্টা।* প্রমথ চৌধুরী যে এক সময়ে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ভাষায় অর্থাৎ সাধু ভাষায় লিখতেন তা বোধ করি লোকে ভুলেই গিয়েছে, জয়দেব তার প্রমাণ।

অবশ্য পরবর্ত্তীকালে এ রীতি তিনি পরিত্যাগ করেছেন, বলেছেন যে বাঙালীর মুখের কথাকে সাহিত্যে চালাতে তিন বদ্ধ পরিকর। তিনি নিজেকে —'কৃষ্ণনাগরিক' বলে দাবী করেছেন, তার মধ্যে খুব সম্ভব এইটুকু সত্য আছে যে, তাঁর কথ্য ভাষার ভিত্তি হচ্ছে ভারতচন্দ্রের পয়ার। দুই-ই মার্জ্জিত, ক্ষিপ্র, ও মেদ বাহুল্যহীন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই মিল। কেননা, ভারতচন্দ্রের পয়ারের ভিত্তি বাংলা চলতি Idiom; চলতি Idiomকে ভাষার প্রধান উপাদান করে তুলতে পারেননি প্রমথ চৌধুরী। তাই তাঁর ভাষা মুখের ভাষা হয়ে ওঠেনি, সাধু ভাষার মতোই একটা কৃত্রিম ভাষা হয়ে আছে।

* পদাঙ্ক: প্রমথ চৌধুরী—জয়দেব; পত্র; পত্র; রূপের কথা; বাঙালী পেট্রিয়টিজম; পথের অভিজ্ঞতা; বাংলা ভাষার কথা; চিত্রাঙ্গদা; ভারতচন্দ্র।

আগে বলেছি যে বাংলা কথ্য ভাষার দুটি রূপ—হুতোম পেচার নক্সায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় পাই একটি; আর একটি পাই রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির রচনায়। প্রথমটির উদ্ভব বাঙালীর মুখের কথা, দ্বিতীয়টির উদ্ভব সাধু ভাষা; দ্বিতীয়টি সাধু ভাষারই একটি সংস্কৃত রূপ। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তারই একটি চূড়ান্ত মূর্ত্তি। তিনি প্রসাদগুণের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে তা হচ্ছে মনের আলো। এই মনের আলো তাঁর রচনায় প্রচুর আছে—কিন্তু সে আলোতে কি চোখে পড়ে? নামান্তরে রূপান্তরে এক দল অমিত রায় চায়ের টেবিল ঘিরে বসে পরস্পরের যুক্তি নিয়ে চুলচেরা তর্ক করছে। রবীন্দ্রনাথ যে এখানে প্রথম অমিত রায়কে আবিষ্কার করেননি তা বলা যায় না। এ ভাষায় চাতুরি আছে, চটক আছে, নিপুণতা আছে, যুক্তি আছে—এ যেন শাণিত, মার্জ্জিত ভেলভেটের খাপে রাখা ছুরি—দেখলে তাক লাগে, কিন্তু সংসারের কোন বড় কাজে লাগে না। যে ভাষার সাহায্যে রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অদৃষ্টচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প করেছিলেন, এ ভাষা সে ভাষা নয়। ঊনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষীগণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি একটা Sense of Destiny অনুভব করতেন, তাঁদের মনে ছিল ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের অদৃষ্টচক্রকে দক্ষিণাবর্ত্তে ঘোরাবার সঙ্কল্প, তাই তারা সগর্ব্বে নিয়তির সঙ্গে পা মিলিয়ে যাত্রা করেছিলেন—তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সেই শুভ যাত্রার পদধ্বনিতে আন্দোলিত। সবুজ পত্রের যুগ থেকে দেখি—'সে প্রচণ্ড গতি অবসান'; আর নিয়তির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা নাই, এখন কেমন তটস্থভাবে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা ও সমালোচনা, সমস্ত কিছুর নৈস্ফল্য ঘোষণা, —আর চতুর চটুল কথাতেই যে সর্ব্বসিদ্ধি সম্ভব তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা। যে হাত থেকে ঘটনার বলগা খসে পড়েছে সেই হাত এখন ভাষা-রীতির ইন্দ্রজালের চাতুরি দেখাতে ব্যস্ত। এক সময় ষ্টাইল ছিল লেখকের করায়ত্ত, এখন লেখক হয়েছে ষ্টাইলের করায়ত্ত। ষ্টাইলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে চলেছে। গোড়ায় ঐ যে কালান্তরের উল্লেখ করেছি—নিয়তির সাহচর্য্যবোধেব অভাব তার প্রধানতম লক্ষণ। বাঙ্গালী এক সময়ে নিজ অদৃষ্ট তথা ভারত অদৃষ্টের নিয়ন্তা ছিল—এখন ঘটনা প্রবাহে ভাসমান

অসহায় তৃণখণ্ড। কালান্তরের সাহিত্য, কালান্তরের ষ্টাইল সূচীপত্র। কল্পনারাজ্যে যেমন অমিত রায় সাহিত্যরাজ্যে তেমন প্রমথ চৌধুরীর কলম—দুই-ই একই মানসিক উপাদানে গঠিত।

১৯৪১ সাল অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আমাদের আলোচনার সীমা, কাজেই আর এগোবার প্রয়োজন নেই। কেবল একটি কথাই যথেষ্ট। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লিখিত গদ্যরীতিতে অনেক প্রভেদ সত্ত্বেও এক জায়গায় মিল আছে—সবগুলিতেই বাঙালী সমাজের একটা গতি প্রতিফলিত। প্রমথ চৌধুরীর ষ্টাইলে স্থিতির চিত্র। তৎপরবর্ত্তী কালের ষ্টাইলে বা ষ্টাইলের অভাবে আর গতিও নয় স্থিতিও নয় একটা অরাজকতার মূর্ত্তি। সামাজিক অরাজকতারই রূপান্তর। একেবারে গোড়ায় অন্য প্রসঙ্গে সভ্যতার সঙ্কটের উল্লেখ করেছিলাম। এবারে একেবারে শেষে আর এক প্রসঙ্গে তার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। মহাকবি বলেছেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মী ছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" এ চিত্র কেবল রাজনৈতিক ভারতের নয়, আমাদের মানসক্ষেত্রেরও বটে। ক্রমবিস্তার্য্যমান মানসিক মরুভূমি ভাষার রূপ রস রঙ সৌন্দর্য্য শুষে নিচ্ছে, সুন্দর করে প্রকাশ করাটাই এখন হতভাগ্য বুর্জোয়ার লক্ষণ, এ রকম ক্ষেত্রে ষ্টাইলের সৌষ্ঠব আশা করা উচিত নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ষ্টাইল না থেকে যায় না—কারণ ভাষা তো যুগের ছায়া বহন করবেই। যুগের অরাজকতা ষ্টাইলের অরাজকতায় প্রকাশমান!

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই প্রবন্ধের কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬১ গিরিশ-বক্তৃতারূপে পঠিত হইয়াছে।

রামরাম বসু

১৭৫৭ [?]—১৮১৩

প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাবর্তন

ক্রমে ২ তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌঁছিলেই এক কালিন বন্দুকের দেহড় ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন রাজবাটীর বাহির ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না ইহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্তরায় ও আর ২ মন্ত্রী লোকেরদিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইলে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি উত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতের পদে নত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।

পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য তিনজন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র কি সমাচার আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত ২ আচরণ করিলা। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া কেবল ছায়ার ন্যায় রহিয়াছি তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শ্রবণ মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়াছিল পরে তোমার এমত ২ আচরণে আমারদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমদ নাই ইহার পূর্ব্ব মত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিণ্ডমান। আমি তোমাকে যত্ন পূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলাম ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিত। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।—

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্বে রাগত হইয়া এমত ২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জা প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে ২ পিতা ও খুল্লতাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব। ইহাতে মহারাজা ও রাজা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যকে

ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন ও বলিতেছেন পুত্র লজ্জা নাই ভয় করিও না যাহা তুমি করিয়া আসিয়াছ সেই আমাদের সৎক্রিয়া তাহা আমরা দুর্জ্জনতা গণনা করিব না। এই মতে শান্তনা করিলে সে কিছু প্রত্যুত্তর না করিলে বাদসাহী ফরমান পঞ্জা সমেত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে দিলেন।—

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। ১৮০১

উইলিয়ম কেরী

১৭৬১—১৮৩৪

স্ত্রীলোকের কথোপকথন

আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রেন্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কামি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা শুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

কথোপকথন। ১৮০১

কন্দল

আর শুনেছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাচ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ভাড়িয়া ছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে যাইটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গলাঁগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাডে।

থাকলো ছার কপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা ২ করে কান্দে তবেই ও অহঙ্কারির অহঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধুলো ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুন্দলি।

আই ২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওত পোয়াতি বটে। যা বুন তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাম নাই। পাড়া পড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়া বাড়ি কেন।

কথোপকথন। ১৮০১

খলের ইতিহাস

কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেক আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে। এই কথা শুনিয়া সাধু বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি সাধুপুরনিবাসী ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিব। পরে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি নিমিত্তে এতাদৃশ ভয়ানক কাননে রহিয়াছ। খলেশ্বর উত্তর করিলেক যে সর্প ব্যাঘ্র ভালুকাদি হিংস্র জন্তু আমাকে ভক্ষণ করিবেক এই আশয়েতে এই বনে প্রত্যহ বসিয়া থাকি। তিনি কহিলেন যে শরীরের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধিত হয় এমত উত্তম দেহ অনর্থক জন্তুকর্তৃক নষ্ট করিবার জন্যে এত ক্লেশ কেন পাইতেছ। সে কহিলেক ইহার কারণ এই যে হিংস্র জন্তু সকল আমার মাংস ভোজন করিলে মনুষ্য মাংসের স্বাদু জানিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য ২ মনুষ্য সকলকে খাইবেক। সাধু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচার করিলেন যে এমত খলের দেশে গমন করিলে অচিরে বিপত্তিগ্রস্ত হইব। পরে তথায় না গিয়া সেখানহইতে দেশান্তরে ব্যবসায়ার্থে প্রস্থান করিলেন। ইতি খলের ইতিহাস।

ইতিহাসমালা। ১৮১২

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

আনুমানিক ১৭৬২—১৮১৯

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা

অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করত গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ

অন্বেষণ করিতে ২ সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে ২ ঐ দেবদত্ত নাম ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে। ইত্যবসরে রাজার লোকেরা সে অলঙ্কার সমেত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলা আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী

ধাৰ্ম্মিক নিরপরাধী রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণের দিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিল যে মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে তাহাকে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূৰ্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্যে আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশায় এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূৰ্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এ রূপ ব্যাপার করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন।

বত্রিশ সিংহাসন। ১৮০২

হিতোপদেশ

অনন্তর লঘুপতন নামে কাক সকল বৃত্তান্ত দেখিয়া ইহা বলিল কি আশ্চৰ্য্য হে হিরণ্যক তুমি শ্লাঘ্য। অতএব আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি এই নিমিত্তে আমাকে মিত্রতাতে অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হও। ইহা শুনিয়া হিরণ্যকও গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া কহিল কে তুমি সে বলিল আমি লঘুপতন নামে কাক হিরণ্যক হাসিয়া বলিল তোমার সহিত মিত্রতা কি যেহেতুক লোকেতে যে যাহার সহিত উপযুক্ত হয় পণ্ডিত লোক তাহাকে তাহার সহিত মিলন করাইবেক আমি ভোজ্য তুমি ভোক্তা ইহাতে কি প্রকারে প্রীতি হইবে আর যেহেতুক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে প্রণয় সে বিপত্তির কারণ কেননা শৃগালহইতে পাশেতে বদ্ধ মৃগ কাককর্ত্তৃক রক্ষিত হইল। কাক কহিল এ কি প্রকার হিরণ্যক কহিতেছেন।

মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকে তাহাতে হরিণ ও কাক দুই

জন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব যা হউক বিশ্বাস জন্মাই। এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল! মৃগকর্ত্তৃক কথিত হইল কে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি এই বনেতে মৃত শরীরের ন্যায় বান্ধবহীন হইয়া বাস করি সম্প্রতি তোমাকে মিত্র পাইয়া পুনর্ব্বার সবান্ধব হইয়া সজীব হইলাম এখন আমি সর্ব্বদা তোমার অনুচর হইব শৃগাল মৃগকর্ত্তৃক কথিত হইল এই হউক। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেলে পরে মৃগের বাসস্থানে সেই মৃগ ও শৃগাল গেল সেখানে চম্পক বৃক্ষের ডালেতে মৃগের চিরকালের মিত্র সুবুদ্ধিনামা কাক বাস করে হরিণ আর জম্বুককে দেখিয়া কাক বলিল মিত্র দ্বিতীয় এ কে হরিণ কহিতেছে ইনি জম্বুক আমার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছেন কাক বলিতেছে সখে অকস্মাৎ আগন্তুকের সহিত মিত্রতা উচিত নয় এই বিজ্ঞকর্ত্তৃক কথিত আছে যাহার কুল ও স্বভাব জ্ঞাত নহে তাহাকে বাসস্থান দেওয়া উপযুক্ত নহে।

হিতোপদেশ। ১৮০৮

সিরাজদ্দৌলা

তদনন্তর মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারেরা নবাবের আজ্ঞামত দাদনি করিয়া নবাবের সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া আপন ২ স্থানে গেলেন। তদনন্তর নবাব সিরাজদ্দৌলা আপন লোকেরদের ব্যবহার অনুসন্ধান করিয়া শঙ্কা ও ভয়েতে অতিশয় সাতঙ্ক হইয়া পাটনার নায়েব সুবেদার রাজা রামনারায়ণের আরজিমতে ঐ রাত্রিতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জিলোখানাতে কোনহ সরদারকে হাজীর হইতে না দেখিয়া কেবল এক প্রাচীন বৃদ্ধ সরদারকে শও চারি পাঁচেক বিরাদারি সমেত হাজীর হইতে দেখিয়া এক খাস পলোয়ারে কএক খেদমৎগার সমেত সওয়ার হইয়া অজীমাবাদ প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাজমহলের নিকট পঁহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিছু খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্তে একজন চাকরকে নৌকাহইতে নামাইয়া দিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল সে পূর্ব্বে মুরশিদাবাদে একজন মর্দ্দ আদমি ছিল নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে

গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছিলেন এই অপমানে সে ব্যক্তি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল সেই ফকীর নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে কিছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল যে তুমি এইখানে থাক আমি বাজার হইতে সামগ্রী আনিয়া অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে রুটী করিয়া দিই। নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকর তৎকালোপযুক্ত সে কথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকীর সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা যে পলাইতেছেন এ কথা প্রকাশ করিল। ইহাতে তথাকার ফৌজদারি আমলা লোকেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার ইঙ্গরেজ বাহাদুরেরদের সহিত যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহা জ্ঞাত ছিল তাহারা ইহার পলায়ন শুনিয়া পলোয়ারের নিকটে আসিয়া সর্ব্বসুদ্ধ পলোয়ার আটকাইয়া মুরশিদাবাদে অতি শীঘ্র সমাচার পাঠাইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাইলে পর মহারাজ দুর্ল্লভরাম সশঙ্ক হইয়া থাকিলেন কিন্তু জাফরালী খাঁ সাহেব লোকেরদের সহিত মিলিয়া নবাবের কিল্লা ও আর ২ আসবাব সকল অধিকার করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা রাজমহলে ধরা গিয়াছেন এ সমাচার পাইয়া সাহেব লোকেরদিগকে সম্বাদ দিয়া নবাবকে তথাহইতে আনাইয়া জাফরগঞ্জে আপনার বাটীতে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র মীরণ সাহেব লোকেরদিগকে ও মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিতে সম্বাদ না দিয়াই নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু ভয়েতে নানাপ্রকার কাতরোক্তি না শুনিয়া আপন হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে খণ্ড ২ করিয়া ঐ ছিন্ন শরীর হাতির উপর চঢ়াইয়া শহর ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বরেচ্ছা মতে নবাব মহাবৎজঙ্গের আপন মনিবের পুত্র অথচ আপন মনিব নবাব সরফরাজ খাঁকে কপটে মারিয়া নবাব হওয়ার ও অলিভাস্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্ররদের সরদার লোকেরদিগকে কপটে কাটাইবার ও স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার বলাৎকারে পরস্ত্রীরদিগের আনয়ন প্রভৃতি দৌরাত্ম্যের প্রতিফল লোকতঃ প্রকাশ করিল।

রাজাবলি। ১৮০৮

ব্রহ্মের স্বরূপ

অতএব যে ব্রহ্মকে অনির্ব্বচনীয় বলে তাহার মতে ব্রহ্ম জগতের মত অনিত্য হইতে পারেন অনির্ব্বচনীয় হেতুর সমতাপ্রযুক্ত হে বুদ্ধিমানেরা মাৎসর্য্যদোষ

ত্যাগ করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া বুঝ এ অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্য বেদান্তী ঈশ্বরকে সদ্রূপ কহে আর বার অনির্ব্বচনীয়ও কহে যাহাতে ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত ঈশ্বর মিথ্যা হন। আর শুন সৃষ্টি দুই প্রকার হয় ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি যেমন মাংসময়ী স্ত্রী মাত্র ঈশ্বরসৃষ্টি তাহাতে অবয়বসংস্থানাদিকৃত বিশেষ চিহ্ন ব্যতিরেকে স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুসারে জীবেরা মাতা পত্নী ভগিনী ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ কল্পনা করে এই জীবসৃষ্টি মোক্ষপ্রতিবন্ধক বালকজ্ঞানবৎ যে সামান্যাকার জ্ঞান সে মোক্ষপ্রতিবন্ধক হয় না অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবসৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন বেদান্তের অভিপ্রায় সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরসৃষ্টির অন্যথাকরণ বেদান্তের অভিপ্রায় নয় অশক্য নিষ্ফলক কর্ম্মকরণেতে প্রবৃত্তি কেবল হাস্যাস্পদ হয়। তবে যে ঈশ্বরসৃষ্টি জগতের সৃষ্টি প্রলয় সে কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র যেমন পট বিস্তার ও সঙ্কোচেতে তদর্পিত বিচিত্র চিত্রের দর্শনাদর্শন মাত্র তেমনি চেতনেশ্বরশক্তির বিস্তার আর সঙ্কোচেতে এ বিচিত্র জগতের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব সেই সৃষ্টি ও প্রলয় হয় সত্যসঙ্কল্পের মনোরাজ্যরূপ এ জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা হয় না। মায়ায়াং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্বাবস্থমিদং জগৎ। ইত্যাদি প্রমাণতঃ এ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের মত। এই সকল শাস্ত্রতাৎপর্য্য না জানিয়া আপাতদর্শীরদের যে স্বকপোলকল্পিত বাঙ্‌মাত্র কল্পনা সে কেবল কল্পনামাত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা বালভাষিত জ্ঞান করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইয়া হাস্য করেন।

বেদান্ত-চন্দ্রিকা। ১৮১৭

বিশ্ববঞ্চকের কাহিনী

ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা আঙ্গার পূরিয়া উপরে এক আদ্ সের ঘি দিয়া দেশে ২ শহরে ২ নগরে ২ গ্রামে ২ অনিয়ত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াসুদ্ধা তোলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে তবে তাহাকে দেয় না বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতারদের হোমের উপযুক্ত আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয় তাহার এক আদ সের ন্যূন করিয়া ঘড়া সমেত দিতে পারি কিন্তু ঘড়াহইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্ব্বদা

দিতে পারি না। কেন না যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবে না কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস্ কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস্ অবশিষ্ট ভাগ দেবতারদিগকে দেয় হয় না তবে লইয়া কি করিব।

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কেহ আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন তুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম অধিক হবির কার্য্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায় কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ডসমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায় এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর একজন বিশ্বভণ্ড নামে এক কুপাতে পাঁক কাদা পুরিয়া তদুপরি কথক গুড দিয়া ঐ কুপা মাথায় করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে ২ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল গুড়ের কূপা মাথায় করিয়া কতো বেড়াব উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয় এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে ২ আমি আপন গুড়ের কূপা ছাড়িয়া উহার ঘৃতসম্পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করাভাণ্ড গাছের তলায় ফেলাইয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে ২ তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল। তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে ২ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে ঈশ্বরবিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয় আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঠকের মা ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয় মাথাহইতে ভার নামা আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল ওগো আমি যাইতে পারিবো না আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল আয় এই নে আজি বড় মজা হইয়াছে দিব্য সার গুড় এক কূপা পাওয়া গিয়াছে এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া

আমার সেই ঘিএর ঘড়া জানিস্ তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম পশ্চাৎ টের পাইবে যা শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর আমি নাইয়াই আসিয়াছি ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাঁধা হয় তেল নাই লুন নাই চাউল নাই তরকারি-পাতি কিছুই নাই কাঠগুলা সকলি ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হবে তাহাতে আবার বৌ ছুঁড়ি অশুদ্ধা হইয়াছে কুঠনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তৎপতি কহিল আজি কি ঘরে কিছুই নাই দেখ দেখি খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিঠা করা বুঝি বড় সোজা জান না পিঠা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না তেমনি পিঠার লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে।

প্রবোধ-চন্দ্রিকা—১৮

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

জন্ম? মৃত্যু?

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন সর্ব্বদা আনন্দিত পুরবাসীরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত নানা দেশীয় গুণবান ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা সকলেই মহারাজাকে প্রশংসা করে দিন ২ রাজ্যের বাহুল্য প্রজার বাহুল্য হইতেছে রাজার পাঁচ পুত্র কোন অংশে ত্রুটি নাই যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে কিন্তু নবাব স্রাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন দেশাধিকারী দুরন্ত কখন কি করে মধ্যে ২ পণ্ডিতেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন দেখ দেশাধিকারী অতি দুর্ব্বৃত্ত তোমরা সকলে ঈশ্বরের নিকট আরাধনা কর যেন দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা কদাচ প্রচার না হয় এইরূপ নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে মুরসিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল দ্বারী কহিলেক

তুমি কে কোথা হইতে আসিলা দূত আত্মপরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দেহ পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন সেইমত কার্য্য করিও দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজতক নিবেদন করিল মহারাজ মুরসিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে রাজা দ্বারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন দূতকে তোমার নিকট রাখ পত্র আনহ দ্বারী অতিশীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্মস্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিলেক রাজা সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবদীয় সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন বিস্তারিত সমাচার জ্ঞাত হইয়া হর্ষ বিষাদ দুই হইল হর্ষ হইল যাবদীয় পাত্র মিত্র ও প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা একত্র হইয়াছেন অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবেক বিষাদ হইল নবাব অতি দুরন্ত যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয় তবে জাতি প্রাণ যাইবেক এইরূপে মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন প্রচার কিছু করিলেন না কোন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দেহ আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট করিয়া দেহ।—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। ১৮০৫

রামমোহন রায়

১৭৭৪—১৮৩৩

বাংলা গদ্য

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে

করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় এহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।

বেদান্ত গ্রন্থ। ১৮১৫

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিকৃত হইয়াছে।" উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিকৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিকৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অরূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা হইয়াছে অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর

ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তির মস্তক, এই রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার। ১৮১৩

সহমরণ বিষয়

বলাৎকারে বিধবাকে দাহ করিবার দোষকে নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত ঐ বিংশতি পত্রের শেষে লিখেন, যে যে দেশে অত্যন্ত জলচ্চিতারোহণের ব্যবহার আছে, সে নির্ব্বিবাদ। যে দেশে তাদৃশ ব্যবহার নাই, কিন্তু মৃত পতির শরীর দাহকেরা যথাবিধানক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি চিতা সংযুক্ত করিয়া রাখেন, পরে সেই অগ্নির দ্বারা চিতা অল্পে অল্পে জ্বলন্ত হইতে থাকে, এই কালে স্ত্রী যথাবিধানক্রমে ঐ চিতায় আরোহণ করে, সেও দেশাচার প্রযুক্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, এবং দেশাচারের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার দুই তিন বচনও লিখিয়াছেন॥ উত্তর।—স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচার বলেতে ধর্ম্ম রূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এ রূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়। ইহার বিশেষ পশ্চাৎ লিখিতেছি। অতএব বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা এ সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এ রূপ স্ত্রীবধেতে এক দেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে, তথাপি বধকর্ত্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না, যে যে ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোনো বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্ম্মানুসারে যে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্র নিষিদ্ধ; যে জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্ম্মে গণিত কদাপি হয় না। স্কন্দপুরাণ। ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে॥ যে যে বিষয়ের শ্রুতি, ও স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই সেই বিষয়ে দেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক। যদি বল দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্ত্তব্য, এবং তাহা সৎকর্ম্মে গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী এই দুই দেশে চাতুর্ব্বণ্য লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহারদের কুলাচার এই, যে বিষ্ণুকাঞ্চীস্থেরা শিবের নিন্দা

করিয়া আসিতেছে, আর শিবকাঞ্চীস্থ লোকেরা বিষ্ণুর নিন্দা করে। অতএব দেশাচার কুলাচারানুসারে শিব নিন্দা ও বিষ্ণু নিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক ; যেহেতু প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে, যে দেশাচার কুলাচারানুসারে নিন্দা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোনো পণ্ডিতেরা কহিবেন না, যে তাহারা দেশাচার বলে নিষ্পাপ হইবেক এবং অন্তর্বেদের নিকটস্থ দেশ রাজপুত্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকী না হউক ; যেহেতু দেশাচারে ঐ ঐ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, এ রূপ অনেক উদাহরণ স্থল আছে, অতএব সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ দারুণ পাতককে দেশাচার প্রযুক্ত পুণ্যজনক রূপে কোনো পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন নাই।

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ। ১৮১৯

ঈশ্বর

পঞ্চম প্রশ্ন। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানা বিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণ দায়ক বিধানে স্থির পূর্বক গুরু করণীয় গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রী পুত্র ও বিষয় ভোগী ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতি আশ্চর্য আদৌ এমতে নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নাম রূপ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে একথা উত্তমা কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চ রচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরু বাক্য নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওয়া কি ক্রমে শুভ দায়ক বরং বোধ হয় যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন চলিত লৌকিক গুরু করণীয় দ্বারা লাভ কি।

ব্রাহ্মণ সেবধি। ১৮২১

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৯৪—১২৫৪

বাবু

বি, প্র, (বিদেশীর প্রশ্ন) মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে অনেক ভাগ্যবান্ লোকের নিকট কতকগুলিন লোক নিয়ত যাতায়াত করে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যায় বেলা দশ এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে এবং বৈকালে যায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় কালযাপন করে আব ইহাদিগের কেবল এই কর্ম্ম যে অনবরত বাবুর হাঁই উঠিলে তুড়ি দেয় এবং আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় ২ করে, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল লোক কোন কর্ম্মে পারগ কি, না, আর কোন শাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে কি, না, আর ইহারা যে যেখানে গিয়া থাকে সে নিয়ত তাহারি নিকট গমনাগমন করে, কি, সর্ব্বত্রই যায় এই তাহাদিগের কর্ম্ম, আমি ঐ সকল ব্যক্তির বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

ন, উ (নগরবাসীর উত্তর) আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অনেকের নিকটে লোক নিয়ত যাতায়াত করে বটে, যে সকল লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার লোক আছে কেহ ২ বাঙ্গালা পারসি ইংরাজী শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হইয়া ঐ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়, কোন বিষয়কর্ম্মের আশায় যাতায়াত করে, কেহ ভিক্ষা করিতে অতি নিপুণ কন্যা ভগিনীর বিবাহের ভারাক্রান্ত হইয়া তদুদ্ধার উপলক্ষে যাতায়াত করিতেছে, কেহ বাবুর সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত নিয়ত যাইতেছে মনোনীত কথা কহিতে ও কর্ম্ম করিতে তাহারা বিলক্ষণ পারগ, তাহারদিগের সঙ্গে লইয়া বাবু স্থান বিশেষে গমন করেন, লোকে তাহাদিগের কহে ইহারা অমুক বাবুর মোসাহেব ইহাতে তাহারা মহা আনন্দিত থাকে এবং তাহার মধ্যে দুই চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন তাঁহারা কখন শাস্ত্রবিচার করেন, কখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও শুনেন, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারাও উপাসনার পারদর্শী হইবেন, কোন ২ ব্যক্তির গান বাদ্যাদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, বাবুর যখন তদ্বিষয়ে বাঞ্ছা হয় তখন তাহারা তদ্দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করেন কতকগুলিন লোক আছে তাহারা মিথ্যা গল্প করিতে ও লোকের কুৎসা প্রকাশ করিতে

বিলক্ষণ নিপুণ তাহারা সময়ানুসারে বক্তৃতা করে, আর এ সকল লোক একজনার নিকট নিয়ত যাতায়াত করে এমত নহে পাত্র বিশেষে অনেকের নিকট যায়, এক্ষণে আপনার ব্যাকুলচিত্তকে সুস্থ করিয়া আমাকে অনুকূল হও।

কলিকাতা কমলালয়। ১৮২৩

অথ উপদেশারম্ভ নব বাবু

মনিযা বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব তুমি যেরূপে এ লক্ষণাক্ত হও তাহা বলি। প্রথম এক কথা, যে সকল ভট্টচার্য্যেরা আসিয়া থাকে তাহাদিগের সহিত বড় আলাপ করিবা [না] তাহারা কেবল প্রতারক কতকগুলিন শ্লোক পড়ে তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না, বুঝাইতেই পারে কেবল সর্বদাই টাকা দাও ২ এই কথা বই আর কোন কথা নাই অধিকন্তু লজ্জা ভঙ্গ মাত্র আর যদি দুই তিন ব্যক্তি একত্র হয় তবে এমত বিরোধ উপস্থিত করে যে সে স্থানে থাকা ভার হয়, আর ঐ হতভাগ্যদিগের বাক্যে কর্ণ জ্বলে যায়। আমার পিতা যাবৎ বর্ত্তমান ছিলেন তাবৎ ও পোড়ায় বিস্তর পুড়িয়াছি; যে দিবস তাহার শ্রীশ্রী৺ প্রাপ্তি হইল সেই দিবসাবধি শ্রীশ্রী৺ আমাকে সুস্থির করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাকে উহারা যখন কহিলেক বাবু শ্রাদ্ধের ফল কি। কহিলেক তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়; আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক, এক্ষণে তাহার সহিত সম্পর্ক নাই, ইহাতে যদ্যপি শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তুমি না কর কেন। আর যে ব্যক্তি অপূর্ব্ব সুশীতল নির্ম্মল জলে স্নান তৎপান মিষ্টান্ন ভোজন বিচিত্র বসনভূষণ পরিধান যানবাহনাদ্যারোহণ বারাঙ্গণাদি সেবন করে, সেই ব্যক্তিরি তৃপ্তি হয় নতুবা এক ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করিলে অন্য ব্যক্তির সুখ না হয় কেন, এবং কোন কালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসজল খাইয়া থাকে। হা বিধাতার কি বিড়ম্বনা, তোমাদিগের কিছু বুদ্ধি দিলেন না। কেবল চিরকাল পড়িয়ে মরিলে, শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা কিছুই জানিলে না। এ সকল কথার উত্তর কিছুই না দিতে পারিয়া কতকগুলি মিথ্যা পাচালমাত্র পাড়িলেন। শেষে কহিলেক বাবুজী আর কিছু কর না কর, কিন্তু পিণ্ডদানটা করা আবশ্যক। তাহাতে কহিলাম আমি অন্য উত্তম বুদ্ধিমতী পরধার্ম্মিকা

বকনাপ্যারী প্রভৃতির নিকট যাইব। তাহারা যেরূপ বলিবে তাহাই করিব। মহাশয় তাহারা আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর; আমাকে কহিলেক তুমি এক কর্ম্ম কর, বিষ্ণুপুরে জনেক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দেও শ্রাদ্ধ দশ পিণ্ড ব্রাহ্মণভোজনাদি যত কর্ম্ম সেই করিবেক। আমি ঐ বিষ্ণুপুরে এক ব্রাহ্মণ আনিয়া ৫ টাকা তাবৎ কর্ম্ম ফুরাইয়া দিলাম, বশ নিশ্চিন্ত হইলাম কোন উৎপাত নাই, স্বচ্ছন্দে দিব্য ধুতি পরিয়া চাদর দোলাইয়া একলাই এক পাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই। তথাচ ভট্টাচার্য্যগুলান ছাড়ে না!

নববাবুবিলাস। ১৮২৩ (?)—১৮২৫ (?)

ফুলবাবু

ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন [মন] খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি; খলিপা কহিলেন, কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব; কিন্তু পাঁচ শত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সংপ্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকির করহ; খলিপা কাপ্তেনি আফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুইজন দালাল আসিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন, পাঁচ শত টাকা; দালালেরা একে হনুমান, তাহাতে যদি আজ্ঞা পান, তবে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান, মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, দালালেরা কহিলেক মহাশয় অভাগা অজা পাইয়াছি, পাঁচ শত টাকা চাহে, মহাজন কহিলেক তাহার নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটী কোথা, দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ও সকল কথার প্রয়োজন নাই। আপনকার জ্ঞানেও এমন শিকার পান নাই। ইহার নাম জগদ্দুর্লভ বাবু,

পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ। হরেক রকম সওদাগিরি আছে বেলেঘাটায় চুণের গোলা, জকৃসনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সরদারি প্রায় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক।

নববাবুবিলাস ১৮২৩ (?)—১৮২৫ (?)

অথ দ্রব্যের বিবরণ

বিলাতি ছিপ সুতাদি মৎস্য ধরিবার তাম্বু তাকিয়া কণাৎ বিবিধ প্রকার বিছানা দুলিচা গালিচা আদি শোভাযুত আতরদান গোলাপপাশ রৌপ্য-বিনির্ম্মিত আলবোলা গুড়গুড়ি আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বুরি প্রধান দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত এলাচি লবঙ্গ পান মসলা শত শত খাদ্য মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজাগজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাদামতক্তি আতা অনুপম, বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুত্তম। জনায়ের রসকরা মুড়্কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি ফরাসডাঙ্গার ধনেখালির খৈচুর শান্তিপুরের মোয়া, বর্দ্ধমানের ওলা, বীরভূমের নবাত মেওয়া। এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য আয়োজন খলিপা করিলেন অতিতুষ্টতম মন॥

তৎপরে ভৃত্যগণের নিরূপণ, খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুকাবর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার ইহারদিগের ঐ সকল দ্রব্যাদির সহিত বাগানে পাঠাইলেন। অনন্তর খলিপা গায়েন গুণি জনকে দুই জন মোছাহেবদিগকে বাগানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাবু দুই চারি জন এয়ার সঙ্গে লইয়া অপূর্ব্ব চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসা গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুভাষিণী নিবিড়নিতম্বিনী বারাঙ্গনাপ্রধানা বকনাপেয়ারি কোঁকড়াপেয়ারী দামড়াগোপী ঝানঝাড়া রাধামণি ছাড়ুখাগি মনি জয়াবিবি প্রভৃতি আপন ২ সহচারিণী অর্থাৎ ছুকৃরী সঙ্গে লইয়া খলিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন॥

নববাবুবিলাস। ১৮২৩ (?)—১৮২৫ (?)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২—১৮৫৯

ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।" —তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।" ভারত বলিলেন "মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় "চণ্ডী" রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক প্রস্তুত কর।" সেই আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল "পালা" ভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষপরবশ হইয়া কহিলেন "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।" পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয় এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।—এই চারু গ্রন্থের পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একই পুস্তক, কেবল রসমঞ্জরীখানি স্বতন্ত্র।

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত। বাং ১২৬২

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৩—১৮৮৫

ভূসুরের পত্র

সেপাহীদিগের খণ্ড প্রলয়ে আমি তো ত্রাহি ত্রাহি করিয়া বারণসীধাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। পৌরাণিকেরা বলেন কাশিধামের মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অপর পঞ্চত্ব লাভেই অমৃতত্ব লাভ "স্যুরমৃতং যস্যাং মৃতা জন্তবঃ" কিন্তু আমার তেমন অমৃত ভোগের বড় স্বাদ ছিল না সুতরাং গোপনেই পটল তুলিয়াছিলাম। পরে মহাবিপদে পড়িয়া সাক্ষাৎ কালভৈরব যোধাদিগের হস্তে বারম্বার পতিত প্রায় হইয়াছিলাম। অনন্তর পাণ্ডু তনয়গণের ন্যায় কিয়ৎকাল অজ্ঞাত প্রবাস পূর্ব্বক পাণ্ডুবর্ণাস্য হইয়া অবশেষে জগৎপাতার কৃপায় প্রাণে ২ স্বদেশপ্রাপ্ত হইয়াছি। বহুকাল প্রবাসে থাকায় আমি জন্মভূমিতেও প্রবাসীবৎ হইয়াছি। নগরের মধ্যে বাসা করিয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল সত্যকামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি শুনিয়া থাকিবেন তাঁহার সহিত আমার বালসখিতা ছিল। একদিবস দিবাকরের উদয়াচলাবলম্বনের অব্যবহিত পরে মান্দ্য ও শৈত্য প্রযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বহন হওয়াতে আমি গ্রাম পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম রাজমার্গের পার্শ্বে একটী অট্টালিকার দ্বারে সত্যকাম দণ্ডায়মান আছেন। উঁহার মতান্তরের কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মহর্ষিগণের নামে উঁহার আর শ্রদ্ধা নাই এবং বেদবিদ্যার বিনয় বচনেও আস্থা নাই। উঁহার উক্তি শুনিবা? বলেন কি—"বেদবিদ্যার আবার বিনয়? হৈতুক শাস্ত্রের তীক্ষ্ণধার খড়্গের চোটে পড়িতে চাহেন না। আচ্ছা, নিজ গর্ব্ব খর্ব্ব করুন, জগৎ শাসনের অভিমান পরিহার করুন, তবে কিছু বলিব না, বিপক্ষ শরণাগত হইলেই শস্ত্রকে কোষ গত করিয়া অভয় প্রদান করিতে হয়। স্পর্দ্ধা ও অভিমান সত্ত্বে শরণ চাহিলে সে তো বিনয় বচন নহে, সে গর্ব্বোক্তি। তবে বেদকে কি প্রকারে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে?"

পশ্চিমে তো কালভৈরব তিলঙ্গেরা শস্ত্র চালনা করিতেছেন, আমরা মৎস্যাহারী বাঙ্গালী, শস্ত্র চালনা ক্ষম নাহি, অতএব শাস্ত্র চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলে শস্ত্রচালনায় সেপাহী মহাশয়েরা যেমন চিরপরিপালক রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষা করেন নাই অস্মদীয় শাস্ত্রিরাও তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রের বড় সাপেক্ষ হয়েন নাই। সেপাহীদিগের ব্যাপার তো আপনকার

অগোচর নহে, স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন, তবে কোবিদ্‌বর্গের কিঞ্চিৎ কীর্ত্তি কহি, শ্রবণ করুন।

ষড়্‌দর্শন সংবাদ। ১৮৬৭

সংবাদ পত্র

১৮১৩—১৮৩৯

স্ত্রী শিক্ষা

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাঁহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচারণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ঐ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়েরা অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখন ভরসা করি না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা তাঁহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাঁহারদিগের অপেক্ষা আমরা জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ইহা করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক।

সম্বাদ সুধাকর—১৮৩১

যাত্রা

অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড

দেশজাত তাবল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় ভ্রস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্পকালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকেরা নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহাদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়র কোন কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলের সিজর বা সেক্সপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্ম্মি ও স্বমতযাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্যসকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন সে যাহউক অস্মদ্দেশীয়কর্ত্তৃক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারি মহাশয়েরদের কর্ম্ম যে সফল হইবে এমত আমারদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য।

সমাচার দর্পণ—১৮৩২

বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ

বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিকবাবুর সেনা-শিক্ষক খলীপাদিগকে বার ২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিকবাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

সমাচার চন্দ্রিকা—১৮৩৪

বেলুন

গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চর্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পালকি নৌকাতে ও পদব্রজে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাঁহারা বেলুন যন্ত্রে আকাশে গমন অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদুর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিখিয়া কার্য্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সম্বাদ সকল কাগজেই ব্যক্ত আছে কিন্তু উর্দ্ধে উঠিয়া কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই কেহ ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রাবর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দুরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ়

বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা কহেন এসকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রাবর্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুত রবার্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন পূর্ব্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজেরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদিগের বুদ্ধির কৌসেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্যকার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

জ্ঞানান্বেষণ—১৮৩৬

কন্যাবিক্রয় কাহিনী

এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল

কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতেরা প্রথমতঃ পাঁচ-শত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

জ্ঞানান্বেষণ—১৮৩৭

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া প্রকাশ করিতেছি যে কোঁচবেহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজবংশীয় নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই রাজা সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল তন্ত্রের মতে করিতেন কেবল শিবপূজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজা হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাঁহার হিন্দুর ব্যবহার কিছুই ছিল না এবং বিবাহ করণেতেও জাতীয়বিচার করিতেন না যে কোন জাতির কন্যা সুন্দরী জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ ঐ বিবাহ পাগল রাজার এমত বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোককেও বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া রাণীপালের মধ্যে রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাঁহার ১২০০ রাণী এইক্ষণেও বর্ত্তমান আছেন। অর্দ্ধ কোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন ২ স্থানে রাণীরা বাস করেন ঐ দুর্গের মধ্যে অনেক বিচার-স্থল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত ফৌজদারী রাণীরাই করেন ১২০০ শত

রাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী রাণী রাজার অতি মান্যা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারূঢ় কালীন রাজ মহিষী আগতা হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু রাজাকে দেখিয়া মহিষী গাত্রোত্থান করিতেন না কোঁচবিহারী রাজবংশের মধ্যে এই রীতি পুরুষানুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমেতেও বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাঁহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল না কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়া অন্তপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাপন করিয়াছেন তাঁহার রাজশাসনের ভার মন্ত্রিরদের হস্তে অর্পণ ছিল অতএব রাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ কার্য্য মন্ত্রিরাই করেন এই রাজার দুই পুত্র আছেন জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইবে।

সম্বাদ ভাস্কর (ইংলিশ ম্যান)—১৮৩৯

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪—১৮৮৩

তামাসা ফষ্টি

বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাট্‌কা টাট্‌কা রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট—একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।

মতিলাল ও তাহার সঙ্গীরা নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল কিন্তু কোন্ লীলা যে শেষ লীলা হইবে, তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণা দিন ২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক২ রকম আমোদ দুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে, আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছটফটানি উপস্থিত হয়। এইরূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে এক২ জনকে এক২ টা নূতন ২ আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্য একদিন হলধর দোল-গোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বাটীতে ঔষধ প্রস্তুতেক্ষ

ধূম লেগে গিয়াছে—কোনখানে রসাসিন্ধু মাড়া যাইতেছে—কোনখানে মধ্যম নারায়ণ তৈলের জ্বাল হইতেছে—কোনখানে সোণা ভস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুড়ুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমিদার বাবুর বাটীতে একটি বালকের ঘোরতর জ্বরবিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগীর এখন তখন হইয়াছে তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতযশ—অনুমান হয় মাতব্বর২ ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতগুলিন নব বাবু নিকটে ছিল তাহারা বলিয়া উঠিল—আস্তে আজ্ঞা হউক২ কবিরাজ মহাশয়! আমাদিগকে বাঁচাউন—দোলগোবিন্দ দশ পোনের দিন পর্য্যন্ত জ্বরবিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে দাহ পিপাসা অতিশয়—রাত্রে নিদ্রা নাই—কেবল ছটফট করিতেছে,—মহাশয় একছিলিম তামাক খাইয়া ভাল করিয়া হাত দেখুন। ব্রজনাথ রায় প্রাচীন, পড়াশুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোচ—দাদা যা বলেন তাইতেই মত—সুতরাং স্বয়ং সিদ্ধ নহেন, আপনি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দন্ত নাই, কথা জড়িয়া পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে গিয়াছে কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না। রোগীর হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন—কবিরাজ মহাশয় যে চুপ করিয়া থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, রোগীও এক২ বার ফেল২ করিয়া চায়—এক২ বার জিহ্বা বাহির করে—এক২ বার দন্ত কড়্‌মড়্‌ করে—এক২ বার শ্বাসের টান দেখায়—এক২ বার কবিরাজের গোঁপ ধরিয়া টানে। রায় মহাশয় সরে২ বসেন, রোগী গড়িয়া২ গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করে। ছোঁড়ারা জিজ্ঞাসা করিল—রায় মহাশয়? এ কি? তিনি বলিলেন—এ পীড়াটি ভয়ানক—বোধ হয় জ্বরবিকার ও উল্বণ হইয়াছে। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে আরাম করিতে পারিতাম, এক্ষণে শিবের অসাধ্য। এই বলিতে ২ রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডূষ তৈল মাখিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে ছ বুড়ির ফলে অমিত্তি হারাইতে হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি

বোতল লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন। সকলে বলিল—মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন—উল্বণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়, এক্ষণে রোগীকে এস্থানে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিট্টান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ২ দৌড়ে যাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—নব বাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে২ গঙ্গাতীরে আসিল। দোলগোবিন্দ নিকটে আসিয়া কহিল—কবিরাজ মামা! আমাকে গঙ্গায় পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা—এসো বাবা! এক্ষণে তোমাকে অন্তর্জলি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে২ মত ফেরে। আবার কিছু কাল পরে বলিল—আর আমাকে গঙ্গায় পাঠাইবে? যাও বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে যাও, কিন্তু তেলের বোতলটা দিয়ে যাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রগ্‌রগে তেল মাখিয়া ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া গঙ্গায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলেই বাঁচি, এই ভাবিয়া পা বাড়াইতেছেন—ইতিমধ্যে হলধর সাঁতার দিতে২ চীৎকার করিয়া বলিল—ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পান দুই রসাসিন্ধু দিতে হবে—পালিও না। বাবা! যদি পালাও তো মামিকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ডিপেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ২ করিতে২ বাসায় প্রস্থান করিলেন।

আলালের ঘরের দুলাল। বাং ১২৬৪

মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে

দে পাক—দে পাক—ডেডাং ডেঙ্গাং ডেং ডেং। চড়ুকের পিট চড়২ করে তবুও পাদুটী নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক২ বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গল গলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল করূছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে২ এদিক ওদিক পড়্‌ছে, তবু বলে—ঢাল ২। চড়কের পর চড়ুকেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, এসে বৎসর আর সন্ন্যাস করূব না, কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড়২ করে। সেইরূপ

মাতালও মদ খেয়ে বড় ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটু২ লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ট ভর্ৎসনায় মনে২ শপথ করে দূর কর এ কর্ম্ম আর করব না, কিন্তু লাল জল দেখ্‌লেই প্রাণটা অমনি লাফিয়া উঠে—বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম—প্রথম২ আমড়াগেছে রকম এক২ বার বলে, না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপথ পাঁদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকে।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। ১৮৫৯ (?)

পক্ষিদল

আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটী একটী ঢাকাই জালা—নাকটী চেপ্‌টা—চোক দুটি মৃদঙ্গের তালা—হাঁটী বোড়া সাপের মত দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক্ চিক্ করিতেছে—গোঁপ জোড়াটী খ্যাঙ্গরার মুড়া, ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী২ বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্টা জঙ্গলা গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লিকে কম্পিত করেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর—সে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটী বড় টেঁকাল, হাসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগন মণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না। যে সকল লোক ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হয়, তাহারা প্রায় বিষয়কর্ম্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিষয়ে ডঙ্কেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া কামান পড়িত, অমনি গঙ্গায় পড়িয়া ধাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুতে চিবুতে সম্মুখে দুইখান দফ্‌তর সাজাইয়া কিস্তির কর্ম্ম করিতে বসিতেন—দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বব্বলিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা ঘাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন, পরে নানা প্রকার গল্‌তি কর্ম্মের বেনাকারি তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন। আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড্ডার খরচ চলিত—আগড়ভম স্থূলত্ব প্রযুক্ত নিজে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হস্তের দফায় প্রায় অচল হইয়া-

ছিলেন, সুতরাং ডঙ্কেশ্বর তাঁহার চক্ষু স্বরূপ হইলেন। যদিও তাহার চর্ম্ম চক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদ্রিত থাকিত, তথাচ মনচক্ষু ডঙ্কেশ্বরের আগমনের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডঙ্কেশ্বর কখন ডঙ্কা না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল। পক্ষির দলের আর২ পক্ষীরাই সর্ব্বদাই ডানা ধরিত। চরস গাঁজা গুলি ছর্‌রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহুমূল্য সুধা কোথা হইতে আসবে? সুতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত—প্রথম তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফুলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমে২ দান সাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষী সকল বোধ করিত, তাহারা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে—সপ্ত লোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক২ জন পড়িতে২ উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা কর কি, একটু থাম এই ঝুলনটা বাদে যেও।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। ১৮৫৯ (?)

রাত্রি

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর নিস্তব্ধ। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ুর সংহারক ভাবে প্রচণ্ড ও বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অট্টালিকাদি দোদুল্যমান। নদীর সলিল কল২ রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু চূড়ার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—মধ্যে২ তড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, বজ্রের ঝন্‌২ শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাহিরে যাইতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময়ে ঘটে?

রামারঞ্জিকা। ?

বিদেশী শিক্ষা

যদিও রাগরাগিণী সময় অনুসারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্র করে।

বনওয়ারী ভোজনান্তে নিদ্রা না যাইয়া কদম্বতলে তাকিয়া ঠেসান দিয়া

"মিয়া মল্লা রি, না, তা, না" দ্বারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি এক সুরো, খরজে পূর্ণ। দুই এক মাগি জলের কলসি লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আওয়াজ শুনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগেমেগে বলিলেন,—"যাও তোমরা কি তামাসা পেলে?"

ক্রমশঃ অন্যান্য বাবুরা উপস্থিত হইলেন।

ক। কালেজে ও স্কুলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী পড়িতেছে, তাহারা তোতাপাখী অথবা টিয়ে পাখীর ন্যায় বাঁধাগত 'রাধাকৃষ্ট বল' পড়িতেছে, কেটে ছিড়ে উঠ্‌তে পারে না। মস্তিষ্কেতে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান শক্তি ও অন্যান্য বৃত্তির চালনা অল্প ও ধর্ম্মভাব সামান্য, অনেকেই নাস্তিক—অনেকে কমিটির মত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মরা আস্তিকতার বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আসল ধর্ম্মভাব কোথায়? অনেক স্থলে নাম মাত্র। এই ধর্ম্মভাবের বিরহে পরিবারের উন্নতি হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহা অনুকরণীয়। অন্তর ভাবের উদ্দীপন অল্প, বাহ্য পরিচ্ছেদ ও বাহ্য প্রণালীর জন্য অধিক আলোচনা। আর এক আক্ষেপের বিষয় এই সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অধিক অভাব। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিপদে পড়িলে কয়জন তাহার জন্যে কাতর হয় বা সাহায্য করে? এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি ধন্য—একজন বিপদ বা ক্লেশে পতিত হইলে সমস্ত জাতি শুনিবামাত্র একমনা হইয়া তাহার সাহায্য করে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে এস্থলে বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এ পিশাচভাব ধর্ম্ম অনুশীলন অভাবে হইতেছে। পূর্ব্বে সুহৃদ্‌ভাব ও পরহিতভাব অধিক ছিল। তাহা এক্ষণে কোথায়? বাহ্য আড়ম্বরে অধিক অনুরাগ। পূর্ব্বে সকলে গুরুজন ও প্রাচীনদিগকে অভিবাদন ও সম্মান করিত। এক্ষণে ছোঁড়ারা এক নমস্কার ঠোকে—নমস্কার সমানে সমানে চলে। এটি অহংতত্ত্বের চিহ্ন।

আধ্যাত্মিকা। ১৮৮০

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮১৭—১৯০৫

ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।" ব্রহ্ম আমাকে

পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ, সকল সুখ পাইয়াছি; ক্ষণকালের নিমিত্তে যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এতদিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" কে বা শরীরচেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশে আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি; অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয় থাকিবার আশা করিতেছি; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব। তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমারদের জন্য ধর্ম্ম অর্থ সুখ নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি মানুষের কার্য্য? তাঁহাকে কেনই বা ত্যাগ করিব? তাতে কি আমারদের মঙ্গল হইবে? এখানে আমারদের কি যন্ত্রণা নাই, সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই; আমারদের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে, সেই অভয়পদকে আশ্রয় করিতে হইবে না? এখানে কি পাপতাপ নাই যে সেই পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্তশিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কি আমারদিগকে শীতল করিবে? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয়দান করিবে? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমারদের মঙ্গল হয়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমারদের ধর্ম্মকার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—সুখভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখানে যাঁহারা এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেবল শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই বৃথা। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাঁহারদের আর কি হইল? তাঁহারদের হৃদয় যদি উন্নত না হয়, ঈশ্বরানুরাগে প্রজ্বলিত না হয়; বিষয়কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে; তবে এখানে আসিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও

শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন ? ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে ? যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্নপানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্নদাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন ? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে ? ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে ? সেই মঙ্গলময়কে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে ? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। ১৭৮২ শকাব্দ

জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব

আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি

উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার অবির্ভাব ? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই ? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্রতারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলস্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আর কোথায় দেখিবে ? মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই কি কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে, পশুরাজ্যের মধ্যেই কি কেবল তাঁহার প্রকাশ দেখিবে ? মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না ? ধর্ম্মাত্মার অনুরাগরঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না ? ঈশ্বরপ্রেমী প্রসন্নহৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন ; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব, দেখিবে না ? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এ প্রকার আবির্ভাব নাই। এই-সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার। তাঁহারদের ধর্ম্মসাধন কি কঠোর ! তাঁহারদের হৃদয় কি কোমল কি পবিত্র ! সেই অমৃতের প্রিয় আবাসস্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট।

এমন আর কোথাও নাই। আকাশে নাই; পৃথিবীতে নাই; সমুদ্রে নাই। ব্রহ্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। যেখানে এই-সকল পুণ্যাত্মারা একাসীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান—এখানে তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মারই আবির্ভাব রহিয়াছে। এখানকার আলোক-কিরণে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি জনের হৃদয়ে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপে এবং প্রসন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এখানে যখন তাঁহার আবির্ভাব অদ্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি ও তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ় রূপে অনুভব করিতেছি; তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতিপুষ্প প্রদান কর এবং দুর্লভ্য মনুষ্য জন্মকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। ১৭৮২ শকাব্দ

আমার জীবন কাহিনী

আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জন ইহাকে মলিন ও কুলষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার

শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ বাণী শুনিলাম—"তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণ্য-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম—ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড় করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়। এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম। তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃদ্‌কম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকুম। "হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই।" আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি?

প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে—"এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।" প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক; আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।

১লা কার্ত্তিক বিজয়া দশমী, শিমলার বাজারে সদর রাস্তায় আমার ঝাঁপান, দোলা, ও ঘোড়া সকলই প্রস্তুত। আমার চারিদিকে আমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতি দুঃখের সহিত আমাকে বিদায় দিলেন। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝাঁপানে চড়িয়া প্রস্থান করিলাম। বিজয়া দশমীতে আমার শিমলা হইতে বিসর্জ্জন হইল। পাহাড়ের পথে নামিতে বড় সহজ। শীঘ্রই পর্ব্বতের পাদদেশ কাল্‌কাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে শোভাময় সূর্য্যোদয় দেখিলাম, তাহার সঙ্গে আমার মনও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাল্‌কা ছাড়িয়া পঞ্জোরে আইলাম। এখানে একটা বাগানে বড় সমারোহ দেখিলাম। বাগানের শত শত ফোয়ারা সব খুলিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ যেন নব জীবন পাইয়া উল্লাসে জল উদ্গীরণ করিয়া অনবরত জলধারায় বর্ষা ঋতুর অনুসরণ করিতেছে। ফোয়ারার এমন শোভা পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখি নাই। এখান হইতে আম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ি ভাড়া করিলাম এবং তাহাতে চড়িয়া দিন রাত্রি চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ি হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ির পাশে পাশে ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগের নিরাপদের জন্য গাড়ির সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছুটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার মনে মনে কিছু

শঙ্কা হইল। বেলা দুই প্রহরের সময় কানপুরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ঘোড়া বদলাইবার জন্য আমার গাড়ি থামিল, দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তাম্বু পড়িয়াছে ও লোকের বিস্তর ভিড় এবং সেখানে একটা বাজার বসিয়াছে। কিছু খাদ্যের জন্য কিশোরীকে পাঠাইলাম, সে সেখান হইতে আমার জন্য মহিষের দুগ্ধ আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কিসের বাজার? বলিল,দীল্লির বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার। শিমলাতে যাইবার সময়ে ইঁহাকে যমুনার চরে সুখে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আজি আসিবার সময়ে ইঁহাকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দি হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? শিমলা হইতে বিপদসঙ্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কানপুরে উপস্থিত হইলাম। এখন এখান হইতে রেলপথ খুলিয়াছে। শুনিলাম, প্রাতে ছয়টার সময়ে গাড়ি ছাড়িবে।' আমি ভোরে উঠিয়া একটু চা পান করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশণে পঁহুছিলাম। সাতটা বাজিয়া গেল, কিশোরী ষ্টেশণ হইতে আসিয়া বলিল যে "টিকিট পাওয়া যাইবে না। আজ গাড়িতে দীল্লির ফেরত আঘাতী সৈন্যেরা যাইবে। অন্যের জন্য তাহাতে জায়গা নাই।" আমি নিজে অনুসন্ধানের জন্য ষ্টেশণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একজন বাঙ্গালী ষ্টেশণ মাষ্টার আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি? ওরে গাড়ি থামা, থামা। আমি মনে করিয়াছিলাম আর কেউ!" সে বলিল "আপনাকে আমি টিকিট দিতেছি এবং আমার ক্ষমতা আছে আমি গাড়ি থামাইয়া আপনাকে উঠাইয়া দিতে পারিব। আমি আপনার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পুরাতন ছাত্র। পরীক্ষায় আমাকে কতবার পুরস্কার দিয়াছেন, আমার নাম দীন নাথ।" সে আমাকে টিকিট দিল, আমি কাপ্তান সাহেবদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কানপুর ছাড়িলাম। বেলা তিনটার সময় এলাহাবাদে পঁহুছিলাম। তখন তথাকার ষ্টেশণ নির্ম্মিত হয় নাই, পথের মধ্যে একটা স্থানে গাড়ি লাগিল, আমরা সেখান হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। তিন ক্রোশ দূরে এলাহাবাদের ডাক বাঙ্গালা পাইলাম, সেখানকার ঘর সব লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি সে বাঙ্গালায় আর স্থান পাইলাম না। আমার সঙ্গে একটা চৌকী ছিল, একটা বৃক্ষতলায় জিনিস পত্র রাখিয়া সেখানে সেই চৌকীতে আমি বসিলাম। কিশোরী ডাক বাঙ্গালা হইতে আমার জন্য এক কুঁজা জল আনিল। আমি

কিশোরীকে বলিলাম যে, তুমি এলাহাবাদ সহরে যাইয়া আমার জন্য একটা বাড়ী ঠিক্ করিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, বাড়ীতে না উঠিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না। কিশোরী চলিয়া গেল। পরেই একখানা গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। গলায় কাচা বান্ধা দুইজন লোক তাহা হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, "কেল্লার নিকটেই আমাদের লাল কুঠি। যদি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সেখানে থাকেন, তবে আমরা বড়ই কৃতার্থ হই। আমাদের এখন পিতৃদায়।" আমি তাহাদের সঙ্গে সেই লাল কুঠিতে গেলাম। তাহাদের ঠাকুর-সেবা ছিল, আমার জন্য সেখান হইতে ডা'ল আর রুটী সন্ধ্যার সময়ে আসিল। আমার তখন অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। সে ডা'ল আর রুটী আমার বড়ই সুস্বাদু লাগিল। আমি তাহা তৃপ্তিপূর্ব্বক সব খাইয়া আরো প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কিন্তু কেহই আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না। আমি সে দিন ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ খাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত। ১৮৯৮

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০-১৮৮৬

হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায় বক্তৃতা

এইক্ষণে ভরসার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করিবেক, এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যে উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায়? নদীর স্রোত স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্ব্বতশিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ু-প্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকার অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়াল ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ

রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য্য ; এবং শরীর, বুদ্ধি সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে এদেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য্য অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম, অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন ? এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ চন্দ্র ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ, এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনারদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা লাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি ?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী কোন্ মহাত্মা—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এইরূপে এদেশের জ্ঞান

বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যা রূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারি, তাহা পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিপদ্‌গ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিত কার্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার দ্বারা কেবল বিদ্যারত্নের অধিকারী হয়েন নাই, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সর্ব্বদা লালিত হইয়াছিলেন। আহা, তাঁহার মনের ভাবকে চিন্তা করিলে চিত্তে কি আনন্দের উদয় হয়! যখন আমারদিগের উপকারে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল, তখন তাঁহার চিত্ত দয়াতে কি পরিপূর্ণ হইয়াছিল! যখন তিনি সকল প্রতিবন্ধক মোচন করিয়া তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম দেখিলেন, তখন কি আশ্চর্য্য মনোহর সন্তোষ তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছিল! যখন তাঁহার বাসনাবৃক্ষ যথেষ্ট রূপে ফলবান্ হইল, তখন তিনি আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া কি মহানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন! তিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমারদিগেরই উপকার করিয়া এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব!—তাঁহার কি প্রকার ধন্যবাদ করিয়া তৃপ্ত থাকিব!

শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা। ১৮৪৫

স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম, "দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূ-মণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "তুমি যথার্থ বিবেচনা

করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্ম-শীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্বপরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয়বেশধারী অভিমান স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্র ভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহৎ শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে! তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর। একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেক। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূল-কায় হইয়া উঠিল আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি, জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্যতরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতি প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এ স্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতিপ্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দল বল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমত পরিশুদ্ধ পুণ্য-ধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ

ভুরি ভুরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘনপল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমাসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশ ভূষা কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে, উহার নাম কপটতা।"

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুঃখতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদুঃখ নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুইজন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচনা বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া ধৈর্য্য তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জনে ইঁহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইঁহার নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রত সুশীলা স্ত্রী, এবং অন্য পার্শ্বে

এক বহু পরিশ্রমী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন ; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে যত আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি, পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখ-শ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রতীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দ প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব-কন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইঁহারা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাস-ভূমি; ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম

ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবন-বিখ্যাত। ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।

বিদ্যা-দেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর-মারুত-সেবিত যমুনাকুলেই রহিয়াছি।

চারুপাঠ। ১৮৫৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২ -১৮৯১

পরিশ্রম-অধিকার

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস এবং বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না: এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা

প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয়; তাহার কত অপমান; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয়; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

বোধোদয়। ১৮৫১

আলেখ্য দর্শন

লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি! এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পনখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া, ম্লান বদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা, নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চরণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতিধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি

স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্ম্মবেদনা-প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখে এইসকল কথা শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন? রাম বলিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন; এবং, বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আর্য্য! এ দিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ-মুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমলসকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন স্বরে গান করিয়া করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক একবার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নব জলধরমণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

সীতার বনবাস। ১৮৬০

মাতৃভক্তি

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি যে উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া

রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে, আমায় লালনপালন করিয়াছেন; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে, এ বয়সে পরিশ্রম করিলে অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম্ম সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া, কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ পুস্তক পড়িয়া, স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের

অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

আখ্যান মঞ্জরী (১ম)। ১৮৬৩—৬৪

প্রভাবতীসম্ভাষণ

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতি ক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে—

১। যেন, তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' (১) বলিয়া, করপ্রসারণপূর্ব্বক, কোলে লইতে বলিতেছ।

২। যেন, তুমি, উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ।

৩। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া, প্রফুল্ল-বদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ।

৪। যেন, তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'মাগী শোলো' (২) বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।

৫। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্য বদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩)।

(১) নেনা

(২) মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম, তদনুসারে, তুমিও মাগীশব্দে আত্মনির্দ্দেশ করিতে। তোমার এই দৈনন্দিন মঞ্জুল শয়নলীলা নয়নগোচর করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।

(৩) তুমি, এই নিয়মিত কৃত্রিম ঝগড়ার সময়ে, এরূপ বাক্যবিন্যাস, ও অঙ্গসঞ্চালনাদি

৬। যেন, আমি, বিকালে, বাড়ীর ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি, ক্রোড়ে বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ; এবং জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারী দিবামাত্র, তুমি 'দুখুনি (৪) দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা আমার মুখ হইতে সুপারী বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ।

৭। যেন, তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্ব্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব।' আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, না আমি লাফাব? তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ্‌ দিখি মা, আমার কথা শোনে না (৫)।

৮। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভালবাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। তুমি, তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভাল বাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি' (৬), এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালন-সহকারে, বারংবার বলিতেছ (৭)।

করিতে, যে তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরেরও হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও অননুভূতপূর্ব্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার এত মধুর ও এত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত, যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, অনেকে তৎপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন।

(৪) দুখানি।

(৫) তুমি এমন ভীরুস্বভাবা ছিলে, যে কখনও, সাহস করিয়া, গাড়ীতে চড়িতে পার নাই; এবং, সেই ভীরুস্বভাবতাবশতঃ পড়িয়া যাইবার ভয়ে, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে, আমায় সাবধান করিয়া দিতে।

(৬) ভাল বাসিবি, ভাল বাসিবি।

(৭) এই বিষয়ে, এক দিনের ব্যাপার মনে হইলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ীর ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া, আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না।' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি,' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, 'না ভাল বস্‌বি', এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্ত্তিহীন বদনে, 'তুই

৯। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না, বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এইরূপে, আমি, সর্ব্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে, এক দিন, দিবাভাগে আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণ কালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্ম্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সে দিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমায় কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে তোমার অদর্শনে কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু, কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্ব্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্য্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে

ভাল বস্‌বিনি, আমি বস্‌বো', এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরস সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি, এই চিরস্মরণীয় ব্যাপার, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।

স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছ, অস্নেহ বা অনাদর কাহাকে বলে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

*　　*　　*　　*

বৎসে! কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখভোগ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে।

কিন্তু, এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করিলে, উত্তর কালে, তোমার ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয় ত, ভাগ্যগুণে সৎপাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে; নয় ত, ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তাগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া, অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরম যত্নে ও পরম আদরে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় কাল যাপন করিতেছ, ইহা

দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধান নিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণ কালের জন্য, কাহারও নিকটে, কোনও অংশে, অণুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না, আদরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমায় যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক্ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভাববলে তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে (৮)।

১। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শন পূর্ব্বক ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে।

২। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।

৩। কখনও কখনও, 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে।

৪। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া, সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে।

৫। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত,' এই বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতাপ্রদর্শন করিতে।

৬। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে (৯)।

---

(৮) তুমি শ্বশুরালয়ের নাম কৃষ্ণনগর, স্বামীর নাম গোবর্দ্ধন, শাশুড়ীর নাম ভাগ্যবতী, পুত্রের নাম নদে রাখিয়াছিলে।

(৯) তুমি, স্বকপোলকল্পিত সাংসারিক কাণ্ড লইয়া, সে সমস্ত লীলা করিয়াছ, তৎসমুদায়

এইরূপে, তুমি সংসারযাত্রাসংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী, নয় বলিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধসেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু, আমি, ইচ্ছানুরূপ জলপ্রদানের পরিবর্ত্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, নিঃসন্দেহে, তোমার উৎকটপিপাসানিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চির দিনের নিমিত্ত

প্রায় প্রবীণতা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। *** কখনও কখনও, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবী, তোমার কল্পিত স্বামীর উল্লেখপূর্ব্বক, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসিতেন, 'কেমন প্রভো, সে এসেছিল?' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'কাল এসেছিল' বলিয়া, উত্তর দিতে। পর ক্ষণেই তিনি, 'কি দিয়ে গেল,' এই জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি, 'চারি পয়সা ও সিকি পয়সার শাক,' এই উত্তর দিতে।

নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মত পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভালবাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিক ক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক ক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না; আর, হয় ত, এত দিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু, আমি তোমায়, কস্মিন কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চির দিনের নিমিত্ত, আমার চিত্রপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অনুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

প্রভাবতী সম্ভাষণ। ১৮৬৩

খুড়-ভাইপো

খুড়, বুড় হয়ে, বুদ্ধিহারা হয়েছেন। বুদ্ধিহারা না হইলে, দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হয়ে, আমার পুস্তকের উত্তরদানে অগ্রসর হইতেন না। আমার দর্শিত দোষ সকল যথার্থ দোষ নয়, ইহা প্রতিপন্ন করা খুড়র মনস্থ ছিল; কিন্তু, উত্তর লিখিয়া, ঐ সকল দোষের যথার্থতা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি থাকিলে, অথবা বুদ্ধিমান্ বন্ধুলোকের পরামর্শ শুনিলে, খুড় এ পাগলামি করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। শুনিতে পাই, বিজ্ঞ বন্ধু মাত্রেই খুড়কে উত্তর লিখিতে বারণ করিয়াছিলেন।

'গাদা সকল ভার বইতে পারেন,
কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না',

এই প্রাচীন কথা অযথা নহে। খুড়কে কত লোকে কত গালি দেয়, কত উপহাস, কত তিরস্কার করে, তাতে খুড়র মনে বিকার মাত্র জন্মে না; কিন্তু আমি, তাঁর ভালর জন্যে, পরিহাসচ্ছলে, দুই একটি উপদেশ দিয়াছিলাম, খুড়র তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। খুড় আমার সদাশিব; তাঁর নির্ব্বিকার চিত্তে, অকস্মাৎ, এত অসন্তোষবিষের সঞ্চার হইল কেন, বুঝিতে পারা যায় না। অথবা,

'অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যম্'।
জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সহ্য হয় না।

লোকে যত ইচ্ছা গালি দিলে, এবং যত ইচ্ছা উপহাস ও তিরস্কার করিলে, খুড় গায়ে মাখেন না; কেবল, আমি জ্ঞাতি বলিয়া, আমার উপদেশগর্ভ পরিহাসবাক্য তাঁর বিষতুল্য বোধ হইয়াছে।

খুড় লিখিয়াছেন,

"ভাইপো মহাত্মার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি যে ইনি আমাকে এত কটু ও গালি প্রদান করিয়াছেন।"

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যদিও আমি জ্ঞাতি বটে; কিন্তু, জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন, খুড়র উপর আমার অণুমাত্র আক্রোশ নাই। তবে আমার মহৎ দোষ এই, নিতান্ত অন্যায় দেখিলে, জাতি বা সম্পর্কের অনুরোধে, চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। নীতিশাস্ত্রে বলে,

'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'।
গুরুরও দোষ দেখিলে, বলা উচিত।

কিন্তু, এক্ষণে কাল বড় মন্দ হয়েছে। কারও দোষ দেখিয়া, তার হিতার্থে, যথার্থ কথা বলিলে, গালি বলিয়া পরিগৃহীত হয়; এজন্য অনেকে, তথাবিধ স্থলে, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু, খুড়র বিষয়ে সেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন উপযুক্ত ভাইপোর উচিত নহে; সুতরাং, আপন ধর্ম্মরক্ষার্থে, এবং খুড়র ঐহিক ও পারত্রিক হিতার্থে, অগত্যা কিছু উপদেশ দিতে হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, খুড় আমার এমনই সুবোধ ছোকরা, যে আমার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, আমি তাঁকে গালি দিয়াছি, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায়, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর রকম দেখিয়া বোধ হয়, আমি উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলাম কেন, তিনি তাহা জানিতে চাহেন। অতএব, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। খুড়কে উপদেশ অর্থাৎ গালি দিতে পারি, পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন এরূপ বহুতর বিষয় আছে। সকলগুলি বলিতে গেলে, পুঁথি বেড়ে যায়; এজন্য, ইদানীন্তন দুই একটি মাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম,—ইতিপূর্ব্বে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে, বড় জাঁকের একটা শ্রাদ্ধ হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিতবিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পণ্ডিত মানুষ অধ্যক্ষ হইলেন, ভালই; কিন্তু, অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া, কাঁসারির মত, কতকগুলি ঘড়া বিক্রয় করিলেন। এক্ষণে সকলে বলুন, রাজবাড়ীতে এরূপ ঘড়াবিক্রয়, খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না; এবং, সে জন্য, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো, দুঃখিত হইয়া, ও অপমানিত বোধ করিয়া, তাঁহাকে উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয়,—শ্রাদ্ধের দিনে, ঐ রাজবাড়ীতে, খুড় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সন্দেসের সরা বিলতে গেলেন; এবং এক ব্রাহ্মণের হস্তে এক খানা সরা দিয়া, সে বেটা ব্রাহ্মণপণ্ডিত নয় জানিতে পারিয়া, তার হাত থেকে সরাখান কেড়ে নিলেন; এবং, সরাগ্রহণপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, তার গলায় গামছা দিয়া, মনের সাধে, প্রহার করিলেন। এক্ষণে, সকলে বলুন, পরের বাড়ীতে, বৈশাখ মাসে, কর্ম্মের দিনে, নিমন্ত্রিত শত শত ভদ্র লোকের সমক্ষে, তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, গুণমণি খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না; এবং আমি, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো হয়ে এমন স্থলে, চুপ করে না থেকে, উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।

তৃতীয়,—ঐ রাজবাড়ীতে, ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, খুড়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদায়ের ফর্দ্দে, রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে, ৮৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন। ফর্দ্দ দেখিয়া, ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর, ৮৲ টাকার জায়গায়, ১২৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়া দেন। বিদায়কালে, ন্যায়রত্ন ১২৲ টাকা পেয়ে, অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁর পক্ষে উচিত বিবেচনা হয় নাই, এই কথা জানাইলেন। খুড় কহিলেন, বলিলে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হবেন, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতে হইল, আমার বিবেচনায়, ন্যায়রত্ন ইহা অপেক্ষা অধিক পেতে পারেন; কিন্তু আমি যে পক্ষ, ন্যায়রত্নও সেই পক্ষ; অর্থাৎ আমি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের উত্তর লিখেছি, ন্যায়রত্নও লিখেছেন; সেই অপরাধে, বিদ্যাসাগর, রাগ করিয়া, ন্যায়রত্নের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বিদ্যাসাগরের উপর অন্যায় দোষারোপ হইতেছে, এবং সকলে অকারণে তাঁহাকে দোষী ভাবিতেছে, ইহা দেখিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বাবু বলিলেন, বাচস্পতি মহাশয়! আপনি এরূপ অন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? ইহা কহিয়া বিদায়ের ফর্দ্দখান খুড়র সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, দেখুন, আপনি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নামে ৮৲ টাকার অঙ্কপাত করিয়াছিলেন; ৮৲ টাকা অন্যায় বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাসাগর আটের জায়গায় বার করিয়া দিয়াছেন। এমন স্থলে বিদ্যাসাগর, রাগ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায় কমাইয়া দিয়াছেন, এ কথা বলা ভাল হইতেছে না।

জোঁকের মুখে চুণ পড়িলে যেমন হয়, খুড় আমার, অপ্রতিভ হয়ে, সেইরূপ হয়ে গেলেন। এক্ষণে, সকলে বলুন, অলীক দোষারোপ করিয়া, পরের দুর্নাম ও অনিষ্টচেষ্টা করা, হবিষ্যাশী ধাৰ্ম্মিক চূড়ামণি খুড়র পক্ষে, উচিত কৰ্ম্ম হয়েছে কি না, এবং তজ্জন্য তাঁর উপযুক্ত ভাইপো রাগ করিলে ও উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে দোষের কৰ্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কিনা।

বিদ্যাসাগরের তুল্য খুড়র যথার্থ হিতৈষী মিত্র ভূমণ্ডলে নাই। খুড় এখন মানুন না মানুন, তাঁর মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সকলের মূল বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সহায়তা ব্যতিরেকে, খুড়র কলেজে প্রবিষ্ট হইবার, কস্মিন কালেও, সম্ভাবনা ছিল না। বিদ্যাসাগর, যেরূপ অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্টস্বীকার করিয়া, খুড়কে কালেজে অধ্যাপকের তক্তে বসাইয়াছিলেন; তাহা কাহারও

সাধ্য নহে। খুড় আমার মহাশয় ব্যক্তি, এখন, বড় লোক হয়ে, সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, খুড়র গায়ে মানুষের চামড়া নাই। যাতে বিদ্যাসাগরের মর্ম্মান্তিক হয়, পিতা পুত্রে সে চেষ্টায় ক্ষণকালের জন্যেও, অলস ও অমনোযোগী নহেন। বিদ্যাসাগরের কুৎসা করা, খুড়র কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীরধারণের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে বলে, মিত্র-দ্রোহীর নিষ্কৃতি নাই। যথা,

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, ও বিশ্বাসঘাতক, এই তিন, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, নরকভোগ করিবেক।

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

যে ব্রহ্মহত্যা করে, সে সেতুবন্ধে, সমুদ্রে, ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গিয়া, পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কিছুতেই পাপমোচন হয় না।

খুড় লিখেছেন,

"আমি যে যে স্থলে যে যে সূত্র ও যে যে গ্রন্থ দ্বারা আমার লিখিত বাক্য ও পদ সঙ্গত ও শুদ্ধ সপ্রমাণ করিলাম তিনি দোষারোপ স্থলে একটিও সূত্রাদির উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং সে বিষয়ের উত্তর দেওয়া অনুচিত থাকাতেও, কেবল অন্যান্য লোকের তদ্বাক্যে বিশ্বাস হইয়া আমার গ্রন্থ সদোষ এই ভ্রম না হয় তদর্থেই এই পুস্তকখানি লিখিত হইল।"

খুড় যেরূপে দোষোদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে সকলেই খুড়র বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভদ্রতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁর গ্রন্থ সদোষ বলিয়া, লোকের ভ্রম না জন্মে, তদর্থেই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই, খুড়র দোষোদ্ধারচেষ্টা দ্বারা, তদীয় গ্রন্থ সদোষ, এই ভ্রম, দূরীভূত না হইয়া, সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূতই হইয়াছে।

আবার অতি অল্প হইল। ১৮৭৩

বাল্যস্মৃতি

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকট গিয়া আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড়ে চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা

নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে। এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে!

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া "বেস বাবা বেস" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা এক-বাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; এ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমা খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

বিদ্যাসাগর চরিত—স্বরচিত। ১৮৯১

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮২৪-১৮৭৩

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মহোদয় সমীপেষু—

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্যরচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ১৮৬০

উৎসর্গ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বর—

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্-রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি-শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।* আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে, আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ব্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কত দূর পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

হেক্‌টর-বধ। ১৮৭১

* "Hic omnes sine dubio, et in omni genezj eloquentiae, procul a se reliquit."
—Quintilian

See also
Aristotle: de Poetic.—Cap. 24.

হেক্টরের যুদ্ধযাত্রা

এ দিকে অরিন্দম হেক্টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সুচারু বর্ম্ম, ফলক, ও অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। বীরবর হেক্টর তাহাকে পরুষ বচনে ভৎ´সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার দুর্ম্মতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস্। হায়, তোরে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিন্যাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার অনুসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাবে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্ম্মে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীরুচিত্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটি হেক্টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অন্দ্রমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু-সন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটিকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাহ্লাদে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্দ্রমোকী স্বামীর

স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না। হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটিকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্ত্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণপরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটি মহাবাহু হেক্‌টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বরি, তুমি কি ভাব, যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আস্পর্দ্ধার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ট্রয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময় উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং রাজকুলতিলক প্রিয়াম্ তাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কাল-গ্রাসে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রিয়াম্ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকুবা কিম্বা আমার বীরবীর্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্বিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে। বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভর্ত্রিণীর আদেশে

অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেকুটরের পত্নী ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক শিশু-সন্তানটিকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ! শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবত্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহুর্মুহু পশ্চাৎ-ভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রু-বারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুন্দর বীর স্কন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হ্রেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

হেক্‌টর-বধ। ১৮৭১

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

১৮২৫-১৮৯৪

আওরঙ্গজেবের পত্র

যে দিবস শিবজী আইসেন সেইদিন রজনীতে আরঞ্জেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না —তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—“রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে —কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?

—ভাবিচিন্তাবিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয়!—যাঁহারা কখনও পঙ্কিল পাপপথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্যজীবন শতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি? ফল পাড়া হইলে আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন? আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়"—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশ-দত্ত দৃষ্টি হইয়া কহিলেন "জয়সিংহ? সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে, আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না"। এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারত-রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না নয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার

প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে।"

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখনও সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও বুঝি জয় হইত—পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এক জন অতি বিশ্বাসভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মসলা এই—আরঙ্গেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগজের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

অঙ্গুরীয় বিনিময় [ঐতিহাসিক উপন্যাস]। ১৮৫৭

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট পত্র

পরম প্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েষু।

ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেকৃটরবধকাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই—হইতেও পারি না। যৌবনসুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব, আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদনিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি জানিতাম তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত, এবং আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেকৃটর-বধ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্টকাব্য লিখিয়া, ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাকে নূতন অলঙ্কার-মালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই! তোমারই বিজাতীয় ভাষা-অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করা যদি সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষায় মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয়, আর কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলিই তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্বরূপ, করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব ? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্দ্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

এডুকেশন গেজেট। ১৮৭২

পানিপথের যুদ্ধ

তখন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিভেদে যেমন অন্যান্য বিষয়ের প্রভেদ হয়, তেমনি যুদ্ধপ্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে যাহার আপনার অভ্যস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বিজয়ী হইতে পারে, তাহার অন্যথা করিলে পরাজিত হয়। যেমন চকিতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার মন মধ্যে উদিত হইল, অমনি তিনি সেনানায়কগণকে সম্মুখ-সংগ্রাম হইতে অপসৃত হইয়া শত্রুর পার্শ্ব ভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুজ্ঞার সমগ্র তাৎপর্য্যই বুঝিল, ক্ষণমাত্রে আপনাদিগের ব্যূহের রূপান্তর করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই প্রভূত সেনারাশি অর্দ্ধচন্দ্রের আকার হইয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সাহের পরাক্রান্ত অশ্বারোহি-দল সবেগে আসিতেছিল।

কাহার সাধ্য যে সেই বেগ সহ্য করে ? নদীস্রোতের অভিমুখে কোন্ প্রতিবন্ধক স্থির হইয়া দাঁড়ায়!—এক পাষাণময় পর্ব্বতখণ্ড দাঁড়াইতে পারে, আর লঘু বালুকাস্তূপ যদিও স্থির হইয়া না দাঁড়ায়, তথাপি ক্রমে ক্রমে সমুদয়

স্রোতোজল শোষণ করিয়া লইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে মনে করিয়াছিল, অচলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ঐ আক্রমণ বেগ সহ্য করিবে, কিন্তু দৈবানুকূলতাবশতঃ তাহারা সে চেষ্টায় বিরত হইল। তাহারা বিশুষ্ক বালুকারাশির প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রবল স্রোতোমুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব ঘেরিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। নদীর জল ক্রমে ন্যূনবেগ, ক্রমে হ্রস্ব, অনন্তর সমুদায়ই বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আহম্মদ সাহ এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। মনে করিলেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন না; সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি আপন সহচর দুরানিদিগকে এবং স্বপক্ষ রোহিলাদিগকে, আর অযোধ্যার সৈন্যগণকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার অনুগৃহীত কাশীরাজ নামক একজন হিন্দু রাজা তাঁহার সমীপাগত হইয়া যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বন্দী হইয়া এক্ষণে তাহাদিগের দৌত্যকর্ম্মে আপনার নিকট আসিয়াছি। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগের বক্তব্য নিবেদন করি।" "বল।"

"সাহেবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া চোহান বংশাবতংস মহারাজ পৃথ্বীরাও কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং বন্দীকৃত হইলে সাহেবুদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি কেমন আচরণ করিয়াছেন, তাহা ঐ বিবরণেই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যদিও বরাবর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তথাপি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রকৃতির অন্যথা-চরণ হইতে পারে না। হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সদয় আচরণ করিতে প্রস্তুত। আপনি নিজ দলবল সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করুন। ভারতবর্ষ নিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে তাদৃশ মুসলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ।" দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল।—

"মহারাষ্ট্র-সেনাপতি আরও একটী কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সসৈন্যে তাঁহার অতিথি। অতএব সিন্ধু-পরপারে আপনার নিজ রাজ্যে যাইতে

যে কয়েক দিন লাগিবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনার ঐ কয়েক দিনের ব্যয় তিনি নিজ কোষ হইতে নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।”

দূত এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলে আহম্মদ সাহ ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, “দূত! তুমি মহারাষ্ট্র-সেনাপতিকে গিয়া বল, আমি তাঁহার উদার ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম—আর কখনও ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যম করিব না।” এই কথা শুনিয়া দূত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, “মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রতি আর একটী কথা বলিবার আদেশ আছে। এদেশীয় যে সকল মুসলমান নবাব, সুবাদার, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি আপনার সমভিব্যাহারী না হইবেন, তাঁহারা অবিলম্বে যে যাঁহার আপনাপন অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছেন, ‘ঐ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইল’।” দূতের এই কথা শেষ হইবামাত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, রোহিলাখণ্ডের জায়গীরদার নজিবউদ্দৌলা, হায়দরাবাদের নিজাম সলাবতজঙ্গের সেনাপতি ও ভ্রাতা নিজাম আলি ইঁহারা পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, “সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্ব স্ব অধিকারে গমন করিতে হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি মনোভঙ্গ হইবে।” দূত সকলের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, “তবে আপনারা দিল্লীনগরে গমন করুন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে—আমার প্রতি এইরূপ বলিবারও অনুমতি আছে।”

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১২৮২

সামাজিক প্রকৃতি—উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ

ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্ব একটী নূতন শাস্ত্র। ইহার অতি স্থূলসূত্রগুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ সমাজগুলিকে এক একটী সুবৃহৎ পরিবারের স্বরূপ মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তদনুযায়ী বিচার করেন, কেহ কেহ বা সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেন কখন একটা বিশেষ চুক্তি ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া বিধিব্যবস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রকেই

সমাজতত্ত্বের মূল বলিয়া তদনুযায়ী নিয়ম সকল স্থাপন করিতে চান। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালীর বিশেষ ভক্ত তাঁহারা সমাজ পদার্থটীর নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজবন্ধনের মূলসূত্র বিবেচনা করিয়া প্রতি পরিবারকেই সমাজের মৌলিক অণুস্বরূপ ভাবেন। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজ তত্ত্বীরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্ব্বপ্রকার মতবাদের এবং সমাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সর্ব্বপ্রকার আচারের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু যতই হউক, এখনও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ অনেক ; এখনও সমাজ-তত্ত্বের বিচারে উপমাত্মক ন্যায়ানুযায়ী বিচার, অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় অতি বড় বড় নব্য পণ্ডিতেরাও অনেকে সমাজশরীরকে প্রাণি-শরীরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণি-শরীর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকলের সমষ্টি,—সমাজশরীরও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুল পরিবারের সমষ্টি ;—তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরাবস্থিত সকল অণুগুলিতেই জীব-ধর্ম্ম আছে, সমাজ-শরীরাবস্থিত প্রতি পরিবারও জীবনীশক্তি সম্পন্ন ; তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন প্রাণিশরীর হইতে অণু সকল নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নূতন অণু সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ-শরীর হইতেও লোক সকল মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে, আবার নূতন লোক সকল জন্মিয়া সমাজের পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য উপলব্ধ হওয়াতে পণ্ডিতেরা উপমাত্মক প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সমাজ-শরীর অবিকল প্রাণি-শরীরের তুল্য, ঐ দুইটীতে কোন ইতরবিশেষই নাই।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই সামাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতগুলি—(১) সকল সমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়, জরা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; কারণ, প্রাণিশরীরের ঐ সকল দশা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। (২) সমাজ সংস্কারের সাময়িক প্রয়োজন আছে, কারণ বাল্যের পরিধেয়, যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় খাটে না। (৩) সমাজ জীবৎ শরীর, আহারের ন্যায় যাহা উপযোগী উহা তাহাই গ্রহণ করে, যাহা অনুপযোগী তাহা ত্যাগ করে।

এইরূপ অনেকানেক কথা আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মক ন্যায়মূলক বলিয়া এমনি পিচ্ছিল যে, অনায়াসেই লোকের গলাধঃকৃত হইয়া যায়। কিন্তু

প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকানেক মৌলিক বিষয়ে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। (১) প্রাণিশরীরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী; তাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে তাহার প্রতিকূল শক্তি সকলের কার্যকারিতাগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাজশরীরের প্রতিকূলরূপে কার্য্য করিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরায়ণতা সামাজিক অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নয়। সমাজবন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুসংস্কৃত হইয়া ঐ বন্ধনের অনুকূল বই প্রতিকূল হয় না। মানুষ সমাজসম্বন্ধ থাকিয়া যেমন স্বার্থসাধন করিতে পারে, সমাজচ্যুত হইলে তেমন পারে না। তদ্ভিন্ন সাহজিক সহানুভূতি সমাজবন্ধনের অনুকূল শক্তি। এই জন্য সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই। তবে পৃথিবী যদি কোন কালে মানুষের বাসোপযোগী না থাকে, (যেমন লোমশ হস্তী প্রভৃতি যুগান্তরজাত জীবদিগের হইয়াছে) তাহা হইলে মনুষ্যজাতির বিধ্বংসের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে।

সময়ে সময়ে সমাজের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। নিয়মগুলি সমাজের অন্তর্ভূত বস্তু, পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় বাহির হইতে আনীত বস্তু নয়। উপমার দ্বারা উহাদিগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ঐগুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বরগা, ইষ্টকাদির ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কোনটি মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা ধরিলে বদলাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ দূষিত না হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয় মনে করিয়া বদলাইতে যাইতে নাই। আর বদল করিবার সময়েও খুব সাবধানে ঠেকো দিয়া এবং কোনরূপ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করিয়া তবে বদলাইতে হয়। প্রাণিশরীর হইতে সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, উহা আপনার বহির্ভাগ হইতে আহারের ন্যায় কিছুই গ্রহণ করেন না। উহার পোষণ উহার আপনার ভিতর হইতে হয়। বাহির হইতে কিছু আনিয়া সমাজের গাত্রে লাগাইয়া দিলে, উহা প্রাচীরে ঘুঁটে দিবার ন্যায় গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রাচীরের বিস্তৃতি কিছুই বাড়ায় না। এই জন্য সামান্য অনুকরণ জাত সমাজ সংস্কার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়।

সামাজিক প্রবন্ধ। ১৮৯২

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
?—১৮৫৮

মহাশ্বেতা

পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিকে মেঘ, দশ দিক্ অন্ধকার। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি। অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে, নদী সকল বৰ্দ্ধিত হইয়া উভয় কূল ভগ্ন করিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। সরোবর, পুষ্করিণী, নদ, নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক জলময় ও পথ পঙ্কময়। ময়ূর ও ময়ূরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কদম্ব, মালতী, কেতকী, কুটজ প্রভৃতি নানাবিধ তরু ও লতার বিকসিত কুসুম আন্দোলিত করিয়া নবসলিলসিক্ত বসুন্ধরার মৃদগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক ঝঞ্ঝাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখাকলাপে আঘাত করিতে লাগিল। কোন দিকে কেকারব, কোন দিকে ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও বৃষ্টিধারার গভীর শব্দ এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্ঝরের পতনশব্দ। গগনমণ্ডলে আর চন্দ্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রগণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রূপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় চন্দ্রাপীড়ের পথরোধ করিল। ইন্দ্রচাপে তড়িদ্‌গুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বারিরূপ শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তড়িৎ যেন তর্জ্জন করিয়া উঠিল। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া, চন্দ্রাপীড় সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবিলেন এ আবার কি উৎপাত! আমি প্রিয় সুহৃৎ ও প্রিয়তমার সমাগমে সমুৎসুক হইয়া, প্রাণপণে ত্বরা করিয়া যাইতেছি। কোথা হইতে জলদকাল দশ দিক অন্ধকার করিয়া বৈরনির্যাতনের আশায় উপস্থিত হইল? অথবা, বিদ্যুতের আলোক পথ আলোকময় করিয়া, মেঘরূপ চন্দ্রাতপ দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া, আমার সেবার নিমিত্তই বুঝি, জলদকাল সমাগত হইয়াছে। এই সময় পথ চলিবার সময়। এই স্থির করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, মেঘনাদ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন মেঘনাদ! তুমি অচ্ছোদসরোবরে বৈশম্পায়নকে দেখিয়াছ? তিনি তথায় কি নিমিত্ত আছেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছ? তোমার জিজ্ঞাসায় কি

উত্তর দিলেন ? তাঁহার কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, বাটীতে ফিরিয়া আসিবেন কি না ? আমি গন্ধর্ব্বনগরে যাইব শুনিয়া কি বলিলেন ? তোমার কি বোধ হয়, আমাদিগের গমন পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন ত ? মেঘনাদ বিনীত বচনে কহিল দেব ! "বৈশম্পায়ন বাটী আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি অবিলম্বে গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিতেছি। তুমি পত্রলেখা ও কেয়ূরকের সহিত অগ্রসর হও।" আপনি এই আদেশ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আমি আসিবার সময়, বৈশম্পায়ন বাটী যান নাই, অচ্ছোদসরোবরের তীরে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কাহারও মুখে শুনি নাই। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হয় নাই। আমি অচ্ছোদসরোবর পর্য্যন্ত যাই নাই। পথিমধ্যে পত্রলেখা ও কেয়ূরক কহিলেন মেঘনাদ ! বর্ষাকাল উপস্থিত। তুমি এই স্থান হইতেই প্রস্থান কর। এই ভীষণকালে একাকী এখানে কদাচ থাকিও না। এই কথা বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

রাজকুমার মেঘনাদকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে স্থানে নির্ম্মল জল, বিকসিত কুসুম, মনোহর তীর ও বিচিত্র লতাকুঞ্জ দেখিয়া প্রীত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষণ্ন চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রিয়সখার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারী লোকদিগকে সতর্ক হইয়া অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। আপনিও তরুগহন, তীরভূমি ও লতামণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার অবস্থানের কোন চিহ্ন পাইলেন না, তখন ভগ্নোৎসাহ চিত্তে চিন্তা করিলেন পত্রলেখার মুখে আমার আগমনসংবাদ শুনিয়া বন্ধু বুঝি এখান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। এখানে থাকিলে অবশ্য অবস্থানচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয়, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এক্ষণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই। যে আশা অবলম্বন করিয়া এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার মূলচ্ছেদ হইল। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আর চলে না। এক বারে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ন হইতেছে। সকলই অন্ধকার দেখিতেছি।

আশার কি অপরিসীম মহিমা ! চন্দ্রাপীড় সরসীতীরে বন্ধুকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন এক বার মহাশ্বেতার আশ্রম দেখিয়া আসি। বোধ হয়, মহাশ্বেতা সন্ধান বলিতে পারেন। এই স্থির করিয়া ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় চলিলেন। কতিপয় পরিচারকও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আসিবার সময়

মনোরথ করিয়াছিলেন মহাশ্বেতা আমার গমনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন এবং আমিও আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বিধাতার কি চাতুরী! ভবিতব্যতার কি প্রভাব! মনুষ্যেরা কি অন্ধ এবং তাহাদিগের মনোরথ কি অলীক! চন্দ্রাপীড় বন্ধুর বিয়োগে দুঃখিত হইয়া, অনুসন্ধানের নিমিত্ত যাহার নিকট গমন করিলেন, দূর হইতে দেখিলেন তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিকা বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখিত মনে তাঁহাকে ধরিয়া আছে। মহাশ্বেতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি কাদম্বরীর কোন অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবেক। নতুবা পত্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছেন এসময় অবশ্য হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন। চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নের অনুসন্ধান না পাওয়াতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাতে আবার প্রিয়তমার অমঙ্গলচিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করাতে নিতান্ত কাতর হইলেন। শূন্য হৃদয়ে মহাশ্বেতার নিকটবর্ত্তী হইয়া শিলাতলের এক পার্শ্বে বসিলেন ও তরলিকাকে মহাশ্বেতার শোকের হেতু জিজ্ঞাসিলেন। তরলিকা কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দীন নয়নে মহাশ্বেতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

মহাশ্বেতা বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন মহাভাগ! যে নিষ্করুণা ও নির্লজ্জ পূর্ব্বে আপনাকে দারুণ শোকবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই পাপীয়সী এক্ষণেও এক অপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণ করাইতে প্রস্তুত আছে। কেয়ূরকের মুখে আপনার উজ্জয়িনীগমনের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। চিত্ররথের মনোরথ, মদিরার বাঞ্ছা ও আপন অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়াতে সমধিক বৈরাগ্যোদয় হইল এবং কাদম্বরীর স্নেহপাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আশ্রমে গমন করিলাম। একদা আশ্রমে বসিয়া আছি এমন সময়ে, রাজকুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশাকৃতি সুকুমার এক ব্রাহ্মণকে দূর হইতে দেখিলাম। তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন প্রণষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিচিতের ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিয়া, নিমেষশূন্য নয়নে অনেক ক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর মৃদু স্বরে বলিলেন সুন্দরি! এই ভূমণ্ডলে বয়স্ ও আকৃতির অবিসংবাদী কর্ম্ম করিয়া কেহ নিন্দাস্পদ হয় না। কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতেছ। তোমার নবীন বয়স্, কোমল শরীর ও শিরীষকুসুমের ন্যায়

সুকুমার অবয়ব। এ সময় তোমার তপস্যার সময় নয়। মৃণালিনীর তুহিনপাত যেরূপ সাংঘাতিক তোমার পক্ষের তপস্যার আড়ম্বরও সেইরূপ। তোমার মত নবযুবতীরা যদি ইন্দ্রিয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যায় অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে, মকরকেতুর মোহন শর কি কার্য্যকর হইল? শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, বসন্তকালের সমাগম ও বর্ষা ঋতুর আড়ম্বরের কি ফলোদয় হইল? বিকসিত কমল, কুসুমিত উপবন ও মলয়ানিল কি কর্ম্মে লাগিলেন?

কাদম্বরী। ১৮৫৪

রাজনারায়ণ বসু

১৮২৬—১৯০০

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে" "ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে" বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াম্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বাস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা

ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি "কড়কড়ে পানীতে" (র‍্যাপিড) পড়িলাম। ষ্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপালবাবুকে বলিলাম, আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। রামগোপালবাবু অসমসাহসিক কার্য্য সকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (বয়লার) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।" রামগোপালবাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন "আমি মন্ত্রপূত জীবন ধারণ করি।" (আই বেয়ার এ চার্মড লাইফ)। ষ্টীমারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার হাল্‌কি করিবার জন্য ষ্টীমারের অধিকাংশ জিনিষপত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃপুনঃ উদ্গীরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় "কড়কড়ে পানী" কোন প্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীর লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপালবাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়," কেবল "অন্যের" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "জলের" এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—"ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।" তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টরবাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই-এক দিন অবস্থিতি করিলে পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সঙ্কল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় ডাঃ এন্টন হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেণ্টলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্‌ফর্ করিয়া বাতাসে

উড়িতেছে। দৃশ্যটি দেখিতে মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন, হাতীটি অতি শায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালির দরজার খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে আহারের উদ্‌যোগ হইল। সাহেব ও রামগোপালবাবু একত্রে আহার করিলেন। আমাদের বাঙ্গালীতর বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়েজনে (?) পড়িয়া খিচুড়ি রাঁধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এইখানে বাদসাহের প্রত্যহ দরবার হইত। প্রাচীরের উপর অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। সেই কারুকার্য্যের মধ্যে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদসাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা গেলে বোধ হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম। মনুষ্যের কীর্ত্তি কি অস্থায়ী। যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্য্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টারলনী মনুমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্বেত্তা রাত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লা পরিহিত রাজ-জ্যোতির্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্র পর্য্য-বেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। ১৩১৩

* বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থটি লিখিত। আমরা প্রথম প্রকাশের তারিখ দিলাম।

দীনবন্ধু মিত্র

১৮২৯-১৮৭৩

নিমচাঁদের স্বগতোক্তি

মহাদেব! বোম্‌ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ান) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জামানমর্য্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease, or else, climb upward
To what they were before—"

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাগর্ত্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শ্বাশুড়ী আমাকে দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখলে হাসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্য বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেশা হয়েছে বটে। কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমানা আছেন। আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার

গায় মুক্তার ন্যায় ঝুলিতেছে, কেহ আসচে কিনা এক এক বার মুখ ফিরয়ে দেখচেন। মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভুতে পেতো। এখন মদে পায়—ডাক ওজা, ডাক ওজা, ঝাড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে দেক—আমি স্থরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভুত ছাড়াতে পারে সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে বাবা, ভুতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভুতে খেয়ে গিয়েছে; দেখ বাবা তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এতকালের পর সভায় নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সেদিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্ধ থাকবে তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা মাগমুখো। বাঞ্চৎ কলেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি। বড় কাকা ব্যাটা জব্দ হয়েছে। এখন গোকুলো ব্যাটাকে জব্দ করবার উপায় কি? মল্লযুদ্ধ কবুবো, কি বলো? বটে ত।

সধবার একাদশী। ১৮৬৬

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৪-১৮৮৯

কোলরমণী

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী —সর্ব্বাপেক্ষা বায়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, 'রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?' আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতারা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে বা নাচিতে পারে না, আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা

"খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতেই দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে. তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে, আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরশির ধুক্‌ধুকী চন্দ্র-কিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎ-সঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল; পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল। বুকের ধুক্‌ধুকী দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিতকণ্ঠে একটি গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের স্বরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, যেন

শুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা, কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপবাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল, নিকটে দুই তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক একবার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

পালামৌ [বঙ্গদর্শন] ১২৮৭-১২৮৯

নববধূ

কোলের নববধূ আমি কখনও দেখি নাই। কুমারী একরাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়ীরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গরুকে গাল দিতেছে, পাড়ার ভালখাকীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ী গালি দিয়া পালাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ী নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন, নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে তাহার দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্ট পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত

লোক! কত কলরব! যেন স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা। নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল। একটি দুর্ব্বলা কুকুরী—নবপ্রসূতি পেটের জ্বালায় শুষ্ক পত্রে ভগ্ন ভাণ্ডে আহার খুঁজিতেছে, নববধূর চক্ষে জল আসিল। জল মুছিয়া নববধূ ধীরে ধীরে মাতৃকক্ষে গিয়া লুচি আনিয়া কুকুরীকে দিল। এই সময়ে নববধূর পিতা অন্দরে আসিতেছিলেন, কুকুরীভোজন দেখিয়া একটু হাসিলেন, নববধূ আর পূর্ব্বমত দৌড়িয়া পিতার কাছে গেল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণভোজনের পর কুকুর ভোজনই হইয়া থাকে, রাত্রে তাহা হইয়া গিয়াছে। অদ্য আবার এ কেন মা?" নববধূ কথা কহিল না! কহিলে হয়ত বলিত, এই কুকুরী সংসারী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নববধূ লুচি আনিতে যাইবার সময় ধীরে ধীরে গিয়াছিল, আর দুই দিন পূর্ব্বে হইলে দৌড়িয়া যাইত। যখন সেই ঘরে গেল, তখন দেখিল, মাতার সম্মুখে কতকগুলি লুচি সন্দেশ রহিয়াছে। নববধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা! লুচি নেব?" মাতা লুচিগুলি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কেন মা আজ চাহিয়া নিলে? যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি আপনি লও, ছড়াও, ফেলিয়া দাও, নষ্ট কর, কখনও কাহাকেও ত জিজ্ঞাসা করে লও না? আজ কেন মা চাহিয়া নিলে? তবে সত্যই আজ থেকে কি তুমি পর হ'লে, আমায় পর ভাবিলে?" এই বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। নববধূ বলিল, "না মা! আমি বলি বুঝি কার জন্য রেখেছ?" নববধূ হয়ত মনে করিল, পূর্ব্বে আমায় "তুই" বলিতে আজ কেন তবে আমায় "তুমি" বলিয়া কথা কহিতেছ?

নববধূর পরিবর্ত্তন সকলের নিকট স্পষ্ট নহে সত্য, কিন্তু যিনি অনুধাবন করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন কত আশ্চর্য্য! নববধূর মুখশ্রী এক রাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বালিকা কি বুঝিল যে, মনের এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে হইল।

পালামৌ [বঙ্গদর্শন]। ১২৮৭-১২৮৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮-১৮৯৪

দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছু-মাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্ত-মার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত

হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্দির মধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কারশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার, কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুতহস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দির মধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দির মধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলা জাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

দুর্গেশনন্দিনী। ১৮৬৫

পত্র সূচনা

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকাপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্,এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের এক মাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতা ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজ-পুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেক গুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যম না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক ততদূর চলুক। কিন্তু একবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি, হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী

সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিল্‌টর ডৌন" করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।

বঙ্গদর্শন। ১৮৭২

প্রকৃতি

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

চন্দ্রশেখর। ১৮৭৫

বড় বাজার

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আদ্দাশ, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে

কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাই-ওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারদের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

কমলাকান্তের দপ্তর। ১৮৭৫

আমার দুর্গোৎসব

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশদিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কাল-স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কমলাকান্তের দপ্তর ১৮৭৫

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে।

আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী। হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি?—তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুল শ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—

যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

কমলাকান্তের পত্র। ১৮৭৫

জ্যোৎস্না

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ; আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানা বর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিলটি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের

মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গ নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে. ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেরও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে; কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর

চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে।

দেবীচৌধুরাণী। ১২৯০

পুরাতন ও নূতন

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রিদিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায় পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যাম্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌সে

গুড়ুনি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সম্মুখেই রমা, দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

বলা বাহুল্য, রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর স্মরণপটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা, কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এজন্য সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব!" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহই তাহার মূল। পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে, এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল।

সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ

হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখান জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমন নহে। নন্দাও তাহার সহায়, কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি? তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদসেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত! "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার।"—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে "ভালবাসা", স্নেহ প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা

সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেককাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

সীতারাম ১৮৮৭

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণচরিত যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে?

এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্ !
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য ; যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব ? সকল জাতির মধ্যে,প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে,সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে— মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন ?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্ত্তমান ছিলেন না,কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই ; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটস্ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে

সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক্ লিবি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে, Gibbon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্‌কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক্ লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,—সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতর পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য! ! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্ত্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত

সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত ; তবে ভয় কিসের ? তবে বেহেস্ত আমার কপালে নাই—বুঝি জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয় ! তা, এতদিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই ; খোদাও জানিতাম না, দীন্‌ও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম ! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে ? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি ত জান ! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দয় হইয়া কেন এ দুঃখ দিলে ? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে ? আমার মত দুঃখী কে ?”

শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল—রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই—কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুষ্পধন্বাও শরাঘাতের সময়ে মৃদুহস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলা-ক্রমে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল। জেব-উন্নিসা জ্বালায় একটু কাতর হইল। তখন জেব-উন্নিসা মনে মনে একটু হাসিল। ভাবিল, “পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর ! এই অনন্ত দুঃখের সময়েও কাতর ! আপনি পিপীলিকা-দংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয় ! হয় সাপ, নয় মবারক !”

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিক ক্ষণ ধরিয়া একা, মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্য হইতে, সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “হয় সাপ ! নয় মবারক !” কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, “মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না ?”

“এ কি এ !” বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে, তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, “এ কি এ ? এ কি শুনিলাম ! কার এ আওয়াজ ?” উত্তর হইল ; “কার ?”

জেব-উন্নিসা বলিল, “কার ! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে ! সে কি ছায়া মাত্র নহে ? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আসিতেছ,

যাইতেছ, মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত, না জীবিত? আসিরুদ্দীন কি আমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে—আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত্ত জন্য বসিতে পার না? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো!"

উত্তর, "কেন?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই, তাহা বলিব।"

মবারক—(বলিতে হইবে না যে মবারক সশরীরে উপস্থিত)—তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,—জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকণ্টকিত, আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল;—অন্ধকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল। বলিল, "ছায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপরে পড়িল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম—তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ছাড়িয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত?"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছে, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি

তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলমগীর বাদশাহের রঙমহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভুলিয়া গেল—সর্পদংশনজ্বালা ভুলিয়া গেল—আপনার মরিবার ইচ্ছা ভুলিয়া গেল—দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশূন্য অসহ্য বাক্য ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেমপরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত ?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে, সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে ?" বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র; মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, আমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফানুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশভূষা করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে দুই জনে মবারক ও জেব-উন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্নিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি রাত্রিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব যানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মবারক জেব-উন্নিসাকে সেই মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকীল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তখন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাণার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মুক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিসাকে পুনর্ব্বার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

রাজসিংহ। ১৮৯৩ [তৃ. স]

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনি, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘর-করনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।

এখন যুক্তকরে আপনাদের নিকট নিবেদন যে, আপনারা না মনে করেন যে, এই সকলই কৃত্রিম। ইন্দিরার মনে এতটুকু গর্ব্ব আছে যে, কেবল ভরণ-পোষণের লোভে, অথবা স্বামীর ধনে ধনেশ্বরী হইব, এই লোভে, সে এই সকল করিতে পারে না। স্বামী পাইব এই লোভে, কৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিতাম না; ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হইব, এমন লোভেও পারিতাম না। স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া হাসি চাহনির ঘটা ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াইতে পারি না। ভগবান্ সে মাটিতে ইন্দিরাকে গড়েন নাই। যে অভাগী এ কথাটা না বুঝিতে পারিবে,—যে নারকিণী আমায় বলিবে, "হাসি চাহনির ফাঁদ পাতিতে পার, খোঁপা খুলিয়া আবার বাঁধিতে পার, কথার ছলে সুগন্ধি কুঞ্চিতালকগুলি হতভাগ্য মিন্‌সের গালে ঠেকাইয়া তাকে রোমাঞ্চিত করিতে পার—আর পার না তার পাখানি তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে, কিম্বা হুঁকার ছিলিমটায়

ফুঁ দিতে”!—যে হতভাগী আমাকে এমন কথা বলিবে, সে পোড়ারমুখী আমার এই জীবনবৃত্তান্ত যেন পড়ে না।

তা, তোমরা পাঁচ রকমের পাঁচ জন মেয়ে আছ, পুরুষ পাঠকদিগের কথা আমি ধরি না—তাহারা এ শাস্ত্রের কথা কি বুঝিবে—তোমাদের আসল কথাটা বুঝাইয়া বলি। ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই,—কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, আমি তাহা করিতেছিলাম। মনে মনে করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে গ্রহণ নাই করেন, তবে আমার পক্ষে পৃথিবীর যে সার সুখ,—যাহা আর কখনও ঘটে নাই, আর কখনও ঘটিতে নাও পারে, তাহা অন্ততঃ এই কয় দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লই। তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম। ইহাতে কি পরিমাণে সুখী হইতেছিলাম, তা তোমরা কেহ বুঝিবে, কেহ বুঝিবে না।

পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি চাহনির তত্ত্বটা বুঝাইব। যে বুদ্ধি কেবল কালেজের পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌঁছে, ওকালতিতে দশ টাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সম্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি? তবে হাসি চাহনির তত্ত্বটা যে দয়া করিয়া বুঝাইব বলিয়াছি, তার কারণ, সেটা বড় মোটা কথা। যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গোরুকে পাঁচনবাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।

তোমরা বলিবে, এ অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা। তা বটে—আমরাও মাটির কলসী, ফুলের ঘায়ে ফাটিয়া যাই। আমার এ অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে পাইতেছিলাম। যে ঠাকুরটির অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে—মা বাপ নাই,* অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়;

---

* আত্মযোনি

সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্ব্বখর্ব্বকারী। আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম। বলিয়াছি, তাঁহার রূপ মনোহর রূপ—তাতে আবার জানিয়াছি, যাঁর এ রূপরাশি, তিনি আমারই সামগ্রী ;—

তাহারই সোহাগে, আমি সোহাগিনী,
রূপসী তাহারই রূপে।

তার পর এই আগুনের ছড়াছড়ি! আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্‌টা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার প্রফুল্লরক্তপুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমন করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠ বিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।

পরীক্ষার কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি তাঁহার ভালবাসার এমনই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, পরীক্ষার কাল অতীত হইলে তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। পরিণামে যদি তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মতও যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাও থাকিব, স্বামীকে পাইলে, লোকলজ্জাকে ভয় করিব না। কিন্তু যদি কপালে তাও না ঘটে, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।

কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাণনাথের পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে। আর উড়িবার শক্তি নাই। তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল।

তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতি পদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিত মাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না"। ফলে আমি দেখিলাম যে, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার দশা বড় মন্দ হইবে।

পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম। কিন্তু আমি যাই হই, হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম।

ইন্দিরা। ১৮৯৩ [প. স]

কেশবচন্দ্র সেন

১৮৩৮-১৮৮৪

রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরের নিকট হইতে একজন প্রেরিত আসিলেন। যিনি প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে সরাইয়া আমরা প্রেরিতকে তাঁহার পদে স্থাপন করিলাম। পরিশেষে আমাদিগের মধ্যে কি মৃত ব্যক্তির পূজা স্থাপিত হইবে? নীচ হীন ভাষা স্থান পাইবে? ১১ই মাঘের সময় রামমোহন রায় সংস্থাপক বলিয়া চীৎকার করিবে? কে রামমোহন রায়? প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে স্বীকার করিব না। রামমোহন রায় কি বস্তু কি পদার্থ? কে ছিল সেই লোক চিনি না। যাঁহারা আমাদের লোক তাঁহারা তাহাকে চিনেন না। তিনি কলিকাতার কি বঙ্গদেশের ইহা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। তাঁহাকে আমরা দেখিও নাই, স্বীকারও করি না। ভক্তি দেখাইতে হইলে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখাইব যিনি প্রেরিত ছিলেন। তিনি কোথায়? মনে কর তিনি যেন হিমালয়ে, তাহাতে কি? আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তো জন্মগ্রহণ করি নাই। সে সময়ে ঈশ্বর কোন সন্তানকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার দ্বারা কিছু করাইয়া লইলেন, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? মনের দ্বারা কি প্রকারে

নিশ্চয় করিব যে কোন একজন প্রেরিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ব্রহ্ম নিরুত্তর। প্রেরিত ? প্রেরিত মানি না। ঈশ্বর কাহাকেও প্রেরণ করেন না। বীজ হইতে যেমন গাছ উঠে, মানুষও তেমনি উঠে। স্বভাবের নিয়মে ঘটনা সকল ঘটিতেছে। উদ্ভিদ রাজ্যে যেমন উত্থান ও বৃদ্ধি, মনুষ্য সমাজেও তেমনি। চারাগাছ বড় হইল, ফল ফুল পত্রে শোভিত হইল। মানুষ বালক ছিল যুবা হইল, যুবা ছিল বৃদ্ধ হইল। সকলই নিয়মে হইতেছে। আকাশ হইতে আবার নামিল কে ?

যদি স্বর্গ হইতে কেহ না আসিলেন তবে এ সকল ব্যাপার কি প্রকারে ঘটিল ? এ সকল কি মানুষের কীর্ত্তি ? এ সকল কি ঈশ্বরের হস্তের শাস্ত্র নয় ? ঈশ্বরের বিশ্ব, ঈশ্বরের মন্দির কি এক নয় ? ঈশ্বরের গৃহ কি মনুষ্য নির্ম্মাণ করিল ? বুঝিতে পারি না। মানুষ ধর্ম্মসংস্কারক হইল, ব্রহ্মসভা করিল, মানুষ কতকগুলি মত উদ্ভাবন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিল, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা প্রেরিত মানি, এ সকল ব্যাপারে ব্রহ্মের হস্ত দর্শন করি। ক্ষমা কর, যেখানে মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ, আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। ঈশ্বর প্রেরণ করেন এবং যিনি পিতা মাতা দত্ত রামমোহন নামে পরিচিত হইলেন তাঁহার যদি শ্যাম নাম হইত কিছু ক্ষতি নাই। নাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যিনি প্রেরিত তাঁহাকে যে আখ্যা দেওয়া হউক, সেই আখ্যায় তিনি পৃথিবীতে পরিচিত হয়েন। চিদাত্মা ব্রহ্মতনয়, ব্রহ্মনিয়োজিত, ব্রহ্মপ্রেরিত। এমন যদি কেহ থাকেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আমাদিগের মধ্যে যশস্বী হইবেন।

গোড়া ঠিক না করিয়া প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কাহার নাম কীর্ত্তন করিব ? কাহাকে সম্মাননা দিব ? কি জানি শেষে যদি বড় জ্ঞানে কোন মানুষকে পূজা করিয়া ফেলি ? এরূপ করিতে গিয়া উৎসব পুস্তকের প্রতি পাতায় আমাদের দুষ্ট ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইবে, যাহা করিব সকলই মিথ্যা হইবে, সর্ব্বনাশ হইবে, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। সাবধান, উৎসব মনুষ্যের স্মরণার্থ নয়, মনুষ্যের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য নয়। উৎসব কি জন্য ? ব্রহ্মের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, উন্মত্ত হইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, ঈশ্বরের গৌরবে লোককে মহৎ করিবার জন্য। উৎসব আর কিছুরই জন্য নয়, ইহারই জন্য। ইহার প্রথম অক্ষর বিধান, ইহার প্রত্যেক বর্ণ বিধান, ইহার শেষ মন্ত্র বিধান।

সর্ব্ব প্রথম বিধান রামমোহনে প্রকাশ পাইল, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি একটি প্রণালী হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাই লোকে বলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক। সমাজ স্থাপন, সমাজ প্রতিষ্ঠা, এ কি একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ন্যায় মানুষের কীর্ত্তি? আমরা সভা করিয়া সাম্বৎসরিক করিয়া কি সেই মানুষের কীর্ত্তি ঘোষণা করিব? এ তো সামান্য বিষয় নয়, এ যে দেশব্যাপক পরিত্রাণের ব্যাপার। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য নয় তাহাকে তাহা অর্পণ করা কেন? ঈশ্বর বিধান করেন। মানুষকে তিনি সেই বিধানের বাহক করেন। বঙ্গদেশে তিনি রামমোহনকে পাঠাইলেন। বঙ্গদেশ চাহিল, অশ্রুজলে ভাসিয়া ভগবানের নিকটে দুঃখ জানাইল, ঈশ্বর জীবনে দুঃখ দেখিতে পারেন না, অন্ধকার সহিতে পারেন না, তাই তৎক্ষণাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারই উপরে তোমার আমার ভার ছিল। তিনি দুর্ব্বল ছিলেন না, অন্যান্য ধর্ম্মবীরের ন্যায় ছিলেন। তুমি তাঁহার বিচার করিবে? তোমার জননী কি তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী নন? তুমি কি বলিবে, আমি প্রেরণ করিলে প্রবলতর সিংহের মত পরাক্রমশালী আরও বড লোক পাঠাইতাম। তোমার এ কথার এক সদুত্তর এই, তোমার জ্ঞানের কথা রাখিয়া দাও। আমরা বিধান মানি। যেমন রাক্ষস তেমন বীর। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ, যেমন অজ্ঞানতা তেমনি প্রকাণ্ড শাস্ত্র। বুদ্ধিবলে সমুদয় কুতর্ক ছেদন করিতে পারে, সমুদয় ভ্রান্তি ছিন্ন করিতে পারে, এমন একজনের অবতরণের প্রয়োজন ছিল। যেমন প্রয়োজন, ঘটনা তদ্রূপ। ঔষধ রোগযন্ত্রণার অনুরূপ। লোকে যাহা বুঝিতে চায় তাহা বুঝাইতে পারে তেমনি লোক, তেমনি কৌশল। আমাদিগের পুস্তক সকলের মধ্যে একেশ্বরবাদ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, সহজে বুঝাইবার জন্য, তিনি আসিলেন। উপনিষৎ পুরাণ হইতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ওঁকার পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে যে বড় বড় কথা মহারণ্যের মধ্যে পড়িয়া ছিল, তৎসমুদয় উদ্ধার করিলেন। সমুদয় বিরুদ্ধবাদীগণকে নিরস্ত করিয়া সত্য উদ্ধার করিলেন, দেশীয় ভ্রাতাদিগকে সৎপথ দেখাইলেন।

তিনি জ্ঞানের গুরু, ভক্তি বা কর্ম্মের গুরু ছিলেন না। সমুদয় ভক্তদল লইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তির পথে যাইবেন এজন্য তিনি আসেন নাই। যাঁহার যে কার্য্য তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। নতুবা ধর্ম্মে ব্যভিচার

আসিবে। তোমার মতে বিদ্যা বুদ্ধি বিচার পরিত্রাণ করিতে পারে না, এ কথা বলিও না। ঈশ্বর কি দিলেন, বিচার করিও না। যাহা তিনি প্রেরণ করিলেন, যাহা তিনি দিলেন তাহা ভাল, তাহাই অমূল্য রত্ন। যাহা তিনি দিলেন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর, কৃতজ্ঞ হইয়া ভক্তির সহিত স্বীকার কর। বলিও না তিনি ইটী দিলেন, ইটী দিলেন না কেন? যে জন্য তিনি আসিয়াছিলেন সমুদয় অত্যাচার ঘৃণা নিন্দা ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞানের দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে তিনি সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বরের গৌরব স্থাপন করিলেন। কৃতবিদ্যেরা তাঁহার নাম শুনিয়া বিকম্পিত কলেবর হন। এত সামাজিক উন্নতি হইয়াছে, এত বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িয়াছে, অনেক পণ্ডিতও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মত একজনও হয় নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইল, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, স্বর্গের লোক। এখন বিদ্যাচর্চ্চা বাড়িয়াছে, অনেকে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছে। কিন্তু আজও রাজনীতি সংশোধনের জন্য তাঁহার মত ইংলণ্ডের মহাসভায় আর কেহ আন্দোলন করিতে পারেন নাই। বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বান বুদ্ধিমান দিগ্বিজয়ী লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এক এক করিয়া তিনি সকলকে পরাজয় করিলেন, কেহই বিপক্ষতাচরণ করিয়া কিছু করিতে পারিল না। ধনী মানী জ্ঞানী নীচ, সকলে খড়্গহস্ত হইল, তিনি একাকী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার প্রবল বাহুবলের নিকটে সকলে পরাজয় স্বীকার করিল। তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিও না, সাবধান, রামমোহনের জীবন সামান্য জীবন নহে। সে সময়ে তাঁহার মতন কেহ ছিল না, এখন অনেক বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িয়াছে তথাপি কেহ তাঁহার সমান হইতে পারে না, তিনি একা দিগ্বিজয় করিলেন, এ কথায় কি বল? বিধানের বিরোধীগণ, কি বল? অবশ্য বিধাতার বিধান মানুষের নয়। স্বীকার কর, ঈশ্বর যে জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন।

সেবকের নিবেদন (৪র্থ খণ্ড)। ১৮৮৫

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৪ —১৮৭০

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

আমরা পূর্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারী পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারিতলায় হাফ আখড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপা পুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ীটিতে হাফ আখড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণবাবু বগি চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন—দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমেয়াৎ হন—ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোটবাবু অধ্যক্ষ। ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিকে, পইতে গোছা করে গলায়, দাঁতে মিশি। প্রায় আধ হাত চেটালো কালো ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ি রোজকী মৌতাতের উটনো বন্দোবস্ত। পালপার্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড় গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়্‌চেনা—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন্‌ হন্‌ করে চলেচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম্‌ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরে (?) ও দুচার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরাও আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোয়াররাও মিল তাল-দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না। গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তায় ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক

ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জল্‌চে—মজলিশ জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন—"ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফিনি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেব্‌ড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্ হয়ে বসে আছেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেছে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌চেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়চি! ঘরটী লোকারণ্য—খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আছেন—থেকে থেকে ফকুড়িটে টপ্পাটা চল্‌চে—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতোজোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে চেপে রেখে বসেচেন—জুতো এমন জিনিষ যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু এক জন ধরুতা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্ছেন—দু এক জন "তাই ত" বলে দেদার দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথবাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়—ঝড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন!

ধরুতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে "মনালে বঁদিয়া" জিকুর টপ্পা ধরেচেন—গাঁজার হুঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গ্যালো। ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময় একখান গাড়ী গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোটবাবু মজলিশ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বারাণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথবাবু! প্যালানাথবাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—দোয়ারদলে হুরূরে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে

এলেন—শেকহ্যাণ্ড, গুড্ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুকৃতে আধ ঘণ্টা লাগলো ।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। ১৮৬২

দুর্গোৎসব

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধুম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েছে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসরকাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসা-নিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই শাড়ীর গাট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্‌নে কতকগুলি প্রিতিমেফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক "যে আজ্ঞা" "ধর্ম্ম অবতার" প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোসগল্প ও অন্য বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাক-ওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে—পূজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখে জেলেডিঙ্গীর মত তাদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও "আজ যাও" "কাল এসো" "হবে না"

"এবার এই হলো" প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেকুমৎ ছাখে কে! সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম!

হুতোম প্যাঁচার নকশা। ১৮৬২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০—১৯২৬

চিঠিপত্র

স্মরিয়ে তব চরিত্র অনুপম।
মনোমাঝে ঘণ্টা বাজে, নমোনমঃ, নমোনমঃ॥

কবিতাপরাধ মার্জনা করিবেন। এখনো চাতক জলবিন্দুর জন্য হাঁ করিয়া আছে, কিন্তু আর কতদিন—আর কতদিন—যে হাঁ করিয়া থাকিবে। হে অমৃত-বারিদ যাচকের প্রতি সদয় হউন!

সহিয়ে সহিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,
আর সহিতে না পারি।
জিঘাংসা আমার জেনেছে কেদার,
তোমার নিকটে কিন্তু হারি॥

আমি পিপাসাতুর, শুষ্ককণ্ঠ, এই যাহা লিখিলাম এই ঢের; দুই এক ছত্র না পাইলে কলম আর চলে না, আর কিছুদিন আপনার স্নেহের স্রোত বন্ধ হইলে আমি রাগ করিয়া কলম কালি কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঢালিয়া ঢুলিয়া, ছিড়িয়া খুঁড়িয়া একাকার করিব। অতএব এরূপ ভয়ানক দুর্গতি হইতে আপনি আমাকে কোনরূপে রক্ষা করুন।

[রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত]

বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩৫৯

ভাই সতু

তুমি একজন হাড়পাকা co-operator ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত। আমি একজন হাড়পাকা non-co-operator ditto দিগের সহিত। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ্। এ অবস্থায় তকরাতকরি নিষ্ফল। অ্যাক কাজ করা যাক—জ্যোতিভায়া অনুভয় পক্ষ, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানা যাক। জ্যোতি বলিবে, সন্দেহ নাই, যে, বড়দাদা non-co-operation নিয়ে

দিব্য আনন্দে আছেন সে আনন্দে cold water throw করা উচিত হয় না, মেজদাদা co-operation নিয়ে দিব্য আরামে আছেন—সে আনন্দে cold water throw করাও উচিত হয় না। তাছাড়া—ছুই দাদার ছুই আনন্দের ছুইখানা ছবি তুলিতে আমার বড় সাধ গিয়াছে—আমার সেই সাধের মনোরথটির অচরিতার্থ অবস্থায় তাহার কচি মস্তকে বাদবিতণ্ডার গদাঘাত করা ছুই দাদারই অনুচিত কার্য্য। আমার মূলমন্ত্র তাই silence is golden।

[সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩৫৯

শান্তিনিকেতন, ২০ আষাঢ়

ভাই সতু

Minor Scaleএর গীত তোমার মুখে আমি কখনো শুনি নাই—তোমার গত পত্রে তাহা শুনিয়া আমার মন ব্যথিত হইল। The best medicine is

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। গীতা

তুমি যা লিখেছ

"স্মরণশক্তি ছুর্বল হয়ে পড়ছে"

"চক্ষু নিস্তেজ"—

এ কথাটা লেখবার পূর্বে তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, যাঁকে তুমি লিখ্‌চ তিনি তোমার বড়দাদা—সুতরাং তোমার কাছে তিনি হার মানিবার পাত্র নহেন। আমার চক্ষু এবং স্মরণশক্তি ছ্যাক্‌রা গাড়ির বেতো ঘোড়ার মত চাবুকের চোটে ছুই চারি পা দৌড়ায়—আর থেমে দাঁড়ায়; আর-ঘা কতক চাবুকের চোটে আবার ছুই চারি পা দৌড়ে চলে, দৌড়ে চলেই পথের মাঝে থেমে দাঁড়ায়। এই রকম করে আমি কোনো-মত-প্রকারে গন্তব্যপথ অতিবাহন কচ্চি। আর কত দিন এরূপ uphill work টেনে নিয়ে যেতে পারব that is the question। কাজেই আমার মাথার মধ্যে যা কিছু আছে—বেলা থাকতে ঝেড়ে ফেলে—মনস্তরীকে বীতভার করা আবশ্যক। কাজেই ছ্যাকরা গাড়ির অথবা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়া ভগ্নাবশিষ্ট brainএর উপরে নির্দয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—যেহেতু তা বই উপায়ান্তর নাই। আমার রোগের সুপথ্য হচ্চে—brain বেচারীকে বিশ্রাম করানো—কিন্তু গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে মুহুর্মুহুঃ চাবুক না কষিলে তাহার

যেন হাত সুড়সুড় করে, আমারও তেমনি একটা রোগ জন্মিয়াছে। করুণাময় বিশ্ববিধাতা তোমাকে শান্তি বিধান করুন এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।
[সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩:৯

গীতা পাঠের ভূমিকা

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্‌গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে—আমাদের এই ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। উহা হইতে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উদ্‌গীরিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দেশের বায়ু পবিত্র হইতেছে; আর সেই বাষ্পনিচয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান। আমার শরীর যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—কোনো কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে যখন আমার মন উঠিতেছে না, সেই সময়ে একছিটা অমৃত আমার গায়ে লাগিল; তাহা এই যে, "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েৎ" আত্মার বলে আত্মাকে টানিয়া তুলিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। এই আরোগ্যদায়িনী কল্যাণ-বাণীর মন্ত্রবলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুটীরের যথাসর্ব্বস্ব কাঙালের সম্বল আশপাশ হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে জড়ো করিয়া থাল সাজাইয়া আনিয়াছি—শান্তিনিকেতনের সজ্জনসেবায় তাহা বিনিয়োগ করিয়া ধন্য হইব—ইহারই প্রত্যাশায়। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া—"ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি; এবং তাঁহার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ভগবদ্‌গীতার প্রথম পঁইঠাতেই সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার সে যে সাংখ্য তাহা কি এই সাংখ্য অর্থাৎ যাহা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে আর্য্যাচ্ছন্দে স্থত্রপরম্পরায় গ্রথিত হইয়াছে—সেই সাংখ্য ? না তাহার অধিক আর কিছু? এবিষয়ের মীমাংসার জন্য দার্শনিক পুরাতত্ত্বের অন্ধকার হাতড়াইয়া বেড়াইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যকারিকাগ্রন্থের মূল রচনাগুলি সমস্তই গীতার অনুমোদিত। এইজন্য গীতার ব্যাখ্যায় সহসা প্রবৃত্ত না হইয়া ভূমিকা স্বরূপে সাংখ্যদর্শনের ভিতরের কথাটা বিবৃত করা আবশ্যকবোধে অগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। সমগ্রভাবে সাংখ্য দর্শন পর্য্যালোচনা করিবার স্থানও এ নহে, কালও এ নহে, আর, যাহা কর্তৃক তাহা হইতে পারা সম্ভব সে মানুষও আমি নহি। আমার বিবেচনায়, আমাদের দেশের ভাষ্যকারদিগের প্রচলিত প্রথা অনুসারে সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে সাংখ্যের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি সোজাসুজিভাবে সুকৌশলে বাহির করিয়া আনাই সংকল্পিত অভীষ্ট সাধনের সুচারু পন্থা—সেই পন্থা অবলম্বন করাই এস্থলে আমার পক্ষে কর্তব্য! সাংখ্যকারিকার প্রথম স্থত্র এই :—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ জিজ্ঞাসা"

আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্য-বস্তুঘটিত, আপনা ঘটিত, এবং দেবতাঘটিত, এই ত্রিবিধ দুঃখের কিরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। "তদভিঘাতকে দৃষ্টে হেতৌ সা অপার্থাচেৎ" যদি বল "দুঃখ বিনাশের উপায় তো কাহারো অবিদিত নাই; চিকিৎসাদি দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে, প্রিয়সম্মিলনাদির দ্বারা মনোগ্লানি নিবারিত হইতে পারে, দেবার্চ্চনাদি দ্বারা দৈবকোপ নিবারিত হইতে পারে—এ তো সকলেরই জানা কথা; জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।" "না-না"; "একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ" সাধিতব্য বিষয় এখানে দুঃখের শুধু-যে-কেবল ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ তাহা নহে পরন্তু দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ—দুঃখ যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও ভোক্তাপুরুষের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে না পারে তাহারই জন্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। ও-সকল লোক-প্রচলিত উপায় দ্বারা দুঃখের আংশিক এবং ক্ষণিক বিনাশ বই ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

গীতা-পাঠ। ১৮১৩

আর্য্যামি এবং সাহেবি আনা

আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তন হয় নাই সেই মান্ধাতারও পূর্ব্বের আমলে একটি নবাভ্যাগত পরাক্রমশালী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতিভেদের সবে-মাত্র গোড়া পত্তন আরম্ভ হইয়াছে সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্য্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন-বর্ণ সম্বলিত একটি জেতৃজাতি বুঝাইত এবং শূদ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত দস্যুগণ বুঝাইত। এই প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিকে যদি একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা যায় তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি বৈশ্য; কিন্তু এখনকার এই কলিযুগে সে মৎস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানিমাত্র অর্থাৎ একা কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাও না থাকারই মধ্যে; কেন না, কাল-রাক্ষস কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—বিশেষতঃ অমন একটা শাঁসালো সামগ্রীকে! বলিব কি—নিদারুণ রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্যের দশযোজন-ব্যাপী মুড়াখানির ভিতর হইতে সমস্ত রস-কস শুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে—তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট রাখে নাই! ফলেও তাই দেখা যায় যে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মস্তকের উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর-অঞ্চলে শাস্ত্র-চিন্তার পরিবর্ত্তে অন্নচিন্তা বলবতী! এক্ষণকার ব্রাহ্মণও যেমন তাঁহার উপনয়নের শ্রীও তেমনি! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী কোথায় বারো বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন—তাহা না করিয়া তিন দিবস কারাগৃহে বাস করিয়া নিছক আলস্যে দিনপাত করেন! পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা সত্যসত্যই উপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা প্রত্যহই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূত্রে প্রত্যহই তাঁহারা গণ্ডা-গণ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের সাদা পৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন ব্রহ্মচারী শূদ্রের ভয়েই অস্থির—পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনোগতিকে তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তিনি তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন! ইহার অর্থ আর

কিছু না—"আমি যখন শূদ্রের মুখ দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাস করিতেছি।" মনকে প্রবোধ দিবার কী চমৎকার যুক্তি কৌশল! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—বালকেরা জলশূন্য ক্ষুদ্র কল্‌সীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যাইবে! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই —দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষেই সাহেব—এ বৃত্তান্তটি প্রমাণাভাবে মারা পড়িয়া যাইবে! এ সিদ্ধান্তটিও তেমনি যে, শূদ্রের মুখ নূতন ব্রহ্মচারীর নয়নগোচর হইলে তিনি যে তপোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন—এ বৃত্তান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যাইবে! এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এগুলি হচ্চে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যান্ধ মস্তিষ্কের সৃষ্টি! একজন নৈয়ায়িক স্মার্ত্তবাগীশ বলিতে পারেন, কলিযুগের বিধান তিন দিবস কারাগৃহে বদ্ধ থাকার নামই বারো বৎসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা! তাহা যদি তিনি বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারেন যে কলিযুগের বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শূদ্রের নামই ব্রাহ্মণ!

মুড়া যিনি ব্রাহ্মণ—তাঁহারই যখন এই দশা, তখন, পেটি যিনি ক্ষত্রিয় তাঁহার তো কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক—কঙ্কালখানা আছে; পেটির আবার তাহাও নাই! কাল-রাক্ষস এমনি তাহাকে নিকিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কাররূপে উদরস্থ করিয়াছে যে, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামের কোপাগ্নিকেই আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমরা আমাদের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে রাম সিংহ, লছমন সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের সিংহরা নামেই সিংহ; তা ভিন্ন ভারতের এ মুড়া হইতে ওমুড়া-পর্য্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার ত্রিসীমার মধ্যে তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন! ত্রেতাযুগের পরশুরাম যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন—দ্বাপর যুগের কুরুক্ষেত্র তাহা নিঃশেষিত করিয়া ছাড়িয়াছে। বৈশ্য আবার ততোধিক রহস্য! বর্ত্তমান অব্দে কে যে

বৈশ্য আর কে যে বৈশ্য নয় তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!" খুব সম্ভব যে, পুরা-প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের দ্বিমুণ্ড রাক্ষস ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ বলে, সমস্ত বৈশ্য-শোণিত উদরস্থ করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিল, তখন সেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগের কঠোর অব্দে আর্য্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাদে একা কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট। বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আর্য্য-শব্দের সাহায্যে তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে বলিতে পারি না। তিন-বর্ণই যখন নাই—তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক বর্ণই কেবল আছে—তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা নিতান্তই "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া"—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। তবে কি একা কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্য্যের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাহ্মণ বেচারী অ্যাকে মরিয়া রহিয়াছে,—সেই মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা দেওরা হইবে। রাজ-পুরুষেরা আমাদের দেশের কোনো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman-এর Certificate প্রদান করিলে তাহাতে যত তাঁহার মানমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে, পূর্ব্বে ইঁহার মাথায় তেল ছিল না—দয়ার্দ্রচিত্তে আমরা ইঁহার মস্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ইঁহার পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না—আমরা ইঁহার হস্তে জেণ্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোঘ মন্ত্র-বলে আজ অবধি ইনি ভদ্রলোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন! আমাদের দেশের কোনো চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে Gentleman এর Certificate প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে আর্য্য উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। ফলে, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর্য্য বলিলে ব্রহ্মণ্যদেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ'ন; তাঁহার রোষের কারণ এই যে আর্য্য তো সকলেই—ক্ষত্রিয়ও আর্য্য—বৈশ্যও আর্য্য—এবং কলিযুগের নূতন শাস্ত্র অনুসারে যাঁহার লোহার

সিন্ধুকে টাকা আছে কিম্বা নামের অন্ত-ভাগে দুই চারিটি ইংরাজী অক্ষর আছে তিনিই আর্য্য ! ব্রাহ্মণ তো আর সেরূপ আর্য্য নহে ! শাস্ত্রের বিধান মতে ক্ষত্রিয়বীর্য্যও ব্রহ্মতেজের নিকটে নত-মস্তক ! তা'র সাক্ষী—বাল্মীকি রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" ক্ষত্রিয় বল ছার বল—তাহাকে ধিক্ ! ব্রহ্মতেজই—বল ! ভাগীরথী শুধুতো আর নদী ভাগীরথী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী ; তেমনি, ব্রাহ্মণ শুধু তো আর আর্য্য-শর্ম্মা নহে শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেব শর্ম্মা। গঙ্গা-স্নানকে গঙ্গাস্নান না বলিয়া কেহ যদি বলেন নদী-স্নান, তবে তাহা শ্রবণ মাত্র—এমন যে শীতলসলিলা দেবী, ভাগীরথী, রোষের বাড়বানলে তিনিও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওঠেন না ! তেমনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজকে ব্রহ্মতেজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্যতেজ"—ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র না বলিয়া বলেন "আর্য্য-শাস্ত্র"—ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রাহ্মণ-জাতি না বলিয়া বলেন "আর্য্য-জাতি", তবে তাহাতে ব্রহ্মণ্যদেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা।

আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা। ১৩১৭

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪২-১৯২৩

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদাদার লেখার যে একটি মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জল-ভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখাসকল যে পর্য্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হ'তেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে 'কাল' দাই' বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে

একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন ; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্টি লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার কাছ থেকে কার্য্যগতিকে অনেক দিন পৃথক্ হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায় ? 'তে হি নো দিবসাগতাঃ'—সত্য কিন্তু মনোরাজ্যে সেসব দিন চিরদিনই জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সেকালের দু-একটি ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে ; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হ'ল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালিগালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোকে বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই —তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল। একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পিঠ চাপ্‌ড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে

আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণী' এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিয়ে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড়কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থূল বেধে গেল। সে কোথায় খোঁজ খোঁজ। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হ'ল, তারা দ্যাখে সে কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।•

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস। ১৯১৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

১৮৫৩—১৯১০

অভিমান

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলঙ্কৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্খা ক্রমেই উর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পর-শ্রীতে তাহার কাতরতা হয় না। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভিমানী কাপুরুষের মত, অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্ত্তে শতবার মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল, আর ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্ব্বল-কর-নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে রোমে রোমে বিদ্ধ হইয়াও, তাঁহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচপ্রকৃতি ও স্বার্থপর, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্ম ব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপট-কুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি

করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। পক্ষান্তরে, যে জাতীয়দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদের রীতি-নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহার সাক্ষী থাকেন। সিদ্ধি হউক, কি না হউক, তদর্থ তাহারা ব্যস্ত হয় না; সাধন-পদ্ধতিতে কোনরূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়, ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা।

প্রভাত-চিন্তা। ১৮৭৭

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৪—১৯১১

যার কেউ নাই, তার হরি আছে

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বিদ্যার ন্যায় ধন নাই; অন্য বস্তু আগুনে পোড়ে, জলে ডোবে, চোরে লয়, এবং বিনা বিঘ্নে ব্যবহার করিলেও ক্ষয় পায়। কিন্তু বিদ্যার সে সমস্ত বিড়ম্বনা নাই; বরং ব্যবহারে পরিমার্জ্জিত এবং দানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরাও ভ্রমররূপে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া বিবিধ বিদ্যালয়রূপ পুষ্পবৃক্ষে রং বেরং অধ্যাপক-রূপ পুষ্প হইতে টিপ্পনী সংক্ষিপ্তসার ধাতু, ও "সামন্তরাল বাক্য"* প্রভৃতি রূপ মধু মুখস্থ করিয়া খাতারূপ মৌ-চাকে সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষকরূপ দুষ্ট বালকগণ অধিকাংশ মধু গালিয়া লইয়া ছিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পত্রলেখা-রূপ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে তাহাও গিয়াছে; এমন কি গ্রন্থকার একখানি পত্র লেখাতে তাঁহার একজন স্পষ্টবাদী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত পত্রে যে মধু খরচ হইয়াছে, গ্রন্থকার মহোদয় ছয় মাসেও তাহার পূরণ করিতে পারিবেন কি সন্দেহ। কোন্ মধু ছড়াইবার আশায় গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিতে সাহস সহকারে প্রমত্ত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা তোমার-আমার-মত লোকের কর্ম্ম নয়। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত বিদ্যাধনের ক্ষয় আছে; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পণ্ডিতগণের বাক্য আমাদের পক্ষে খাটে না। কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন সমগ্র পৃথিবী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইরূপ বিদ্যার ব্রহ্মাণ্ড নয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে সম্ভবত আমাদেরই বেলা

* Parallel passages

ব্যভিচার, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণের উক্ত কথাই নিয়ম। আমাদের এ বিশ্বাস জন্মিবার কারণ এই যে, আমাদেরই দলের দুই এক জন আমাদের অবস্থার ব্যতিক্রম দেখাইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

কঠোর করিয়া অকাতরে নরেন্দ্রনাথ রাজহাটের বালকদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। দুই মাস চাকরী করা হইল, নরেন্দ্রনাথ এক পয়সাও বেতন পাইলেন না; ঠাকুরবাড়ীতে দুই বেলা যাহা পাইতেন, তাহাতে "গ্রাসের" জন্য চিন্তা ছিল না; কলিকাতা হইতে যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাতেই এই পর্য্যন্ত তাঁহাকে আচ্ছাদনের কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি কর্ম্মত্যাগের দুরভিসন্ধি একবারও তাঁহার পবিত্র মনকে কলুষিত করে নাই। এই জন্যই আমরা বলিলাম যে; "কঠোর করিয়া" এবং "অকাতরে" এবং "বিদ্যাদান" নরেন্দ্রনাথ এই তিনই করিতেছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, নরেন্দ্রের শরীর বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিছুই ক্ষীণ হইল না। সত্য বটে, নরেন্দ্রনাথ রাজহাটে সকলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতেন, "ব্রাহ্মের" নামোল্লেখ করিতেন না; কিন্তু ধর্ম্মের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে দেশের উন্নতি, যাহার পথ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি; তাহা নরেন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ তাঁহাকে বাপান্ত-বাগীশের মৃত্যুসংবাদ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হওয়ার সমাচার আনিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া ধর্ম্মসাগরে আত্মাকে জন্মের মত ডুবাইতেন। আর নরেন্দ্রনাথের বিদ্যা?—তাহা ত পুরুভুজের মত বাড়িতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের ইংরাজী-শিক্ষকের মত হতভাগ্য জীব আর দ্বিতীয় নাই; গ্রামের লোকের সংস্কার থাকে, "ম্যাষ্টার"-কুল চৌদ্দ ভুবনের খবর দিতে বাধ্য। কেহ গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল; প্রাণভয়ে ম্যাষ্টারের একটা-না-একটা উত্তর দিতেই হইবে। কেহ অশৌচ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে। কেহবা শরা অনুসারে আবদুল খালেকের ফুফার জায়দাদ, ফৌত হইলে কে পাইবে জিজ্ঞাসা করিল। গ্রামের লোকের নামে ডাকে যে সমস্ত পত্র আইসে, তাহার প্রায় সমস্তই শিক্ষক বাবুকে পড়িয়া দিতে হয়। ফলত লাঙ্গল এবং ঘানি ভিন্ন পাড়াগাঁয়ে শিক্ষক সকল কার্য্যেই লাগেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা এই উপলক্ষে বিদ্যা বাড়াইয়া লন; যাহারা বোকা, তাঁহারা জীবন এবং শিক্ষকতা একার্থবোধক করিয়া লন। নরেন্দ্রনাথ আপাতত উভয় দলে থাকিলেন।

রাজহাট বিদ্যালয়ের বালকগণকে নিয়ত "গরু" এবং "গাধা" বলিতে বলিতে শিক্ষকজাতির অনিবার্য্য নিয়মানুসারে নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে প্রকৃতই "গরু" এবং "গাধা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু জড়ভরতের কথা তাঁহাদের উপরেও যে খাটে, এটা তাঁহার বোধগম্য হইল না। পক্ষান্তরে খরজীর ডাকের চিঠির ঠিকানা লিখিতে লিখিতে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কেরাণী-গিরির বীজ রোপণ করিতেছিলেন ; খরজীর জ্ঞাতিকুটুম্বের ছেলের কাঁথা শেলাই এবং পরিবারস্থ সকলের রিফুর কর্ম্ম করিয়া নরেন্দ্রনাথ সূচীকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন ; এবং সর্ব্বোপরি গ্রামস্থ দুই চারিজনের নাড়ী টিপিয়া, তিনিও একজন ওলাওঠা সর্পদংশন প্রভৃতির মধ্যে হইয়া উঠিলেন। যখন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, গ্রামের চাঁদার টাকা ইত্যাদি সমস্ত (অবশ্য তাঁহারই ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য) খরজীর হস্তে বা শরীরের অন্য কোন দেশে মজুত হইতে লাগিল, তখন ছাত্রদল বেতনের টাকায় রাণীগঞ্জ হইতে ঔষধাদি আনাইয়া দেশে কস্মিন্‌কালেও দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আরও একটি ফল হইল। নরেন্দ্রনাথ ঔষধের বলে অনেক পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস অজ্ঞাত, একজন বিশিষ্ট কুলীনের সন্তান। ইঁহার প্রথম বিবাহের পর শিবত্ব প্রাপ্তি হয় ; অর্থাৎ ইনি আবকারীর মুরুব্বী হইয়া উঠেন। অর্থের কিছু অনটনপ্রযুক্ত বিষ্ণুরাম একদা "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করেন এবং সেই উপলক্ষে ইঁহার আত্মপরে তুল্যবোধ দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুর ইঁহাকে যত্নের সহিত নিজ ভবনে রাখিয়া ছয় মাস কাল পরিচর্য্যা করেন। যে কারণেই হউক, ছয় মাস গত হইলে একমাত্র কোম্পানীকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় বহুপ্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া বিক্রমপুরের ভাগ্যধা চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক টাকা লইয়া সেখানে নিজের কুল ভাঙ্গিলেন। টাকা চিরদিন থাকে না। কিন্তু টাকার গরজ চিরদিনেও যায় না, সুতরাং বিষ্ণুরাম বেগের সহিত বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্ব সমেত পঁয়ত্রিশটি বিবাহ হইয়া গেলে, তিনি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পঁচিশ বৎসরের এক বালিকাকে কুমারী দেখিয়া, বিষ্ণুরাম সদয়চিত্তে "বোঝার উপর শাকের আটি" করিলেন,—এবং ত্রিরাত্র এখানে বাস করিয়া নিরুদ্দেশ

হইলেন। বিবাহের অষ্টম মাসে বিষ্ণুরামের নবপরিণীতার গর্ভে এক নবকুমারী জন্মিল। নবকুমারী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় যথাকালে আসিয়া নবকুমারীকে আটচল্লিশ নম্বরে বিবাহ করিল। নবকুমারীর নাম বিমলা; বয়স এক্ষণ তেইশ বৎসর। ইহার মধ্যে রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় দুইবার রাজহাট আসিয়াছিলেন। রামকিশোরের শেববার আগমনের পর দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল।

সাত বৎসর বয়স্ক অতুলচন্দ্র নামে বিমলার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। আমাদের দেশের প্রথা এই যে, স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে, এবং অপরিচিত—(এমন কি, কখন কখন পরিচিত) পুরুষের সম্মুখে তাহারা কখনই আইসে না। পাঠকসম্প্রদায় যে নিতান্ত অপরিচিত, এ কথা ভুলিয়া গিয়া বা মনে না করিয়া অনেক প্রশস্ত-চিত্ত গ্রন্থকার দেশের রীতির বিপর্য্যয় করিয়া তুলেন। আপনি ঘরের খবর জানেন বলিয়া বিশ্বাসহন্তা গ্রন্থ-লেখক, নায়িকা, উপনায়িকা, অনায়িকা আবশ্যক অনাবশ্যক সমস্ত স্ত্রীলোককে সশরীরে পাঠকগণের সমক্ষে টানিয়া আনেন। আমরা ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি, যখন তখন ব্যবহারের বিরোধ করিতে পারিব না; বিমলা দেখিতে শুনিতে কেমন, ইহা জানাইবার প্রয়োজন সত্ত্বেও আমরা তাহাকে বাহির করিতে পারিব না। অতুলের চেহারা দেখিয়া লক্ষণ দ্বারা যদি কেহ বুঝিতে পারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। দোষও নাই, আর যিনি বুঝিবেন, তাঁহাকেও দোষ দিব না। (আর একটু ধৈর্য্যভিক্ষা) ভাই যদি কুৎসিত হয়, তাহা হইলে সে ভ্রাতার চেহারা দৃষ্টে ভগিনীর রূপের অনুমান বিষয়ে দুই এক জন কখন কখন ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, সেরূপস্থলে আপত্তিকারীর পক্ষপাত জন্মিবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবেই থাকিবে। সাক্ষী,—আমাদের প্রতিবেশী—বাবু।

অতুলের মা অতুলকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সাত বছরের ছেলে শ্রীমান্ অতুল বাপাজীবন কাপড় পরিতে ভাল বাসিত না; এজন্য প্রায়ই তাহার বিদ্যালয়ে যাওয়া ঘটিত না; ঘুন্‌শী-কোমরে অতুলচন্দ্র বাটির সম্মুখস্থ পেয়ারা গাছে উঠিয়া থাকিত। অতুল যখন গাছে থাকিত, তখন তাহাকে স্থানভ্রষ্ট বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইত না। অতুলের চুল ও ভ্রূ কটা, মুখের ছাঁদ বাঁদুরে।—নাক কিছু চাপা, কাণ দুখানি পাতলা এবং বড়, রং লোমাবৃত হনুমানের ন্যায়। মহাদেবের বংশে মস্তকের কিছু

বাড়াবাড়ি; স্বয়ং শিবের পাঁচ মস্তক, কার্ত্তিকের ছয়টি, গণেশের ত হাতীর মাথা। চারিদিক বিবেচনা করিয়া আমাদের ভরসা জন্মিয়াছে যে, অতুলের মস্তকটি দুটি মাথার সমান হইলেও কেহ তাহাকে অযত্ন করিবেন না। অতুলের হাত দুখানি মহাভারতে বর্ণিত রাজাদের হাতের মত, সরু এবং লম্বা।

নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রের নজীর মানিতেন না। এই জন্য অতুল দশে পাঁচে বিদ্যালয়ে গেলে নরেন্দ্রনাথ ছড়ি দিয়া অতুলের পিঠের রং পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। প্রিয়তম নরেন্দ্র, আমাদের কথা শুন, অতুলের সঙ্গে আর এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। আর, যদি আমাদের কথা এখন যদি না মান তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যেন অতুলের সঙ্গে এমনি ব্যবহার থাকে।

রবিবারের সূর্য্য রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কেন, তাহা বলিতে পারি না। সমস্ত দিনমানের মধ্যে রাত্রি আসিল না দেখিয়া সূর্য্য কিছু ব্যস্ত হইল, কিছু রাগান্বিত হইল; রজনী লুকাইয়া আছে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ধরিবার আশয়ে (—এটা আমাদের অনুমান মাত্র—) সূর্য্য আন্ধার-গৃহে প্রবেশ করিল। অমনি চাতুরি-রহস্যপ্রিয়া সদ্যঃপ্রবিষ্টযৌবনা কামিনীর ন্যায় সন্ধ্যা আকাশময় দীপ জ্বালিয়া দিল, এবং সূর্য্যকে সমস্ত রাত্রি রজনীর অন্বেষণে ঘুরাইয়া অপ্রতিভ করিবার মানসে, রজনীকে জগতে আনিয়া রাখিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেল।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নয়ন মুদিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। মুখে আহার লইয়া ঢোঁড়া সাপ যেমন এক একবার গোঁ গোঁ শব্দ করে, নরেন্দ্রনাথ সেইরূপ মাঝে মাঝে অস্ফুটধ্বনি করিতেছিলেন। তাঁহার একজন সুহৃদ একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র উপাসনাকালে এইরূপ শব্দ করিতেন; কিন্তু সুহৃদের কথায় বিশ্বাস করা, না করা, পাঠকবর্গের ইচ্ছাধীন। যাহা হউক, কিঞ্চিৎকাল পরেই নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় ছাত্র অতুলচন্দ্র উলঙ্গবেশে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অদ্ভুত সমবেদনার বলে অতুলের মুখশ্রী নরেন্দ্রনাথের মুখে প্রতিবিম্বিত হইল। নরেন্দ্র একখানি পুস্তক, একগাছা ছড়ি, একটা কোন-কিছু হাত বাড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, অথচ সম্মুখের গুটিকত দাঁত অল্প বাহির করিয়া, অতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন ঘাড় বাঁকাইয়া, ডান হাতে, ডান কাণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে চুলকাইতে একটু ফোঁস্ ফোঁস্ সুরে অতুল বলিল, "মা বললে, মাষ্টার মহাশয়কে ডেকে নে আয়, দিদীর ব্যামো হয়েছে,

তাই আমি—।" কথা শেষ না হইতেই অতুল প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ; নরেন্দ্রনাথ অমনি গলিয়া গেলেন ; বলিলেন "তুই আবার কাঁদিস্ কেন ? যা তোর মাকে বল্‌গে আমি যাচ্ছি।" মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে, আর চোকে চাহিতে চাহিতে অতুল ত চলিয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র ! "দিদির ব্যামো," শুনিয়া তুমি ননীর পুতুলের মত হইলে কেন ?

কল্পতরু। ১৮৭৪

চন্দ্রনাথ বসু

১৮৪৪—১৯১০

আনন্দমঠ

আনন্দমঠের কার্য্য সচরাচর সংসারধর্ম্মের কার্য্য নয়—আনন্দমঠের ছবি সংসারধর্ম্মের ছবি নয়। আনন্দমঠের কার্য্য একটি বিশেষ কার্য্য, সচরাচর বা every-day life-এ মানুষ যে কার্য্য করে না সেই কার্য্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা—এই কার্য্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য্য নাই—তাহারা যতক্ষণ আমাদের সামনে আছে ততক্ষণ তাহাদের সেই একমাত্র কার্য্য—সেই কার্য্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি, পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—সে কার্য্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটি মাত্র ব্যক্তি-স্বরূপ হইয়া উঠে না ? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই। স্পার্টাবাসীরা এক উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করিত। তাই সমস্ত স্পার্টাবাসীকে একটিমাত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভেদ সব সেই এক উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছিল। রোমের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সামরিক প্রাধান্য। অতএব প্রত্যেক রোমানকে সেই এক উদ্দেশ্যের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হইত—যেন সকল রোমানই এক ছাঁচে ঢালা। কার্থেজ যখন রোমের সহিত সংঘাতিক সমরে নিযুক্ত তখন সমস্ত কার্থেজবাসী একটি ব্যক্তিস্বরূপ—একমন, একপ্রাণ, এক-নিশ্বাস, এক-উদ্দেশ্য। যেন সকলেই

এক ছাঁচে ঢালা। ইংরাজের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য—অতএব সকল ইংরাজই যেন একমাত্র বাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি—সকলেই এক ছাঁচে ঢালা হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম-ময়—সকল হিন্দুই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ইউরোপের নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ইউরোপবাসী ক্রুজেডে যাইতেছে—যেন সেই লক্ষ লক্ষ লোক সব এক দেশের লোক—এক-মনা লোক—এক ছাঁচের লোক। ক্রম্‌ওয়েলের অসংখ্য Ironsides সবই এক ছাঁচে ঢালা—যেন তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। এক-ব্রতীরা যতই এক-ব্রত হইতে থাকে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ ততই লোপ হইতে থাকে। শেষে যখন সমস্ত এক-ব্রতীরা এক-ব্রতী হইয়া পড়ে তখন তাহারা একটি regiment-এর সৈন্যগণের ন্যায় একটি ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে—তখন নাম ও নম্বর ভিন্ন তাহাদিগকে চিনিবার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি এইরূপ বুঝি যে আনন্দমঠের পাত্রগণকে যদি আপনার কেবলমাত্র নাম ও নম্বর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে এক-ব্রতীরা যথার্থই এক-ব্রতী হইয়াছে—বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য যথার্থই সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা—এক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অথবা এক-ব্রতী লোকদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা তাহারা নিজে করে না—কে যেন তাহাদিগকে সেই সব কার্য্য করায়। যে করায় সে হয় একটি idea নয় একটি ব্যক্তি। স্পার্টাবাসীরা যে সব কার্য্য করিত তাহা তাহারা নিজে করিত না, Lycurgus নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। ক্রম্‌ওয়েলের onside সৈন্যগণ যাহা করিত, তাহা তাহারা নিজে করিত না, ক্রম্‌ওয়েল নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। নেপোলিয়নের সৈন্য যাহা করিত তাহা নেপোলিয়ন নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। হিন্দুরা যেরূপে সংসারধর্ম্ম করে তাহা তাহারা নিজে করে না; মনু নামক জাদুকর তাহাদিগকে করান। আজিকালি জার্ম্মাণেরা যাহা করিতেছে তাহা তাহারা নিজে করিতেছে না, বিসমার্ক নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে। সকল মহৎ কর্ম্মই জাদুকরে করে, মানুষ নিজে করে না। বিশেষ যখন এক-ব্রতীরা একত্র হইয়া কোন মহৎ কর্ম্ম করে তখন তাহারা নিজে তাহা করে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করায়। অতএব আপনাকে যে বোধ হইয়াছে যে আনন্দমঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে, ইহাই আমার মতে আনন্দমঠের success-এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সত্যানন্দ যথার্থই

ভেল্কী। হ্যানিবল, আলেক্‌জন্দার, ক্রম্‌ওয়েল, নেপোলিয়ন, মায়রাবো, পেরিক্লিস, লাইকরগস্‌, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, মনু—সকলেই তাই। আমারও সত্যানন্দকে ভেল্কী বলিয়া মনে হইয়াছে এবং সেই জন্যই আমি বলি যে আনন্দমঠ অতি চমৎকার success.

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত : ১২৯১ বঙ্গাব্দ]

বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১২৪৪

ফুলের ভাষা

ফুল, তুমি চিরকাল ভাবরূপী। স্বর্গ কেহ কখন বুঝিল না; স্বর্গ চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, তোমাকেও কেহ কখন জ্ঞানের দ্বারা বুঝিল না; তুমি চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, এমন ভাব নাই যাহা তোমাতে দেখিতে পাই না। গাম্ভীর্য্য বল, প্রফুল্লতা বল, নম্রতা বল, লজ্জাশীলতা বল, সরলতা বল, উল্লাস বল, শোক বল, বিষাদ বল, বিমর্ষ বল, চপলতা বল, সঙ্কোচ বল, সকলই তোমাতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইতে হয় তাহা জানি না। কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? তোমাতে যখন যে ভাব দেখি, তখনই সেই ভাবে ভোর হইয়া যাই, তখন সমস্ত জগৎ সেই ভাবে ভোর বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বুঝাই? আর বুঝাইলেই বা বুঝিবে কে? সকলেই ত আমার মতন তোমার ভাবে ভোর। তুমি ক্ষুদ্র ফুল, তোমার শক্তি অসীম। যেখানে তুমি, সেখানে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সেখানে সবই তুমি। ক্ষুদ্র ফুল, তুমি অমোঘ মন্ত্র। তোমার ভাবরূপ নিশ্বাসে সকলই গলিয়া ভাবময় হইয়া যায়। পাথরের পাহাড়ে তুমি হাসিলে পাথরের পাহাড়ও হাসির পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। ফুল, তুমিই পৃথিবীর ভাবের ছাঁচ! তুমিই পৃথিবীতে ভাবরূপী মন্ত্র।

আর সেই জন্যই, ফুল, তুমি সুন্দর ও সৌন্দর্য্য। জগতে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি আকাশ সৌন্দর্য্যময়। আবার আকাশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর প্রদেশ, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যময়, সৌন্দর্য্যের উৎস বলিয়া মনে হয়। এ সৌন্দর্য্যের অর্থ কি? এ সৌন্দর্য্য কিসে হয়? অনেকে

ভ্রান্ত হইয়া এই কথার কত ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে, বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—বর্ণ বিশেষ সৌন্দর্য্যের কারণ বা উপাদান। যাহাতে সে বর্ণ আছে তাহা সুন্দর, যাহাতে সে বর্ণ নাই তাহা সুন্দর নয়। ফুল তোমাকে দেখিলে ত এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমাতে কোন্ বর্ণ নাই ?—নীল, পীত, হরিৎ, শ্বেত, যত বর্ণ আছে এবং যত রকমের বর্ণের সংযোগ এবং মিশ্রণ হইতে পারে সকলই ত তোমাতে আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে বর্ণ বিশেষের গুণে সৌন্দর্য্য ? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকার বিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—আকার বিশেষ সৌন্দর্য্যের উপাদান। কিন্তু, ফুল, তোমাকে দেখিলে এ কথাও ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তোমাতে অনেক আকার দেখিয়া থাকি। কিন্তু তোমাকে যে আকারে দেখি তুমি সেই আকারেই সুন্দর। তবে কি, ফুল, তুমি সৌরভের গুণে সুন্দর ? তাই বা কেমন করিয়া বলি ? কত ফুল ফোটে যাহার সৌরভ নাই, কিন্তু সে ফুলও ত সুন্দর। তাই বলি, ফুল, তুমি কেবল তোমার ভাবের গুণে সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। এবং তুমি, ক্ষুদ্র ফুল, তুমিই জগৎকে এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেও যে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। একজন ইংরাজ কবি জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন –

It is a sigh made stone !

যিনি এ কথা বলিয়াছেন তিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।—তিনি বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্য চোখে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, ভাই সকল, যদি সুন্দর হইতে চাও, যদি জগতের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হও তবে ফুলের কাছে যাইও, ফুল তোমাকে শিখাইয়া দিবে যে সৌন্দর্য্য রূপে নাই, সৌন্দর্য্য গুণে, সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, রঙে নাই, সৌন্দর্য্য ভাবে। ফুলের কাছে এই শিক্ষা লইয়া ফুলের ভাবে ভরিয়া থাকিও, দেখিবে তোমাদের সুখের সীমা নাই, তোমাদের অদৃষ্টচক্র অনন্ত উন্নতির পথে ঘুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ফুল, তোমাকে হৃদয়রূপেই দেখি, ভাবরূপেই দেখি, আর সৌন্দর্য্যরূপেই দেখি, তুমি যে কি রহস্য তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখ যখন সন্ধ্যার মৃদু-মধুর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেবালয়সম্মুখস্থ শেফালিকা-মূলে উপবেশন করি, তখন আমার ক্ষুদ্র দেহের সামান্য সংঘর্ষে রাশি রাশি শেফালিকা বৃন্তচ্যুত

হইয়া চারিদিক্ ছাইয়া ফেলে; অথবা যখন প্রাতঃকালে সঞ্জীবনী সমীরণে উৎফুল্ল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন কেবল মাত্র আমার গমনজনিত বায়ুসঞ্চালনে ঐ প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কামিনীবৃক্ষ হইতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনী ফুল ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়ে! এ দিকে ত দেখি, তুমি এমনি কোমল, এমনি অসহিষ্ণু, এমনি ভঙ্গুর যে শুধু যেন একটু নিশ্বাস গায় লাগিলে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি এক রকম হইয়া যাও। কিন্তু আবার ঐ দেখ দেখি ওখানে তোমাকে কি ভিন্ন প্রকৃতির দেখিতেছি। ঐ দেখ আজ মহাসমুদ্রে নিদাঘ-ঝটিকা উঠিয়াছে। অপরাহ্ন-রবি অদৃশ্য হইয়াছে। আকাশ মেঘ-যুদ্ধে সংক্ষুব্ধ। অসংখ্য মেঘখণ্ড ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে অনন্ত আকাশে পরস্পরকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; এক এক খানা মেঘ ক্রুদ্ধ হইয়া অপর মেঘের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে এবং বিকট শব্দে চমকিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের নীল জল কাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল জলে প্রচণ্ড ঝটিকোত্থিত ভীষণ তরঙ্গ সকল নভোমণ্ডলস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে তাড়না করিতেছে এবং রাগে ফেনা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। আকাশে মেঘ-গর্জ্জন, সমুদ্রে তরঙ্গ গর্জ্জন, আকাশ-সমুদ্রে ঝটিকা-গর্জ্জন, আর সেই সমস্ত গর্জ্জনরাশি ভেদ করিয়া ঝটিকা-পক্ষীর উৎকট চীৎকার—যেন এই মহাপ্রলয়ের অন্তরাল হইতে প্রলয়শক্তি প্রলয় তূর্য্য ধ্বনিত করিতেছে। এই মহাপ্রলয়ে পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড অর্ণবযান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। বড় বড় মোটা মোটা পাল তরঙ্গাঘাতে ছিঁড়িয়া কুটী কুটী হইয়া যাইতেছে, বড় বড় মাস্তুল ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকাকারে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটী ক্ষুদ্র ফুল কোথা হইতে আসিয়া ঐ ঝটিকা-তাড়িত ভীষণ তরঙ্গোপরি অসীম সাহসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রলয়-যন্ত্রণা দেখিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটীও পাপ্‌ড়ি খসে নাই, একটী পাপ্‌ড়িও সরে নাই! ফুল, কে বলে তুমি কোমল? তুমি দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়! কে বলে তুমি অসহিষ্ণু? তুমি সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ! কে বলে তুমি ভয়কুণ্ঠিত? তুমি সাহসের, তুমি বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমা! তোমার অপেক্ষা রহস্য এ জগতে আর কি আছে! তুমি বৈপরীত্যের আধার! এই জন্য মানুষ সমাজের প্রারম্ভ হইতে কোমলহৃদয় কবি এবং সাহস সহিষ্ণুতা এবং শক্তির আদর্শরূপী ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর, উভয়েরই শিরোপরি ফুলের মালা চাপাইয়া কোমলতার এবং বীরত্বের পুরস্কার করিয়া আসিতেছে।

যে মহাপুরুষ এ জগতে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য, কেবল তিনিই মাথায় ফুল পরিতে পারেন। অতএব, ভারত সন্তানগণ, যদি তোমরাও মাথায় ফুল পরিতে চাও, তবে দেহ, মন, প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, সে চেষ্টা কর। প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের চেষ্টা যেন সফল হয়, বীরভূষণ ফুল যেন তোমাদের শিরে শোভা পায়।

ফুল ও ফল। ১৮৮৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৪৪—১৯১২

জল্পনা

কাঙ্গালী। জগা এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীটে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া; বাগান একখানা করতেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা, কথা কচ্ছিস নি যে?

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি; তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাঁধলো বলে; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় কর্‌তে পারবি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক,—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম আর আমার পরিচয় দিচ্ছিস কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে

তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

[সুরেশের পুনঃপ্রবেশ]

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজদা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে—(পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—ব্যস্!

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও,—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরি শোন,—এ যে দু'দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছি বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাবছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্ব্বনাশ করবে, তা রূপসী বিদ্যাধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পার্‌বো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধ্‌ছি বিদ্যাধরি, জজসাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুট্‌বে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান]

জগ। বুঝলি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝতে পারে, তখনই সই কর্‌বে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

প্রফুল্ল। ১৮৮৯

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৮৬

ভারত মহিমা

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"; মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তুষারমণ্ডিত, মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম

করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল, পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্যজাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বুদ্ধদেব প্রথম উদ্ঘাটন করেন। পরে য়িহুদীদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বুদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রুপ্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু অস্ত্রদ্বারা, শারীরিক বিক্রম দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন; পাষাণস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত্ন এবং অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগকেও লজ্জা পাইতে হয়, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন; কিন্তু যে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভাগে বুদ্ধদেব প্রদীপ্ত প্রেমলোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্প দিন হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতি পথে অগ্রসর

হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়াখণ্ডের পুনর্জ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

নানা প্রবন্ধ। ১৮৮৫

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৪৫—১৮৯১

নীলকমল

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারি বার তার কাণ মোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গাইতে পার?"

নীলকমল "হাঁ" বলিয়া বেহালার গত ছাড়িয়া দিয়া গান ধরিল এবং বেহালার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল।

পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীল পদ্ম সে নীল পদ্ম চরণপদ্মে দিব॥

গান শুনা দূরে থাকুক, নীলকমলের হাবভাব মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর বোলেছিল, 'নীলকমল বেণা বনে মুক্তা ছড়াইও না।' তোমরা এর কি বুঝ্‌বে? যদি ওস্তাদজী কি কালীনাথ দাদা থাকত তবে তারা বুঝ্‌তে পারতো। ছেলে মানুষের মত হাস্‌লে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। কত খোসামোদ, তবু না।"

প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এজন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তানসান হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্পনি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানা

কারণ প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদ্যকর হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখা পড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। "লেখা কি?" নীলকমল কহিত, "কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখ্‌তে পারে, কিন্তু বাজনা শিখ্‌তে মা সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।" এই অবধি সে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের হাতে দেখা যাইত না। কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যে দিন বেতনগুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটি নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণ নীলকমলকে বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমনকালে বলিয়া গেল, "তোরা মুড়ি মিশ্রীর সমান দর কল্লি। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক, তোরা টের পেলিনে এই দুঃখ। ভাল আমি চল্লেম, ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে বসে কাঁদিস্ তবু একমুট অন্ন দেবো না।"

স্বর্ণলতা। ১৮৭৪

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৮৪৬—১৯১৭

গ্রাবু

খেলা এই সংসার লীলা। অনেকে বলেন যে চতুরঙ্গক্রীড়া অতি উত্তম, কেননা প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্র রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল; যাহার বুদ্ধি বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই জয় লাভ করিবে। এটি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ঘোর অনৈসর্গিক। কোথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্ম্মস্থানে হউক, বিলাস ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক, কোথায় দেখিয়াছেন, যে দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হইল? কোন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে, দুই দল যোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়াছে?

জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জন সমবোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না। তা পায় না। বৈষম্যই জগতের নিয়ম ; সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। তবে কেন খেলিবার সময় আমরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃতা শিক্ষা লাভে আমরা যত্নবান্ হইব? চতুরঙ্গ ক্রীড়া আমাদিগকে অতি ভুল শিক্ষা প্রদান করে। তাসখেলায় তাসের বৈষম্য সংস্থাপনই নিয়ম, সুতরাং তাসের এইটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গের ক্রীড়ক সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত অথবা সাথা না থাকিলে চলে না ; খেলাতেও মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার? যার নাই, তার আর খেলা কি? সে কিসের সংসারী? তাহার খেলিবার উপায় নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহারা তোমার মতো নহে, তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সর্ব্বদাই আছেন ; তোমার স্বার্থে তাঁহার স্বার্থ, কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে, হিন্দু সংসারে, পতির যে একমাত্র সহায়, দুখের দুখী, সুখের সুখী, ব্যাথার ব্যথী, আহ্লাদে আহ্লাদিনী, বিষাদে অবসন্না, সেই সঙ্গিনী, সংসার খেলার সেই মাত, কখনই তোমার নিকটে কুটুম্বিনী হইতে, তোমার নিজ গোত্র হইতে, পরিগৃহীত হইতে পারে না। দূর বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাস ক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয় ; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁথনিই এই রূপ। যদি তুমি সৌভ্রাত্রসুখ আস্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছাপূর্ব্বক কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার রোগ শান্তির জন্য কিছু দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্টভোগ কর। যদি প্রণয়িনীর প্রণয় প্রার্থনা কর, তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয় বচনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাবে না। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। সুখ দুঃখ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্য ও সাজান। তাস খেলায় কাহার হস্তে কি আছে কেহ জানে না, কেহ কোনরূপ নিয়মিত সাজান উপকরণ পায় না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি? তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সমরক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বোধ। তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া এক হাতেই, নিজ হাতেই, ছক্কা করিতে পার, তখন তোমার উপকরণ ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই বরং সে ত আর তখন বিলক্ষণ স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এক হাতে ছক্কা করা যায়, এমন তাস কয়জনা কয়বার এ সংসারে পাইতে পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকে। পরিচিত্ত অন্ধকার; এবং ইহলোকে আমাদের পরিচিত্ত লইয়াই ব্যবসায় সুতরাং প্রধান উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে; যে গুপ্ত অনুমান করিতে পারে সেই বিষয়ী; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি, না পারিলেই কি? তবে উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহা কি রূপে অনুমান করিবে। তাস খেলায় যাহা কর, সংসারেও তাহাই কর। অথবা সংসারে যাহা করিতে হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির কি উপকরণ আছে, জানিতে হইলে আমরা কি করি? তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি, স্মরণ করিয়া অনুমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন ছুটা দশের তুরুপ করিলেন না, তখন ইঁহার স্থানে নিশ্চয় তুরুপ নাই। ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন আর হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে, ইস্কাবনের টেক্কার পরেই দশ ছিল, তবে টেক্কা, এঁর স্থানেই আছে; আমার মাতের হাতে ত নাই, থাকিলে তিনি এমন সময় ত্রাই ভেঙ্গেও রঙ খেলিবেন কেন? আমার দক্ষিণ-দিকের দ্বন্দ্বী স্থানেও নাই, থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তুরুপ করিবেন। তবে টেক্কাটা এঁর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি ঠিক্ তাই করিলাম।

তাস খেলার কাটানও সংসারের অনুলিপি। কাটান সংসারে প্রবেশ—বা জন্ম পরিগ্রহ। এক জন্ম পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে, জন্মই বলুন আর কাটানই বলুন, একেবারে সম্পূর্ণ অদৃষ্টমূলক। আপনার জন্মের

উপর কাহার হাত আছে? তুমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার জন্ম ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম বৈগুণ্যেই দেখ ঐ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আঢ্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উদরপূর্ত্তি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে "নীচ নরাধম" উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতেন না। তাস খেলায় এক জন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে, সে কি নীচ নরাধম, তা যদি না হয়, তবে চোর কি করিয়া হইল? জিজ্ঞাসা করিবে তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তাহা কে বলিতেছে? তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে। তাস খেলায় যেমন বোকা আছে —সংসারে তাহা অপেক্ষা অধিক বোকা আছে! তবে যে পেটের দায়ে নীচ, তাহাকে যে নীচ বলে, সে আরো নীচ!

কাটান যদি জন্ম পরিগ্রহ হইল, তাহলে এখন তুরুপ কি তা বোঝা গেল। জাতিগতবৈলক্ষণ্যজনিত-প্রাধান্যই তুরুপ! প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তুরুপ, এখন ইংরাজই তুরুপ। কোথাও অসভ্য জনগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তুরুপ, আবার কোথাও বৈশ্য তুরুপ। প্রাচীন কালে ড্রুইড, পোপ, পাদরি, সাগ্নিক পারসী, ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম্মতুরুপ ছিলেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন তুরুপ এবং বোধ হয় কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে।

ধনীরাই রঙ্গ্‌ আর সকলেই বদরঙ্গ্‌। ধনীর জন্ম পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান কি তা জানা গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধনা কে, তাও জানা গেল, বদরঙ্গ্‌ কি তা বোঝা গেল।

সমাজ সমালোচন। ১৮৭৪

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭—১৯১৯

বালিকা বধূর বেদনা

আমরা এই বাড়িতে আসার পর মাসীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা, তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১ দিনের মধ্যেই আমাকে 'দাদা' করিয়া লইল। পিতা-মাতা ঐ বালিকাটিকে শৈশবে একজন

পরিণত বয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হয় পতির নিকট বা পতি গৃহে ভালো ব্যবহার পাইত না, কারণ, শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিলেই দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, এবং তাহা দেখিয়া বাল্যবিবাহের প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটির নিকট তাহার শ্বশুরবাড়ির কথা তুলিতাম না, তাহাকে পড়াশোনায় গল্পগাছায় ভুলাইয়া রাখিতাম। বালিকাটি প্রাতে গৃহ কর্ম্মে পিসীর সহায়তা করিত, আমার নিকট আসিতে পারিত না, কিন্তু বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদের গৃহ আশ্রয় করিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম, ভালো ভালো গল্প শুনাইতাম, আমার সেই পূর্ব্বকালের উন্মাদিনীর অভাব যেন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইত। অনেকদিন এরূপ হইত যে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ঘুমাইয়া পড়িত। আমি শয়নের পূর্ব্বে তাহাকে তুলিয়া বাড়ির ভিতর দিয়া আসিতাম।

আমি এইখানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেন্দ্র (যিনি পরে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বিধবা বিবাহ করেন এবং আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য যাই। কিরূপে সে বিবাহ ঘটে, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহা বলিতেছি। যাইবার সময় মাসীকে বিশেষত সেই বালিকাটিকে ছাড়িয়া যাইতে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, সেজন্য সে বিচ্ছেদটা মনে আছে। সে যেন আমার স্নেহ পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই স্নেহ পাশ ছিঁড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জানাইলাম, তখন মেয়েটি কয়দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। অবশেষে যখন আমি জিনিসপত্র লইয়া বিদায় হই, তখন বলিল, "দাদা, একটু দাঁড়াও, একবার ভাল করে প্রণাম করি।" এই বলিয়া তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া গলবস্ত্র হইল এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে, আমিও তাহার সঙ্গে কাঁদি।

সেই যে কাঁদিয়া বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করিতে করিতে সে বাড়ি হইতে বিদায় লইলাম, সেই ঘৃণা অদ্যাপি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। কেহ দশ-এগারো বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ হয়। কি

আশ্চর্য! বাল্যবিবাহের অনিষ্টের ফল পূর্ব্বে কত দেখিয়াছিলাম, শাশুড়ীর হাতে বৌয়ের প্রাণ গেল, কতবার শুনিয়াছিলাম, বালিকা পত্নী বিরাজমোহিনীকে হাত পা বাঁধিয়া সপত্নীর উপরে ফেলিয়া দিল ইহাও দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ মেয়েটির চক্ষের জলে শিশু বালিকাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া দান করার উপরে আমাকে যেরূপ জাতক্রোধ করিল, এরূপ অগ্রে করে নাই। কোন ঘটনাতে মানুষের মনে কোন ভাব আসে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

হায় হায়! ঘটনাচক্রে মেয়েটি কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়া পড়িলাম! তৎপরে বহু বৎসর পরে একদিন বিধবা বেশে মলিন বস্ত্রে দীনহীনার ন্যায় শিশুকোলে তাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাইতে দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা।

আত্মচরিত। ১৯১৮

নবীনচন্দ্র সেন

১৮৪৭—১৯০৯

রবীন্দ্রনাথ

কি উপলক্ষে, স্মরণ হয় না, এ সময়ে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই। স্মরণ হয়, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—"ইনি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।” তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম— সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি ‘নোটবুক’ বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন-কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি “নেশনাল মেলায়” গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন—“কে? রবিঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।” তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে—আজ “কাঁচামিঠা আঁব” পরিপক্ব “ফজলী”। তাঁহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। রবিবাবু আজ বাঙ্গালার ‘শেলি’ ‘কিটস’ ‘এডগার পো’—কত কিছু বলিয়া পরিচিত। নব্য বঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।

এ সময় রাণাঘাটে রবিবাবুর যে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা আমাদের বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

“হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র—তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ-বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের সহিত ক্ষণ কালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাসখানেক হইল রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম যে, আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্য পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য-পরিষদ্ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শন লাভ হইল না। সহৃদয়তা

গুণে আজ আপনি নিজ হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি, ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।"

স্মরণ হয়, ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম, আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গসাহিত্য উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু ঊর্দ্ধে হইবে। মাইকেল 'মেঘনাদবধ' কাব্যের, হেমবাবু 'বৃত্র সংহারে'র এবং আমি 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রবিবাবু কোনও এক কাব্যবিশেষের কবি বলিয়া কেহ তাঁহার নাম করেন না। অথচ তিনি রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান গীতিকবি। শুনিয়াছি তাঁহার বিশ্বাস বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জমিদারী কার্য্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা: কুঞ্চিত অলকাশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু-শোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশ্‌মা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর। চরণে

কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতা-ব্যঞ্জক। গাড়ী হইতে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।"

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড আনন্দ হইয়াছে। রবিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাহিতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল। তিনি, এ হইতে নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিতে লাগিলেন। নির্ম্মল তাঁহার গানে নূতন নূতন সুর দিয়া গাইয়াছিল বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না; কারণ, যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দ্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া, সুরটি মাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া উহা গাইতে লাগিলেন। আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি।

* * *

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস। তাহাতে রবি বাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শ মাত্র অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গি! গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে! আমি তখন "রৈবতক"—"কুরুক্ষেত্রের" কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল;

আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবি বাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তারপর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরম্" গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই। তিনি বাঙ্গালি অন্য কাহার গান যে জানেন কি বাঙ্গালি অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাঁহার কথায় বোধ হইল না। শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবুও শেষ জীবনে অন্য কাহারও বহি পড়িতেন না। আমি কিন্তু ভাল বহি বাহির হইলেই পড়ি। তবে নির্ম্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শুনিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন। কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা গান গিরিশ ঘোষের রচিত বলিলে, বলিলেন—"শুনিয়াছি তিনি গান রচনা করিতে পারেন।" এই পর্য্যন্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বলিত রবি বাবুর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। বিশেষতঃ উপরের কীর্ত্তনটি লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময় ভাবি আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" আমি বলিলাম—"উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কাল পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু সজল হইল। দেখিলাম, আমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাঁহার চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল। গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবি বাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই। তাহার পর তাঁহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধু বাবুর গানগুলি ৪।৬ লাইন একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোয়ারা এবং তাঁহার গানগুলি বড় দীর্ঘ, এক একটি কবিতাবিশেষ, বলিলে তিনি বলিলেন তাঁহার ছোট ছোট গানও আছে। তাঁহার 'সোনার তরী' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীদৃশ্যের একটি ফটো। কিন্তু উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বড় বুঝিলাম না।...

নগর-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ রবি বাবুর ও নির্ম্মলের গান হইল। পরে 'টেবিলে' পানাহার বড় আনন্দের সহিত চলিতে লাগিল। রবি বাবুর মার্জ্জিত সোণার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ঈষদ্ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুরবাড়ীর ওজন-মাপা চাপা কথা, চাপা হাসি, ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আমি আর পারিলাম না। সুরা দেবীও পরিমিত শিষ্টাচারের বন্ধন কিছু শিথিল করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"রবি বাবু! সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জ্বালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! অপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!" তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরাণী সকালে একদিনে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর বোঝাই লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার বৈঠকখানার বীরকে (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ—আমি 'বাঙ্গালে'র আলাপে রবি বাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব মতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও সুরেন্দ্র বাবু উভয়ে রবি বাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। রবি বাবু তাঁহার জমিদারী কাছারি হইতে লিখিলেন—"এমন কখনই মনে করিবেন না যে, আপনার স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি—বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্র-শক্তি স্বল্প-ক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু স্নেহ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম। এবং তাহাও ব্রাহ্মণ-সুলভ লোভবশতঃ

সঙ্গে বাঁধিয়া আনিয়াছি।” ‘সখি! এরূপ না হইলে তোমার নাম প্রিয়ম্বদা হইবে কেন? এরূপ না হইলে রবি বাবু সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন কেন?

আমার জীবন (৪র্থ ভাগ)। ১৯১১

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৭—১৯১৯

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী

তাহার পর তাহার [ছাগলটির] মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম।...আমি বলিয়া উঠিলাম, ‘ঠাকুর মহাশয় করেন কি! উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম্ম উত্তোলন করুন।’ ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্ম্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা কম্পিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি বাবা। দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।’ আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, “আমি দুর্ব্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা আমাকে দিলে! মাথার উপরে কি ভগবান্ নাই?”

মুক্তামালা। ১৯০১

খাঁদা ভূত

খাঁদা ভূত রাত্রে বিকট শব্দ করিতেছে হু হু হু হু। তেঁতুলগাছ হইতে যাই এই শব্দ উত্থিত হইল আর চারিদিকে হ্যাক্কা-হুয়া হ্যাক্কা-হুয়া-হুঃ শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টিবাদল না মানিয়া বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার তাহারা এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া ভিজিতেছিল। কক্-কক্ রবে তাহারাও চারিদিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্-সন্ রবে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেচকগণ হুট্-হুট্ রবে রায় মহাশয়ের অট্টালিকাগাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে কুকুরগুলো ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলে যেই সেই তেঁতুলগাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ-পদদ্বয়ের উপরে ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুলগাছের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ঙ্কর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।”

পাপের পরিণাম। ১৯০৮

মীর মশাররফ হোসেন

১৮৪৭—১৯১২

হানিফার পরিণতি

এখন আর সূর্য্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ সন্ধ্যা-সীমন্তিনীর সীমন্ত উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন; কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটি ভাবে চাহিতেছেন, ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন; আবার দেখিতেছেন।

মানবদেহের সহিত তারাদলের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই দেখিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহু দূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে—কে দেখিতে পারে? অন্যায় নরহত্যা, অবৈধ বধ, কোন্ চক্ষু দেখিতে পারে? আজিকার সূর্য্যেয় উদয় হইতেই হানিফার রোষের উদয়, তরবারি ধারণ। সে সূর্য্য অস্তমিত হইল, দামেস্কপ্রান্তরে মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল, কিন্তু মহম্মদ হানিফার জিঘাংসা-বৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। "এজিদ তোমার বধ্য নহে" দৈববাণীতে, মহম্মদ হানিফার অন্তরে রোষ এবং ভয় একত্র এক সময়ে উদয় হইয়াছে। উদ্যান-মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া স্থির নেত্রে ক্ষণকাল চিন্তার কারণও তাহাই। এক সময়ে দুই ভাব, পরস্পর বিপরীত ভাব—নিতান্তই অসম্ভব, কিন্তু হইয়াছে তাহাই—ভয় এবং রোষ। বীর-হৃদয় ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে যে কিঞ্চিৎ কাঁপিয়াছিল, দৈববাণী বলিয়া, প্রভু হোসেনের জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র ছায়া দেখিয়া। কিন্তু পরিশেষে নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের স্থান হইল না। সুতরাং রোষেরই জয়। প্রমাণ—অশ্বে আরোহণ, সজোরে কশাঘাত।

কানন-দ্বার পার হইয়া, এজিদের গুপ্তপুরী-প্রবেশদ্বার আবরণকারী লতা-পত্রবেষ্টিত নিকুঞ্জ প্রতি একবার চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, দুর্গন্ধময় ধূমরাশি হু হু করিয়া আকাশে উঠিতেছে, বাতাসে মিশিতেছে। রাজপুরী পশ্চাৎ রাখিয়া দামেস্ক নগরের পথে চলিলেন। যে তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহারই জীবন শেষ হইল। বিনা অপরাধে হানিফার অস্ত্রে জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া খণ্ডিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জয়নাল-ভক্ত প্রজাগণ এজিদের পরিণাম দশা দেখিতে আনন্দোৎসাহে রাজপুরীর দিকে দলে দলে আসিতেছিল। হানিফার রোষাগ্নিতে পড়িয়া এক পদ অগ্রসরও হইতে পারিল না। আপন প্রতিপালক-রক্ষক হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

নগর প্রবেশদ্বারে প্রহরিগণ বসিয়াছিল। এজিদ্ সহ মহম্মদ হানিফা নগরে প্রবেশ করিলে, প্রহরিগণ মহম্মদ হানিফাকে দেখিয়াই সতর্কতা ও সাবধান-তার সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর হইল। নিকটে আসিতেই প্রহরিগণ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু মস্তক উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় বার সম্ভাষণের আর অবসর হইল না। প্রভু-অস্ত্রে প্রহরীদের মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া সিংহদ্বারে গড়াইয়া পড়িল। দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি সন্ধ্যাগমে নগরে আসিতেছে, পথিক পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম-হেতু লোকালয়ে আসিতেছে, ত্রস্তে পদবিক্ষেপ করিতেছে—কত কথাই মনে

উঠিতেছে। চক্ষের পলকে কথা ফুরাইয়া গেল, বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ হানিফার অস্ত্রে জীবলীলা পথি মধ্যেই সাঙ্গ হইল।

গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা প্রভৃতি যথাসাধ্য ত্রস্তে আসিয়াও মহম্মদ হানিফাকে নগরে পাইলেন না। সিংহদ্বারে আসিয়া যাহা দেখিবার দেখিলেন। প্রান্তরে আসিয়া স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন, আম্বাজ-ভূপতি যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার জীবন শেষ করিয়া ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন, এখনও ঘোর অন্ধকারে দামেস্কপ্রান্তর আবৃত হয় নাই।

ঘোরনাদে শব্দ হইল—"মহম্মদ হানিফা"!

নিজ নাম শুনিতেই মহম্মদ হানিফা একটু থামিয়া দক্ষিণ বামে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গাজী রহমান প্রভৃতিও ঐ শব্দ শুনিয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না,—স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, এবং স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, যেন আকাশ ফাটিয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া শব্দ হইতেছে,—"হানিফা! একটি জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা তুমি জান? সৃষ্ট জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারণে জীবের জীবলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারি দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য-কুলের জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্ত হইল না! জয়ের পর বধ, ইহা অপেক্ষা পাপের কার্য্য আর কি আছে? নিরপরাধ প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুল্‌দুল্‌ সহিত রণবেশে, রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক।"

বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্ব্বতমালা হইতে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া বিকট শব্দে মহম্মদ হানিফাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মহম্মদ হানিফা বন্দী হইলেন। রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিবেন।

বিষাদ সিন্ধু। ১৮৯০

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮—১৯০৯

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদ-রদ-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি দীপ জ্বলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-রজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন ?—জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ন, নয়নদ্বয় জলে ছল্ ছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণি! আপনি কে, জানি না, আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে একবিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ্ বা ভয় সন্নিকট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে, আমি চেষ্টা করিব।"

জেলেখা তথাপি নীরব; নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন, কোন ঘোর সঙ্কট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক হইয়া, নানা বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, সেই ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধে কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন, তাহা বলা যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও দেখেন নাই। কোথাও শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, শ্বেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারিদিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণ-রৌপ্যের যে কারুকার্য্য, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চন্দ্রালোকে সুন্দর

সুন্দর বাগান, পুষ্পলতা, তাহার উপর ফোয়ারার জল খেলিতেছে ; চারিদিক্ দিয়া নৈশ সমীরণ নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা উদ্যান-বৃক্ষতলে আসীন হইয়া দুই একজন উজ্জ্বলবর্ণা উজ্জ্বল বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে অথবা নিদ্রার বশীভূতা হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে আর রহিয়া রহিয়া মৃদু স্বরে নৈশ বায়ু সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র আপন বিপদ্‌কথা ভুলিয়া গেলেন, এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ, সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব্ব পরিবেশ-ধারিণী রমণীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ! তিনি কোথায় ? এ কোন্ স্থান ?

কতক্ষণ পরে তিনি একটা উন্নত সুবর্ণখচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র একটি উন্নত আলোক-পূর্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, অমনি শত শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত, হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হন নাই। কোথায় আসিলেন ? এ কি প্রকৃত ঘটনা, না স্বপ্ন ? এ কি পার্থিব ঘটনা, না ইন্দ্রজাল ? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল ; আবার হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন। পুনরায় শত-নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটি উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভাকারে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক-প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিনিন্দিত

উচ্চ সিংহাসনে তাহাদিগের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফলায়লায় পড়িয়াছিলেন যে এবনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বোগ্দাদের কালিফ হইয়াছেন। নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন।

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা বা নারীরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধ হয়, যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটিমাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্‌ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মলমলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেইরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া, নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতির সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ—শব্দশূন্য। এইরূপ একবার,

দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের একদিকের একটি রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারিজন কুঠারধারী কৃষ্ণবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান এক জন রাজ্ঞীর সিংহাসন পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর। নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আরক্ত করিয়া, যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মসরুর কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও রঙ্গভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই অপরিচিত দেশে জল্লাদ-হস্তে প্রাণ দিতে হইবে, তাঁহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটি হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পদাঘাত করায় সেই পরিচারিকাগণ একজন বন্দীকে রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল। নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে বন্দী জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীর পদে লুণ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বার বার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদনমণ্ডল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাহসী, অল্পবয়স্ক, সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বার বার নয়নক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হতভাগিনী জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার

সময়ে একদিন লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল। অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিল, রাজ্ঞী স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর সুন্দর ললাট রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইল।

বিচার শেষ হইল। নির্দ্দয়হৃদয়া রাজ্ঞী আদেশ দিলেন, "জেলেখা অপরাধিনী, পাপীয়সীকে শূলে দাও! কাফেরকে লইয়া যাও, হস্তি পদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন কর।"

একেবারে দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল। নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রজ্জু দ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটি পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল, যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর কে যেন সেই অন্ধকারে রোদন করিতেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অভাগিনী জেলেখা।

মাধবীকঙ্কণ। ১৮৭৭

কলিকাতা বড়বাজার

ভবানীপুরে ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন, কলিকাতার বড়বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন, কলিকাতায় বড়বাজার হইতেও বড় একটি বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদামজাত আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন, সম্মানামৃত সেরকরা, মণকরা বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ ভারী খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেনপার্টি দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহ বা পরের ধনে হস্তপ্রসারণ করিয়া সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন ও বড় সুখে,

নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড়-লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, সুবর্ণবর্ণ সুধার সহিত যে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সে অমৃত-প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য-মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে। কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর-শব্দে সেই অমৃত নিঃসৃত হইতেছে, কখন অশ্‌লারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে! আর কখনও বা অবারিত-বেগে কর্ত্তৃপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাবতীয় বড়লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারী ভারী দেশের মহামান্যগণ, পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক" করা "হর্ম্মেটিমিলীসীল" করা বাক্সে বাক্সে সে মাল আমদানী করা হইতেছে, দুইখানি ফাঁপা বা গিলটী করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রিত করিয়া বিলাতী মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানী করিতেছেন! এ বাজারে সে মালের দর কত। "আদত বিলাতী সম্মানসূচক পত্র!" "আদত বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!" এই গৌরবধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথাও "দেশহিতৈষিতা", "সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি বিলাতী মাল বিলাতী দরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউন হল, কৌন্‌সিল-হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন, রাজমিস্ত্রী অনবরত মেরামত করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অনুরূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতৃগণ বড় বড় জয়ঢাক বাজাইয়া চীৎকার করিতেছে—"আমাদের এ খাঁটী দেশী মাল, ইহার নাম 'সমাজ-সংরক্ষণ', ইহাতে বিলাতী মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ।" হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন মালটা ষোল আনা বিলাতী, বিলাতী পাত্রে বিক্রীত, বিলাতী মালমশলায় প্রস্তুত,

কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভাজিয়া লওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখীন, তাঁহার বোধ হইল, ঘিটাও ভাল খাঁটী দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা ও দুর্গন্ধ। সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী মাল" বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া, সেই মাল বিক্রয় হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে।

তাহার পর সাধুত্বের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার, হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়; এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশী নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটি জালা ফাঁসিয়া গেল, পথঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার কি মাহাত্ম্য! এমন জিনিসই নাই, যাহা খরিদ-বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে, তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদামজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন্-বোর্ড" সম্মুখে দর্শক-দিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড়বাজারের বণিক-দিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাটৃতি, চতুরতায় বিশেষ মুনফা, চতুরতায় জগৎ-সংসার ধাঁ ধাঁ লাগিয়া রহিয়াছে।

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটী মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটী দেশহিতৈষিতা, একটু খাঁটী পরোপকারিতা বা একটু খাঁটী পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড়বাজারে সে মালের আমদানী

রপ্তানী বড় অল্প, সুসভ্য-মহাসম্ভ্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

সংসার। ১৮৮৬

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১৮৪৯—১৯২২

জাহ্নবীতীরে

একবার স্বর্গ দেখিব মা! স্বর্গের সুখের জন্য বলি না, কেননা, হৃদয়ের পরতে পরতে যার নরকানল জ্বলিতেছে, মনে যার সুখ নাই, তার স্বর্গেও সুখ নাই,—স্বর্গের সুখের জন্য নহে, কেবল হারান ধনের অনুসন্ধানের জন্য। সংসার খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কোথাও পাই নাই,—তাই একবার স্বর্গ খুঁজিব—একবার দেখিব, তেমন ফুল নন্দনকাননে ফুটে কি না। তোমার জলে চন্দ্ররশ্মির নৃত্যের ন্যায় সুকুমার, নিদাঘ-সায়াহ্ন গগন-বৎ কোমল, প্রণয়িনীর প্রথম সপ্রেম আলিঙ্গনের ন্যায় সুখময়, পরদুঃখকাতর মানবহৃদয়ের ন্যায় পবিত্র, যে কুসুম এ অধমের গৃহকুঞ্জে ফুটিয়াছিল, দেখিব, তাহা দেবোদ্যানে ফুটে কি না। যে সাগরসেচিত অমূল্য রত্ন এ দরিদ্রের কুটীরে ছিল, দেখিব তেমন রত্ন দেবরাজভবনে আছে কি না, যে সংগীত অতৃপ্ত-হৃদয়ে দিবানিশি কর্ণে শুনিতাম—যে সংগীত এখন কেবল এই ঘুমে-ঢুলু-ঢুলু জ্যোৎস্নালোকে দেখিতেছি, যে সংগীত এই স্বপ্ন-মাখা মৃদুপবনে অনুভব করিতেছি; শুনিব, তেমন সংগীত, অমরাবতীতে আছে কি না। একদিন—হায়! কোথায় সেই দিন!—একদিন, যখনই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, সেই সংগীত চক্ষের উপর ঝলসিতেছে।* এখন সে দিন নাই; সে বীণা চিরদিনের মতন নীরব হইয়াছে—সে কণ্ঠ চিরদিনের মতন নিস্তব্ধ হইয়াছে—তবু সেই সংগীতধ্বনি আজিও যেন কর্ণে বাজে—সেই সংগীতের লয়টুকু আজিও হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে। সংগীত দেখা কেমন? মনুষ্যসৌন্দর্য্যে সংগীত কি প্রকার? হরিবোল হরি! তবে মিছা বকিয়া মরিলাম।

* "The mind, the music breathing from her face."

—The Bride of Abydos

আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না; আমার এ হৃদয়দাহের পাগলামি তোমাদের ভাল লাগিবে না। আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের প্রাণকে ভাসাইয়া দিয়াও, পাষাণে বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া আছে, সে বৈ আমার কথা আর কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রণয়, কেবল স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সজীব থাকিতে পারে, সে বৈ আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রীতি, শাবকহীনা বিহঙ্গীর ন্যায়, শ্মশানভূমির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সে বৈ আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রণয়দীপ নৈরাশ্যের নির্ব্বাত কন্দরেও নির্ব্বাণ হয় না, সে বৈ আমার কথা আর কয়জন বুঝিবে? যাহার প্রণয় নাস্তিকের মনেও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—তর্ক যুক্তি পায়ে ঠেলিয়া, শরীর হইতে মনকে পৃথক করিয়া দিতে পারে, সে বৈ আমার কথা কয়জন বুঝিবে? যে, কবি না হইয়াও সংসারের শোকতাপে, বিরহের যাতনায়, নৈরাশ্যের কাতরতায়, গতানুস্মরণের বিষের জ্বালায় কবি হইয়া উঠিয়াছে, সে বৈ, আমার এ অসম্বদ্ধ প্রলাপের অর্থ-বোধ কয়জন করিবে?

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। ১৮৭৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৩—১৯৩১

তৈলদান

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ্রপি।" যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকর বাকর

প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামি-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে, সে সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্ত্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র। সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যেরূপেই হউক, তৈল দিলে কিছু হয় না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন থাকিয়াও যাহার নিকট ১।০ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরাজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া এক বিন্দু দিলে যত কার্য্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান্। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে

তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্ট সাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকৃটিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায় বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেকের কলেজ খোলা হয়।

অন্ততঃ উকীলি শিক্ষার নিমিত্ত ল' কলেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কলেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কলেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার। এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকৃচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কলেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রমোশনের সুপারিশ মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্ব্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে, বাঙ্গালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে, ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এ দেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের

প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের স্থরু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে। শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

বঙ্গদর্শন। ১৮৭৯

ত্রয়ী

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভুমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত-চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহণ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, স্থরে মুগ্ধ, আর স্থরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

স্থর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋভুরা যেন বাহুপ্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর, জলচর সকলকে ডাকিতেছে—এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই। সবাই ভাই। স্থর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই!

পৃথিবী শুদ্ধ যেন বাজিয়া উঠিল ভাই ভাই। ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন প্রতিধ্বনি আসিল ভাই ভাই। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম যেন গভীর স্বরে বলিল ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই!

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকির হৃদয়ের তলা হইতে প্রতিধ্বনি হইল ভাই ভাই। যেন মোহিনীতে তাহাদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ করিয়া হৃদয়কে গলাইয়া বলিল ভাই ভাই। একজন পণ্ডিত, একজন দিগ্বিজয়ী, আর একজন দস্যু, সবারই মনের বিরোধী ভাব যেন মুহূর্ত্তের জন্য তিরোহিত হইল। সবারই

হৃদয় যেন একতানমনপ্রাণে বলিয়া উঠিল—ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

তিন জনই উন্মত্ত, কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে একটী ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা গানে এমনি উন্মত্ত যে, বেগবান্ চিন্তাস্রোতেও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না, হৃদয়ের তলবাহিনী অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র ভাবনার ত কথাই নাই। তাঁহারা যেমন গানে তন্ময়, তেমনিই আছেন। অথচ ভিতরে ভিতরে হৃদয় গলিয়া ক্রমে ক্রমে আর একরূপ হইতেছে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ—আমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা—আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি, আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে।

আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? বিষম আত্মগ্লানি! হায়! আমি কি করিতেছি, আমি কেবল আমার ভাইয়েদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!!

হৃদয়ে এই যে ভাবনা চলিতেছে, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে; দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্ব সংসার আবার যেমন ছিল, তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল; পৃথিবীতে প্রভাত হইল; কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি এতক্ষণ একদৃষ্টে ছায়াপথের দিকে হা করিয়া চাহিয়া ছিলেন; ঋভুরা চলিয়া গেলে হতাশ হইয়া পড়িলেন; তখনও

সে সুর কাণে বাজিতেছে, যেন বলিতেছে, ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যে চিন্তা তাঁহারা এতক্ষণ টেরও পান নাই, তাহা উদ্দামরূপে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন বাল্যের, যৌবনের, প্রাচীন, নবীন, স্বার্থপর, অস্বার্থপর নানাবিধ প্রবল বিরোধিভাবমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া এই নবাগত অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ এমন ক্ষমতা রহিল না যে, উঠিয়া কোথাও যান। অথচ কাণে বাজিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

বশিষ্ঠের একবার মনে হইতেছে, বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমনই কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? আবার কাণে বাজিতেছে—সেই সুর—সেই ভাই ভাই। আবার ভাবিতেছেন সর্ব্বশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ", তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগশাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য, ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারি না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন? আহা, কি গান! কি ভাব! পারিব কি? আর কি দেখিতে পাইব? এবার দেখিতে পাইলে আমরাও সেই ভাই ভাই করিয়া জবাব দিব। সম্বল বুদ্ধি আর শাস্ত্র। পারিব বই কি! কাণে বাজিল ভাই ভাই ভাই।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন, এঁরাই ঋভু! কি গান! কি মূর্ত্তি! আমার কি সৌভাগ্য! হবে না কেন? আমায়ও একদিন ঐ রূপ মাতিতে হইবে। পারিব বোধ হয়। একবার ঋভুদের সঙ্গে জবাব করিব। অহং বিশ্বামিত্রঃ। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন, পৃথিবীতে একদিন এইরূপ গাওয়াইতে পারি, তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই

করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই? এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না। হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই ভাই ভাই বাল্মীকির নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবিলেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরও নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল।

তাঁহারা কতক্ষণ অন্তরের গোলমালে ব্যাপৃত ছিলেন, কে বলিতে পারে? কতক্ষণ ঋভুদত্ত নববৈদ্যুতীবলে তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাবৃষ্টি হইতেছিল, কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন ভাবশান্তি হইয়া বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইল, তখন দেখিলেন, সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ-আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে, নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে, তিন জনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে।

তুমুল-ভাব-ঝটিকার অন্তে বশিষ্ঠের মনে শান্তি ও সুখ দৃষ্ট হইল। তিনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও তপোবলে পৃথিবীতে ভাই ভাই স্থাপন করিবেন, এই আশায়, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গর্ব্বপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্রের মনে ঘোরতর আত্মগরিমা, একটু ত্রস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি। বাকীটুকু শীঘ্রই জয় করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিব।

বাল্মীকির শান্তি রহিল না, সুখ রহিল না, দারুণ অনুতাপ তাঁহার সর্ব্বস্ব হইল।

তিনি দস্যুদলের দিকেও গেলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি উদ্দেশে নিবিড় গহনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ মহাহৃষ্টচিত্তে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জশরীর বিশালবক্ষাঃ বিশ্বামিত্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া অবতরণ করিতেছেন, অমনি সসম্ভ্রমে যোগবলে তাঁহার নিকটে আসিয়া দুই জনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

প্রেমিক প্রেমিকা

দুইটি ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর!

আবার দুইটি পাখী,—সুন্দর, সরস,—সুকণ্ঠ,—সুপুষ্ট,—ও সুহৃষ্ট—যখন মদভরে খেলা করে, তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পুরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোকরাইতেছে, কেমন? এমন দুটি পাখীর মিল কেমন সুন্দর!

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর—সুস্থ—সবল—সতেজ,—সুশিক্ষিত,—সুবংশজাত,—কলাকোবিদ দুটি মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়। তাহার উপর যদি তাহাদের দুইটি হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি? নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্‌শক্তি থাকে না দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয়নে শরৎ-জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি?

যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে, তখন দেখিয়াছ কি?

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুই হাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। এক দিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদকাননে, এইরূপ দুইটি হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

কাঞ্চনমালা। ১৮৮২

কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে

কলিকাতায় যে সকল বড় বড় বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে কাপ্তেন ধরা ব্যবসাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের এই সকল লোক নদীর ধারে বহুদূর অগ্রসর হইয়া মুচিখোলা, ফলতা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিত। জাহাজের নিশান দেখিয়া জানিত, এ বাড়ুজ্যে মহাশয়ের জাহাজ, পিতুরী মহাশয়ের জাহাজ, এটা দত্ত মহাশয়ের জাহাজ। নূতন জাহাজ দেখিলেই তাঁহারা তাড়াতাড়ি আক্রমণ করিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইতেন। এখন যেমন সমস্ত ব্যবসায় ইংরাজদিগের হাতে গিয়াছে, তখন এরূপ হয় নাই। অনেক দেশীয় লোকও এ ব্যবসায়ের লাভের অংশ ভোগ করিত। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। যখন আমেরিকানেরা প্রথম এ দেশে আসেন, তখন তাঁহারা প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারকে তাঁহাদের মুরুব্বী করিয়া লন। মার্কিণ দেশে ও এ দেশে এখনও অনেকে জানেন যে, রামদুলাল সরকারই ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকা-

বাণিজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তৎকালে যে সকল সমৃদ্ধিশালী লোক কলিকাতায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উদারতা অত্যন্ত অধিক ছিল। নবকৃষ্ণ ও রামদুলালের দানশক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা নবকৃষ্ণকে বিলক্ষণ গালি দিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরাও নবকৃষ্ণের প্রতি তত শ্রদ্ধাবান্ নহেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ উন্নতমনা বলিয়া বোধ হয়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্ ও খৃষ্টানদের চার্চ্চ নির্ম্মাণেও সাহায্য করেন। পাথুরিয়াঘাটার গীর্জ্জার জমী নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হাতীবাগানের জমীও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটি সমস্তই নবকৃষ্ণের ব্যয়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বযুগে যেমন নকুড় ধর ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পর মিল করাইয়া দিতেন, এ যুগে রাজা নবকৃষ্ণ ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের উমেদারি করিতে হইত। নবকৃষ্ণ অনেক লোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। রামবাগানের দত্তেরা নবকৃষ্ণের কেরাণীর বংশ। নবকৃষ্ণের এক পঞ্চরত্ন সভা ছিল, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাহার প্রধান রত্ন। কলিকাতার প্রাচীন তত্ত্ব বলিতে গিয়া আমরা নবকৃষ্ণের এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে নবকৃষ্ণই কলিকাতার এই তৃতীয় যুগের প্রধান ব্যক্তি। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে সুতাহুটী তালুক মৌরসী দিয়া তাঁহার পদ-মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

সেকালে কলিকাতায় বহুসংখ্যক কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা কিছুই ইংরাজী জানিতেন না, ইংরাজী জানিলে তাঁহাদের কেরাণীগিরি করিতে হইত না। কেরাণী কেবল কপি করিত। আসলে যদি মাছি মরিয়া থাকিত, নকলেও তাঁহারা মাছি মারিয়া রাখিত, সেই অবধি মাছিমারা কেরাণী প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছে। সেকালের লোকে কিরূপ ইংরেজী লিখিতেন, তাহার এক উদাহরণ দিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বিশ্বম্ভর মিত্র নামে এক ব্যক্তি একজন সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিত। সাহেব হুগলী গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ঝড়ে সাহেবের জানালার কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, বিশ্বম্ভর মিত্র লিখিতেছেন,—

Sir,

Yesterday vesper a great hurricane the valves of the window

not fasten great trapidetion and palpitation and then precipetated into the precinct, God grant master long long life and many many post.

P. S. No. tranquility since valve broken. I have sent carpenter to make reunite.

পাঠকবর্গ এই ইংরাজী দেখিয়া হাসিবেন না। এখনও অনেকে Costly লিখিতে Costive লিখিয়া থাকেন। তবে সেকালের ইংরাজী দেখিয়া হাসিবার কারণ কি ?

নব্যভারত। ১৮৮৩

মায়ার স্বামীর মূর্তি

মস্করী, তুমি করিলে কি ?—তুমি কি যাদুবিদ্যা জান ? তুমি যে মায়াকে বড়ই বশ করিয়াছ, সে যে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—কখন্ তুমি আসিবে, কখন্ তুমি তাহার স্বামীর ছবি দেখাইবে। সে ছবি দেখিয়া সে যে শিহরিয়া উঠে,—তাহার ভ্রম হয়, স্বামী তাহার জীবিত। তুমি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া তাহার অতিপ্রিয় স্বামীর ছোট ছবিখানি আত্মসাৎ করিয়াছ। সে ছবি পাবার জন্য মায়া বড় ব্যস্ত। সে কখন সে ছবি হাতছাড়া করে নাই। তুমি কোন্ মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া তাহার অতি গোপনীয় ধন সে ছবিখানিও বাহির করিয়া লইয়াছ। সে ছবি লইয়া তুমি করিবে কি ? আহা ! সে তাহার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে সেখানি ফিরাইয়া দাও। তাহা দিয়া তোমার কোনও কাজ হইবে না। কেন এত ভালবাসার জিনিসটি হইতে বেচারাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ ? দাও দাও,—তাহার স্বামীর ছবি তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

ও কি !—তুমি মায়াকে কি বলিতেছ ? ঐ দেখ, সে কান খাড়া করিয়া শুনিতেছে। তুমি বলিতেছ, ওই ছবিখানি তুমি এক জন শিল্পীকে দিয়াছ। সে ঐ ছবি দেখিয়া একটি মূর্ত্তি গড়িবে, তুমি তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে কথা কহাইবে। তোমার এ কথায় আর ত কেহ বিশ্বাস করিবে না,—মানুষে না কি মরিয়া গেলে কথা কহে ! মূর্ত্তিতে না কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় ! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে না কি মূর্ত্তি সজীব হয় ! প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সত্য, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে অনেক লোকে ভাবে, প্রতিমা সজীব হয় ; প্রতিমা নড়ে, প্রতিমার ঘাম হইতে দেখা যায়, কিন্তু মানুষের মূর্ত্তির সেরূপ হয়

কি? কখন ত এ কথা কেহ ভুলেও বলে না যে, মানুষের মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে সে কথা কহে, তাহা হইলে কত পুত্রহীন পিতা, কত পুত্রহীনা মাতা, কত বিধবা মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিত, কথা কহাইতে চেষ্টা করিত। লোকে যাই ভাবুক, মায়া তোমার কথায় খুব বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার দেরী সহে না। তুমি তাহাকে পাগল করিয়াছ,—উন্মাদ করিয়াছ। সে চায়, এখনই তুমি তাহার স্বামীর মূর্ত্তি আনিয়া দাও,—এখনই তাহাকে কথা কহাও। তুমি যত দেরী করিতেছ, সে ততই ব্যাকুল হইতেছে। তুমি ক্রমে তাহাকে এমন বশ করিয়া ফেলিয়াছ যে, তুমি যাহা বলিবে, সে তাহাই করিবে, এবার তুমি কি বলিবে? বলিবে, যদি বিলম্ব না সহে, আমার সঙ্গে চল। যেখানে মূর্ত্তি গড়িতেছে, সেইখানে তোমায় লইয়া যাই, সেইখানেই তোমায় এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইব।

ও কি মায়া! তুমিও যে রাজী! তুমি কুলকন্যা, কুলকামিনী, তোমার কি এই পরপুরুষের সঙ্গে যাওয়া উচিত? লোকে যে কলঙ্ক রটনা করিবে। তোমার যে ভারি নিন্দা হইবে। আমরা জানি, তুমি নির্দ্দোষ। তুমি স্বামীকে দেখিবার জন্যই যাইতেছ, কিন্তু দুষ্ট লোকে ত'সে কথা শুনিবে না,—জানিবে না। তাহারা মনে করিবে ও বলিয়া বেড়াইবে,—যেকারণে অন্য পাঁচটা বালবিধবা ঘরের বাহির হইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ যাইতেছ;—অগ্র-পশ্চাত ভাবিয়া কাজ কর। যাইতে হয়, বাবাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও; মাকে জানাও, তাঁহার অনুমতি লও। তোমার সংসারে মান-মর্য্যাদা আছে, অর্থ-সামর্থ্য আছে; উপযুক্ত সাজসজ্জা কর, লোক-জন সঙ্গে লও, তবে যাও। একলা যাইও না,—যাইও না।

বেনের মেয়ে। ১৯১৯

শ্রীম

১৮৫৩—১৯৩২

যোগ ও ভোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি)। আবার সেজো বাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গি'ছলাম। সেজো বাবুকে বল্লুম, 'আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়।' সেজো বাবু

ব'ল্লে, 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব ; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাশে প'ড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজো বাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র ব'ল্লে, তোমার একটু বদ্‌লেছে—তোমার ভুঁড়ি হয়েছে! সেজো বাবু আমার কথা বল্লে, 'ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল!' আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বল্লুম, 'দেখি গা তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্‌লে, দেখ্‌লাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ান! তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

"প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজো বাবুকে বল্লুম, আচ্ছা অভিমান জ্ঞানে হয় না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তার কি 'আমি পণ্ডিত,' 'আমি জ্ঞানী,' 'আমি ধনী,' ব'লে অভিমান থাকৃতে পারে?

"দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হ'ল। সেই অবস্থাটী হ'লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়! যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই, তখন খড় কুটোর মত বোধ হয়।—তখন দেখি যেন শকুনি উঁচুতে উঠছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

"দেখলাম **যোগ ভোগ** দুইই আছে; অনেক ছেলে পুলে ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে;—তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্ব্বদা থাকৃতে হয়। ব'ল্লুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।' তুমি সংসার থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে, তোমায় দেখ্‌তে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

"তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বল্লে, এই জগৎ যেন একটী ঝাড়ের মত, আর জীব হ'য়েছে—এক একটী ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবৃলুম, তবে তো খুব বড়লোক! ব্যাখ্যা করৃতে বল্লাম,—তা ব'ল্‌লে "এ জগৎ কে জান্‌তো?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম ভাগ)। ১৯০২

অমৃতলাল বসু

১৮৫৩—১৯২৯

কালাচাঁদের বাহাদুরী

কালা। চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী! ভারী সেজেগুজে সব বাবা শীকারে যাচ্ছে, পাবে চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী; সেজেছ গুজেছ মন্দ নয়, কিন্তু ওতে আর কিছু হয় না বাবা, সব পুরোন হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের চাঁদা—পথে পথে কাঁদা বিজ্ঞাপনের খরচ কুলোয় না; ধর্ম্মপ্রচার—এক সন্ধ্যা আহার জোটা ভার, জয় রাধেকৃষ্ণই বল, আর শান্তি শান্তিই বল, বাড়ীতে ঢুকলে বাবা সব ঘটী বাটি সামলায়; ওলাউঠা, মারীভয়, জল প্লাবন—আমরা এককালে ঢের করেছি, এখন আর ও সবে কুলোয় না; চোগা ঝুলিয়ে তুড়িলাফ মেরেও দেখা গেছে, দাড়ী রেখে চসমাও পরা গেছে, গেরুয়া রুদ্রাক্ষের ভিটকিলিমিও করা গেছে, কোন দিন এক সন্ধ্যা, কোন দিন একাদশী; কালাচাঁদ মাষ্টার আর ধানে যাচ্ছে না, মারি তো হাতী আর লুঠি তো ভাণ্ডার, চুনোপুঁটীতে আর নেই; জমীদার খুড়োকে রাজা হবার জন্য যে রকম নাচন নাচিয়েছি, আর এ দিকে ফিশ সাহেব হাতে আছে, এবার কিছু গুছিয়ে বসছিই বস্‌ছি।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী। ঐ গেল—ঐ গেল, সব শীকারে বেরিয়ে গেল।

কালা। গেল গেলই।

কালিন্দী। আর তুমি ব'সে ব'সে দেখছো।

কালা। এইবার প্রিয়ে মিছে কথা কোয়েছ, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।

কালিন্দী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তো পেট চলবে কেমন কোরে?

কালা। পেট চলবার জন্য ভাবনা কি? যে রকম বাজার-ভাও পড়েছে, আপনা-আপনিই চলতে পারে, নেহাৎ না হয়, ছটাকখানেক ক্যাষ্টর অয়েল খেলেই রীতিমত চলবে।

কালিন্দী। নাও ঠাট্টা রেখে দাও, তুমি কোন কাজের নও।

কালা। ছি, প্রিয়ে, স্ত্রীর মুখে ও কথা স্বামীর পক্ষে বড় বদনাম, তুমি একেবারে আমার পসার মাটী করবে না কি?

কালিন্দী। ওরা সব যোড়ে যোড়ে গেল, কত শীকার ধরবে, কত টাকা

পাবে, আর তুমি কিছু কচ্ছো না ; চল আমরাও দুজনে শীকার খুঁজতে যাই।

কালা। চাঁদবদনি ভগিনি—ঐটে মাফ করতে হবে, তোমায় নিয়ে আমার শীকারে যাবার ভরসা হয় না।

কালিন্দী। কেন আমি কি তোমার ঘাড়ে পড়বো ?

কালা। আমার ঘাড়ে তো পড়েই আছ, সে ভয় করিনি, যদি আর কারুর ঘাড়ে পড়ো—

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ প্রাণনাথ, তোমার এখনও কুসংস্কার !

কালা। কি জান ভগ্নি, সংস্কার—সংস্কার বিশেষ অবগত আছি, তাই প্রিয়ে, স্ত্রীকে বাজারে বার করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে।

কালিন্দী। প্রাণনাথ, আমি তেমন নই।

কালা। এখন তো তেমন নয়, কিন্তু তেমন তেমন হ'লে কেমন হয়, তা কি বলা যায় ? দেখ, এই যে সব ঠাকরুণরা যোড়ে যোড়ে শীকারে বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে আমি বড় রাজী নই ; মাগ টোপ ফেলে যে মাছ ধরতে যায়, তার অনেক সময়েই মাছে টোপটি ঠুকরে পালিয়ে যায় ; আর গাঁথতে পারলেও টোপটুকু নিশ্চয়ই মারা যায়। আমি জালের শীকার বুঝি ভাল, যা পেলুম, সাফ টেনে নিলুম। তুমি কিছু ভেব না, আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনোপুঁটী নয়, একেবারে দেড়মণি কাৎলা গ্রেপ্তার হবে।

রাজা বাহাদুর। ১২৮৮

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

১৮৫৪—১৯০৫

কাশীধাম

৺কাশীধামের কোতোয়ালী দেখিয়াছ ? বড় রাস্তার ধারেই এখন কোতোয়ালী বা পুলিশ-থানা ! কোতোয়ালীকে দক্ষিণে রাখিয়া পশ্চিমমুখে যে গলি গিয়াছে, তাহার নামটি জানো ত ? গলিতে কি আছে, তাহা জানো ত ? গলির দুইধারে দোকান-শ্রেণী,—বিবিধরূপে সজ্জিত। প্রত্যেক গৃহই দ্বিতল। প্রথম-তলে পুরুষ ব্যবসায়ী, দ্বিতীয়-তলে নারী ব্যবসায়ী। নিম্ন-তলে দোকান,—

আতর, গোলাপ, ফুলেল তৈলের গন্ধে ভুর-ভুর করিতেছে, কোন দোকান,—মালাই, রাবড়ি, দধি, ক্ষীরাদির লহরী-লীলায় দুর্ব্বল মানবের মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে;—কোন দোকানে রাশীকৃত থাক্ থাক্ বরফি সাজানো; যেমন গিরি-শৃঙ্গের উপর গিরিশৃঙ্গ, শোভমান, বরফির শোভাও তদ্বৎ। কোথাও পিতলের সামগ্রী স্বুবর্ণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কোথাও পর্ব্বতপ্রমাণ বস্ত্রাদির সমাবেশ। কোথাও হীরা-মণি-মুক্তা আভা বিকিরণ করিতেছে; কোথাও বারানসীসাড়ী ও বারানসীশালের বাহারে পথিকের মন পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আর কোথাও সেই বিপদ্‌ভঞ্জন, দুঃখনিবারণ, সংসারক্লিষ্ট মানবের একমাত্র অবলম্বন তাল তাল তামাকু নৈবেদ্যের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। আতরের গন্ধ ভাল লাগে না, অট-ডি-রোজের গন্ধ ভাল লাগে না, দশগুণা চামেলির গন্ধও ভাল লাগে না,—কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গীয় প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ গন্ধে,—সেই তাম্রকুটের মহাসৌরভে মন কেবল মোহিত হয়। হায়! ঐ সেই দোকান! সেই নন্দনকানন,—সেই ইন্দ্রপুরী, সেই গোলকধাম! রসগোল্লা চাই না, বাতাবি সন্দেশ চাই না, লেডিকেনি চাই না,—গঙ্গার ইলিসমাছের টাট্‌কা ডিমভাজাও চাই না,—চাই কেবল ঐ দোকানের আট-আনা-সের তামাক। সমুদ্রমন্থনকালে কি এ তামাকের উৎপত্তি হইয়াছিল? ধন্বন্তরি-সুধা কলসের মধ্যস্তরে কি, এ তামাক বিদ্যমান ছিল? আপণ-শ্রেণী মধ্যে তামাকের দোকান পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ। দেবগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, নাগগণ-মধ্যে যেমন বাসুকি, শৈলগণ-মধ্যে যেমন হিমালয়, নদীগণ-মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যগণ-মধ্যে তামাক। আমার বোধ হয়—স্বর্গরাজ্য কৈলাসপুরী বা গোলকধাম স্বতন্ত্র কোথাও অবস্থিত নয়। এই পৃথিবীতেই স্বর্গ, এই পৃথিবীতেই পাতাল বা পিশাচভূমি পাওয়া যায়। কেননা, ইহ-সংসারে তাম্রকূট বিরাজিত থাকিতে অন্য স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠপুরী বা গোলোক-ধাম সম্ভবে না। তাম্রকূটবর্জ্জিত দেশই নরক, পাতাল বা পিশাচভূমি।

এই গলির নাম—ডালকি-মণ্ডি। দোকান-শ্রেণীর নিম্ন-তলে একটীমাত্র তামাকের স্বর্গরাজ্য আছে, উপরি-তলে কিন্তু অনন্ত স্বর্গরাজ্য! উপরি-তলে বারমাস্ বসন্ত। এখানে নক্ষত্রপুঞ্জ নাই, কেবলই পূর্ণচন্দ্রের হাট। দেখুন দেখি—ঐ গবাক্ষপানে চাহিয়া দেখুন দেখি,—কিবা শোভার উদয় হইয়াছে। এখানি কি শরৎকালীন পূর্ণিমার চাঁদ?—না মধুমাসের চতুর্দ্দশীর চাঁদ? একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া, বুঝিয়া দেখুন দেখি? এই যে প্রত্যেক গবাক্ষেই

এক একটী চাঁদের উদয় দেখিতেছি! আবার দেখ, ঐ বারেন্দার পানে চাহিয়া দেখ, কতকগুলি পূর্ণিমার চাঁদ একত্র হইয়াছে। চাঁদের কি মেলা বসিয়াছে? গগন-চাঁদের বাক্‌শক্তি নাই, শ্রবণশক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তি নাই,—কিন্তু ঐ দেখ, গবাক্ষের চাঁদসমূহ কেমন মৃদুমধুর হাসিতেছে! হাসিতে হাসিতে সুধা ক্ষরিতেছে, কি মুক্তা বরষিতেছে,—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। একি! বীণাযন্ত্রে স্বর মিলাইয়া কেহ গান করিতেছে, না, নারী-পূর্ণশশি-কণ্ঠে কোমল কূজনধ্বনি হইতেছে? বিধাতা কি নারী-পূর্ণশশীর নয়নযুগল অমনি বাঁকা করিয়া গড়িয়াছিলেন? বিধাতা যে ভাবেই গড়ুন, নয়ন কিন্তু বাঁকা হইয়া আছে। হে ডালকি-মণ্ডি-গলি! তুমি সহরের সার—সর্ব্বস্ব! বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য, তোমা অপেক্ষা অধিক কিনা, তাহা দার্শনিকগণের ভাবিবার বিষয়। হে গলিরাজ! তুমি বালক-বৃদ্ধ-যুবার আশ্রয়ভূমি—তোমাকে নমস্কার। তুমি শান্তির সুখ-নিকেতন,—তোমাকে নমস্কার। তুমি কলঙ্কহীন পূর্ণশশী,—তোমাকে নমস্কার। তুমি বালকের গুরু, যুবকের ঠাকুর মহাশয়, বৃদ্ধের ভিক্ষাবাপ—তোমাকে নমস্কার। তুমি বিনামেঘে বজ্রাঘাত,—তোমাকে নমস্কার। হে নারী-পূর্ণচন্দ্র! তুমি ডালকি-মণ্ডির ব্রহ্মাস্ত্র,—তোমাকেও নমস্কার। তুমি কাঙ্গালের কহিনুর—তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী। ১৯০২

অশ্বিনীকুমার দত্ত

১৮৫৪—১৯৩২

কর্ম্মযোগ

এ দেশ তামসিকতাগ্রস্ত হইলেও সাত্ত্বিকতা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় নাই। ঋষিগণ, ভক্তগণ এ দেশের অস্থি মজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব এমন দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অদ্যাপি সামান্য কোন কৃষক তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিলে, তাহাকে সেই ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই সে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহংকার স্থান পায়। 'তোমার ক'টি পুত্র কন্যা?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে 'আজ্ঞা! আমার কি? ভগবান আমার গৃহে এই ক'টী রেখেছেন।'. এখনও অনেক লোক আছেন

যাঁহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় তজ্জন্য সতর্ক, অতি সঙ্গোপনে দান করেন এবং আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ; ঋষিচরণরেণুপূত এ দেশ কিছুতেই বিনাশ পাইবে না বলিয়াই বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখনও সাত্ত্বিক ভাব প্রচ্ছন্নরূপে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অতি অল্পস্থলেই কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। রাজসভাবও আমাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। তামস ভাব ছাড়িয়া রাজসে উন্নত হওয়ার দিন যেন আসিতেছে মনে হয়। অনবধান, নিদ্রা, জড়তা ক্রমেই দূর হইতেছে। 'উঠো, জাগো,'—এই আহ্বান পঁহুছিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সাহায্য করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়াছে। কর্ত্তা আমাদিগের সহায়। আমরা দুর্দ্দশার চরমাবস্থায় পতিত বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে। যাঁহার কাণ আছে তিনি নিরবচ্ছিন্ন "মা ভৈঃ মা ভৈঃ" ধ্বনি শুনিতেছেন। যাঁহার চোখ আছে তিনি ঊষার আলোক দেখিতেছেন। যে ভাস্বর মহিমায় সমস্ত ভারতবর্ষ পুনরায় উদ্ভাসিত হইবে, ইহা তাহারই অগ্রদূত। এই পূর্ব্বাভাস মনে করিতেই বৃদ্ধেরও প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে, ধমনীতে ধমনীতে বেগে শোণিত প্রধাবিত হইতেছে। কিন্তু যুগপৎ প্রাণে ভয়ের উদয় হইতেছে, পাছে রজোগুণ ভারতের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া ফেলে। কর্ত্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কোন জাতির হিংসা দ্বেষে দগ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্য বাহিক উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমরা যেন সেই ঋষিনির্দ্দিষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা সমগ্র পৃথিবীটাকে আবৃত করিয়া জগন্ময় সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাভিমুখ স্বকীয় উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত, যাবতীয় উদ্যম, অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টায় আমাদিগের যেন সর্ব্বদা মনে থাকে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। ভারতে কর্ম্মযোগ আবার জয়যুক্ত হউক।

কর্ম্মযোগ। ১৩২৯

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৫৪—১৯৩২

বিদায়

পুরাতন চিরস্থায়ী নহে, অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্ত্তমান নূতনে। পিতামাতা সন্তানে জীবিত, পূর্ব্বস্রোত পরবর্ত্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু।

পুরাতনের প্রধান ধর্ম্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে, তাহার জীবনই সাধনই সার্থক। আমার বহুদিন ব্যাপী সাহিত্য সেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে, তবেই আমি ধন্য; কিন্তু সে বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।

সংসারে কোন সংকল্পই, কোন সাধনাই প্রায় বাধাবিঘ্নহীন নহে। আমার পক্ষেও ভারতীর সম্পাদন কার্য্য নিষ্কণ্টক কর্ত্তব্য-পালন ছিল না। পত্রিকা-সম্পাদনের অর্থই পাঁচ জনকে লইয়া, পাঁচ জনের হইয়া কাজ করা; এই কাজের মধ্যে একটি সেরা কাজ—শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ ভিক্ষা করা। কোন পুরবালার পক্ষে এ কার্য্য কিরূপ অসম্ভব, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভারতীর সৌভাগ্য এই যে—এ বিষয়ে বিশেষভাবে তাহাকে মনোযোগ প্রদান করিতে হয় নাই। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যেখানে অকুণ্ঠিত প্রার্থনায় বড় আশা করিয়া হাত পাতিয়াছি, সেখানেও অধিকাংশ সময় হতাশ্বাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। আবার আশাতীত স্থল হইতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা লাভে হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই রূপেই বুঝি জীবনের তৌলদণ্ডে আশানৈরাশ্যের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

সুরুচি সুশ্রীল সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল; আর আনুষঙ্গিক একটি কর্ত্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। গুপ্ত প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে ভারতী কোন দিন পরিশ্রমকাতর হয় নাই। যে লেখার মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে, তাহাই মার্জ্জিত সুশোভিত আকারে ভারতীর পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

যখন এই সম্পাদন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন ফলাফল লাভ-ক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্ম্মের আনন্দই কর্ম্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তি-লোলুপ।

কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে, নিবৃত্তিতে কি নাই? দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জ্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্‌যাপনে অবসর পাইলাম, ইহাই আমার কর্ম্মের প্রকৃত পুরস্কার।

বিদায়ের দিনে আজ আমার নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ, কিন্তু হৃদয় নিষ্কাম-নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল। সযত্নপালিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহযুক্ত, কার্য্যক্ষম, বলশালী হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক আজ আমি মাতার ন্যায়ই কৃতার্থ।

ভারতী। ১৯১৫

জগদীশচন্দ্র বসু

১৮৫৮—১৯৩৭

যুক্তকর

পুরাতন লইয়াই বর্ত্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্ব্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা জানা আবশ্যক। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের জীবন্ত চিত্র এখনও অজন্তার গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পথ অনেক সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন রাস্তাঘাট বিশেষ কিছুই ছিল না। রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় একদিনের পথ। বাহন গরুর গাড়ী। অনেক কষ্টের পর অজন্তা পৌঁছিলাম। মাঝখানের পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া দেখিলাম, পর্ব্বত খুদিয়া গুহাশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে; ভিতরে কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা। গুহার প্রাচীর ও ছাদে চিত্রাবলী অঙ্কিত; তাহা সহস্রাধিক বৎসরেও ম্লান হয় নাই। দরবার চিত্রে দেখিলাম,

পারস্য দেশ হইতে দূত রাজদর্শনে আসিয়াছে। অন্য স্থানে ভীষণ সমর চিত্র। তাহাতে একদিকে অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা নারীসৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। আর এক কোণে দেখিলাম, দুইখানা মেঘ দুই দিক হইতে আসিয়া প্রহত হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান বাষ্পরাশিতে দুইটি মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরস্পরের সহিত ভীষণ রণে যুঝিতেছে; এই দ্বন্দ্ব স্থষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে; এখনও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। যখন সবিতা সপ্ত অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পূর্ব্বদিকে উত্থিত হইবেন, তখনই আঁধার পরাহত হইয়া পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইবে।

আর একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধি-জর্জ্জরিত, শোকার্ত্ত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহা-সংক্রমণের দিন।

অর্দ্ধ-অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহামন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতগাত্রে প্রশান্ত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। সুখ-দুঃখের অতীত শান্তির পথ তাঁহারই সাধনার ফলে উন্মুক্ত হইয়াছে।

সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোন সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

ইহার কয় বৎসর পর কোন সম্ভ্রান্ত জনভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি চিত্র ছিল; অন্যমনস্কভাবে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একখানা ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম। এই ছবি ত পূর্ব্বে দেখিয়াছি—সেই গুহামন্দিরের প্রশান্ত বুদ্ধমূর্ত্তি! চিত্রে আরও কিছু ছিল যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। মূর্ত্তির নীচেই একখানা পাথরের উপর নিদ্রিত শিশু, নিকটেই জননী উর্দ্ধোত্থিত যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। যিনি সমস্ত জীবের দুঃখভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই মায়ের দুঃখ দূর করিবেন। অমনি মানস-চক্ষে আর একটি দৃশ্য দেখিলাম। বোধিবৃক্ষতলে উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু গৌতম। দুগ্ধজন দেখিয়া সুজাতার মাতৃহৃদয় উথলিত। দেখিতে দেখিতে

অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।

আমার পার্শ্বে একজন বিদেশী বলিলেন—দেখ, দেবতার মুখ কিরূপ নির্ম্মম—একদিকে মাতার এত আগ্রহ, এত স্তুতি, কিন্তু দেবতার কেবল নিশ্চল দৃষ্টি! এই অবোধ নারী প্রস্তরমূর্তির মুখে কিরূপে করুণা দেখিতে পাইতেছেন?

তখন প্রকৃতির উপাসক জ্ঞানীদের কথা মনে হইল। এই অবোধ মাতা ও অজ্ঞাতবাদী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কি এতই প্রভেদ?

প্রকৃতিও কি ক্রূর নয়? তাহার অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় লৌহের ন্যায় কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে কয়জনে মমতা দেখিতে পায়? অনন্তশক্তি চক্র যখন উদ্ধতবেগে ধাবিত হয় তখন তাহা দ্বারা পেষিত জীবগণকে কে তুলিয়া লয়?

সকলে প্রকৃতির হৃদয়ে মাতৃস্নেহ দেখিতে পান না। আমরা যাহা দেখি, তাহা ত আমাদের মনের প্রতিকৃতি মাত্র। যাহার উপর চক্ষু পড়ে তাহা কেবল উপলক্ষ্য। কেবল প্রশান্ত গভীর জলরাশিতেই প্রকৃত প্রতিবিম্ব দেখিলে দেখা যায়। এই বিত্রস্ত জলরাশির ন্যায় সদা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে কিরূপে নিশ্চল প্রতিমূর্তি বিম্বিত হইবে?

যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যাতাড়নে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাঁহার আজ্ঞাতেই জলধি শান্তিময় মূর্ত্তি ধারণ করে। কে বলিবে ঐ অবোধ মাতার হৃদয় এক শান্তিময় করস্পর্শে কমনীয় হয় নাই?

আমরা যাহা দেখিতে পাই না, পুত্রবাৎসল্যে অভিভূত ধ্যানশীলা জননী তাহা দেখিতে পান। তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তরমূর্তির পশ্চাতে স্নেহময়ী জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিভাসিত! দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইল যেন ঊর্দ্ধ হইতে অমৃত ক্ষীরধারা পতিত হইয়া মাতা ও সন্তানকে শুভ্র ও পবিত্র করিয়াছে।

অনেক সময়ে এক অপূর্ণতা আসিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও সজীবতা অপহরণ করে। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখমিশ্রিত দৃশ্য অসামঞ্জস্যহেতু অশান্তিপূর্ণ হয়; অথচ আলো ও অন্ধকারের সমাবেশ ভিন্ন সুচিত্র হয় না। কেবল আলো কিম্বা কেবল অন্ধকারে চিত্র অপরিস্ফুট থাকে। যে দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার ন্যায় জীবনচিত্র অনেক সময় সৌন্দর্য্যহীন হয়। ঐ চিত্রের ন্যায় একটি শিশু কিম্বা নারীর উর্দ্ধোত্থিত বাহুতে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া

যায়। আলো ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য্য দুঃখ তখন স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত হইতে কিরণ-রেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ম্ময় করে।

অব্যক্ত (রচনাকাল—১৮৯৪)। ১৯২০

বিপিনচন্দ্র পাল

১৮৫৮—১৯৩২

প্রাণের কথা

শুনিয়াছি, বয়স হইলে, লোকের প্রাণের মায়া কমিয়া আসে। যার কমে না, সে অধম, ঘোর সংসারী। বয়সের সঙ্গে আমার কিন্তু প্রাণের মমতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াই বুঝি চলিয়াছে। এ জন্য আমাকে অধম বলিতে হয়, বল। অধম যে নই, স্পষ্ট করিয়া এমন কথাও বলিতে পারি না। তোমরা অধম আমায় বলিলে, গায়ে বড লাগে সত্য, যেন তপ্ত তৈলের ছিটা পড়ে, মন প্রাণ তাতে চিড়চিড় করিয়া উঠে। তোমরা আমার আপনার জন নও, তাতেই বুঝি অমন হয়। আবার অধম বলিয়া তোমাদের আনন্দ হয়, তোমাদের অভিমান পুষ্ট হয়, তাই তাতে আমার অভিমানে এমন আঘাত লাগে। কিন্তু আমি নিজেকে অধম বলিয়া জানি বা না জানি, অনেক সময় ভাবিয়া থাকি। আমার নিজের মুখে যখন আমি নিজেকে অধম বলি, তখন প্রাণে আরাম পাই। নিজেকে নিজে নীচু করার একটা মহত্ত্ব আছে, তারই জন্য আপনাকে অধম বলিয়া মানাতে আমি কুণ্ঠিত নহি। অধম যে নই,—এমন কথা তাই বলিতে চাহি না। কিন্তু প্রাণকে ভালবাসি এই জন্য আমি অধম, একথা তোমরা বলিলেও আমি শুনিব না। বয়স ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু প্রাণের মায়া কমিল না, এজন্য আমি এক রত্তিও লজ্জিত নই; প্রাণের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হইবে ভাবিতে অসহ্য যাতনা হয়, একথা স্বীকার করিতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। প্রাণ আমার অতি প্রিয়, এ প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এ জগতে আর কিছুই নাই। এই প্রাণ আমার প্রীতির মাপকাঠি। যা'কে নিরতিশয় প্রীতি করি তা'কে প্রাণতুল্য বলিয়া সম্বোধন করি। যার চাইতে জগতে আর কিছু প্রিয়তর আছে বলিয়া মনে হয় না, তাকে প্রাণ বলিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ জগতে যা কিছু প্রিয়, তা কেবল এই প্রাণের জন্য। এই প্রাণের সেবা

করিয়া তারা সকলে প্রিয় হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, সমাজ, স্বদেশ, দেব, মানব সকলে প্রিয় এই প্রাণের জন্য। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত এই প্রাণের সেবা করিয়া এত প্রিয় হইয়াছে। এমন যে প্রিয় প্রাণ, ইহাকে ছাড়িব ভাবিলে কষ্ট হয়, এ আর বিচিত্র কি?

জেলের খাতা। ১৯১০

যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন

তারপর আরও খোলাখুলিভাবে রাজা মানুষের মানুষ বলিয়াই যে একটা অধিকার আছে, ধর্ম্ম-সাধনের বা সমাজ-শাসনের অজুহাতে কিছুতেই যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহাসত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতেই রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেণ্টের ভারত শাসন সম্বন্ধীয় কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্যপ্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন। রাজার বিলাত প্রবাস-কালে আরনল্ড নামে একজন ইংরাজ তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। আরনল্ডের কথায় জানা যায় যে রাজা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে বৃটিশের আধিপত্য থাকিবে, এইরূপ মনে করিতেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাদি শিক্ষা করিয়া দেশের শাসন নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরদিন বা সুদূর অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বিদেশীদের শাসনাধীনে বাস করিবে, এ চিন্তা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকুশলাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতি দুনিয়ার মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য ইংরাজ শাসনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন। এই জন্যই ইংরাজ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুক, ইহাতে রাজার আপত্তি ছিল না।

কিন্তু এতবড় একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সার্ব্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্ত্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ যে সকল শাসনসংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সবগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অভ্যুদয়কালে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের জাতকে বড় হীন বলিয়া মনে করিতেন। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া সর্ব্বদাই মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেন, তখনও সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা য়ুরোপের কোনও জ্ঞানলাভ করেন নাই। ইংরাজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্যেই সেকালে তাঁহাদের য়ুরোপের মনুষ্যত্বের এবং য়ুরোপীয় সমাজের যা-কিছু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। য়ুরোপের এই ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাসে এদেশের চিত্রপটেও যে য়ুরোপের সাহিত্য সৃষ্টির মতন উৎকৃষ্ট রসমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব, ইহা দেখাইয়া বাঙ্গালীর অন্তরের এই আত্মগ্লানিটা নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই একটা অতিবড় কাজ করিয়াছিলেন। আর কোনও কিছু না করিলেও এই তিনখানি উপন্যাসের দ্বারা তিনি বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ,—সকলেরই যে যথাযোগ্য পথে আত্ম-চরিতার্থতা সাধনের অধিকার আছে, এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীসমাজে এ সত্যটা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের নামে প্রকাশ্যভাবে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানব-প্রকৃতির নামে পরোক্ষভাবে সেই সংগ্রামেই অসাধারণ শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

নবযুগের বাংলা। ১৯২৫

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১৮৫৯-১৯৫৬

ভোজবিদ্যা

আশ্চর্য ব্যাপার নানা রকমে হ'তে পারে। যেটা নূতন দেখি, যার কারণ খুঁজে পাই না, সেটাই আশ্চর্য্য। অন্যে সে ব্যাপার ঘটালে তাকে ঐন্দ্রজালিক ভাবি। বিজ্ঞানে কত শত ইন্দ্রজাল আছে, যে বারম্বার দেখেছে সেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়, যে না দেখেছে তার ত কথাই নাই। জলন্ত অঙ্গারের উপর চল্যে যাওয়া, কি অঙ্গার ফাবৃড়া-ফাবৃড়ি করা, আশ্চর্য কথা বটে, কিন্তু ভেলকি নয়, সত্য। এখানে বাঁকুড়া নগরের উপকণ্ঠে একৃতেশ্বর শিবের গাজনে প্রায় প্রতিবর্ষে অগ্নি-সন্ন্যাসীকে আগুনের উপর চ'লতে দেখা যায়।* আমি পুরীতে এক কুন্‌বী বামুনকে (মান্দ্রাজের) কচ্-কচ কর্যে কাচ চিবিয়ে খেতে, লোহার পেরেক গিলতে দেখেছি। সে সাপ খেতে পারে, বিষও খেতে পারে, কিন্তু কে এই মারাত্মক পরীক্ষা করতে চাইবে। একবার আমার গ্রামের বাড়ীতে সকাল বেলায় এক পশ্চিমা ও তার স্ত্রী সাত-আট বছরের এক সিপ্-সিপ্যে লেঙ্গটি-পরা মেয়েকে দিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়েছিল। মেয়েটি চোখ মুদে যোগাসনে এক আঁঠুর নীচে ছোরার ডগায় বস্যেছিল, এক মিনিট হবে। প্রথমে তিন স্থানে তিনটি ছোরা ছিল, পরে দুটা খসিয়ে নেয়। ছোরার অগ্রস্পর্শ নাম মাত্র। কোথায় বা মাধ্যাকর্ষণ, কোথায় বা ভারকেন্দ্র!

হস্ত-লাঘব নয়, ইন্দ্রজালও নয়। যোগের লঘিমা কিনা, জানি না। সে এই একটি বিদ্যা জানত। কেহ কেহ পাকা দোতলার ঘরে সাপ দেখায়। হস্ত-লাঘব নয়, যোগও নয়, মায়া ব'লতে হয়। মনসার ঝাঁপানে দুই দলের মায়া

* রোগ-পীড়িত হয়ে লোকে মানসিক করে। কেহ বিশ হাত, কেহ দশ হাত মানসিক করে। রোগমুক্ত হ'লে শিবের মাড়োতে এসে অঙ্গনে চুলী কেটে অঙ্গারের আগুন করে। চুলীর দুই দিকে পুকুরের গুড়ো শেঅলা (যে শেঅলা দিয়ে গুড় হ'তে দলুয়া করা হয়) ও এক গর্তে কলাপাতা দিয়ে দুধ রাখে। দুধে পা ভিজিয়ে শেঅলায় দাঁড়িয়ে গন্-গন্যে আগুনের উপর দিয়ে চল্যে যায়। সেখানে,আবার শেঅলায় ও দুধে পা দেয়, আবার আগুনের উপর দিয়ে চল্যে আসে। অনেকে একেবারে বিশ হাত পারে না, দশ হাত দশ হাত দু'বারে চলে। অনেকে তাও পারে না, পাঁচ হাত চলে, থামে, চলে। কেহ কেহ তাও পারে না, আড়াই হাত, চারিবার চল্যে দশ হাত করে। আশ্চর্য এই, পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

পরীক্ষা হ'ত, বহু লোকের মুখে শুনেছি। এক দলের গুনিন অন্য দলের গুনিনের গায় মুড়কি ছুঁড়ে দিত, গুনিনকে ভীমরুলে কামড়াত, ঝেঁটা-কাটি ছুঁড়ে দিত, সাপ হয়ে আক্রমণ করত।* কিন্তু দুই-ই মিথ্যা। শুনলে বিশ্বাস হয় না। দেখলেও হ'ত না। আত্মারাম-সরকার মায়াবিদ্যায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি একালের-সম্বর-সিদ্ধ ছিলেন। একবার আমাদের গ্রামে এক বিদেশী মায়িক খেলা দেখাতে এসেছিল। লোকে দেখছে, শূন্যে দোড়ী ঝুলছে, এক ছোকরা দোড়ী বেয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় গুনিনের মুখ শুখিয়ে গেল, খেলা বন্ধ হ'ল। পরে জানা গেল সেখানে আত্মারাম-সরকারের এক শিষ্য ছিল, গুরুকে নমস্কার ক'রলে না দেখে, গুনিনকে অপদস্থ করেছিল। আমি দেখিনি, কিন্তু অবিশ্বাসও করি না। কারণ যা দেখেছি, যা শুনেছি তা না-কে হাঁ করাই বটে। "রত্নাবলী" নাটকের ঐন্দ্রজালিক রাজার অন্তঃপুর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, একজন নয় চারি পাঁচ জন আগুন ও ধুঁআ দেখেছিল। বিদ্যাপতি তাঁর "পুরুষপরীক্ষা"য় ইন্দ্রজালে মেঘ ও কুক্কুট-যুদ্ধ দেখিয়েছেন। ইদানী ইন্দ্রজাল-বিদ্যা লোপ পাচ্ছে। এখন ভোজ-বিদ্যা ও ভানুমতি-বিদ্যার দুই সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেকের একটি একটি খেলাই, সে বিদ্যা। আর যে সব, সে সবের কোনটা হস্তলাঘব, কোনটা কৈতব। দক্ষিণের নিজাম হাইদারাবাদে এক সম্প্রদায় ভোজ বিদ্যা দেখায়, জালে-বাঁধা পেঁড়ায়-পোরা বালককে অদৃশ্য করায়। মধ্যভারতের এক সম্প্রদায় ভানুমতী-বিদ্যা দেখায়, আমের আঁঠি পুঁতে গাছ করে্য আম ফলায়।

ভোজ-বিদ্যার দেশে সে বিদ্যা যে গল্পের বস্তু হবে, তাতে আশ্চর্য কি? শুক-বিলাসের কাহিনী বলি। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সভায় প্রিয় মন্ত্রী-স্বরূপ শুককে জিজ্ঞাসলেন "এখন রাণী ভানুমতী কি ক'রছেন?" "রাণী বিনা সূতায় হার গাঁথছেন।" রাজা অন্দরে লোক পাঠিয়ে জানলেন, তাই বটে। তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসলেন "হার গাঁথবার কারণ কি?" শুক ব'ললে, "আজ রাত্রে ভানুমতীর ভগিনী তিলোত্তমার বিবাহ, ভানুমতী বরের গলায় হার পরিয়ে দেবেন।" রাজা ও সভাজন শুনে অবাক্, উজ্জয়িনী হ'তে ভোজপুরী মাসেকের পথ, রাণীর যাওয়া যে অসম্ভব। "দুই ডাকিনী গাছ চালিয়ে

* ১৩৩৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মেদিনীপুরের ঝাঁপানের বর্ণনায় এই রূপকথা আছে।

ভানুমতীকে নিতে আসবে।" রাজা রাত্রে শীঘ্র শীঘ্র ভোজন কর্য়ে মটকা মেরে শুয়ে রইলেন। রাজা ঘুমিয়েছেন ভেবে ভানুমতী অন্য ঘরে হার আনতে গেলেন, রাজা চুপি চুপি গাছের এক ডালে চড়্যে ব'সলেন। পরে ভানুমতী গাছের যথাস্থানে ব'সলেন, গাছও নিমেষে ভোজপুরের অন্দরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। রাণী ভিতরে গেলেন। রাজা অতঃপর কি ক'রবেন ভাবছেন, এমন সময় মল্ল-অধিপতি ভুরিমল্লের পুত্র বর-বেশে রাজ-ভবনে আসছিলেন।* বিক্রমাদিত্য বরযাত্রীর দলে মিশে যাবার বুদ্ধি ক'রলেন। কিন্তু সে বুদ্ধি ঘ'টল না, বরযাত্রীরা মারতে গেল। মল্ল-অধিপতি বিবাদ মিটাতে গিয়ে বললেন, "বাপু, এক কাজ ক'রতে পার? আমার পুত্র কুৎসিত, কুব্জ। তাকে দেখলে ভোজ-রাজা কন্যা দিবেন না। তুমি বর-বেশে চল, বিবাহ হয়ে গেলে, রা'ত থাকতে চল্যে যাবে, তখন আমি বউ নিয়ে দেশে চল্যে যাব।" রাজা সম্মত। বরের রূপ দেখে সবার আহ্লাদ। বিবাহ হ'ল। বাসর-ঘরে ভানুমতী ভগিনীপতির সহিত কৌতুক ক'রলেন। রা'ত থাকতে রাজা হারটি নিয়ে গাছে চড়্যে ব'সলেন, ভানুমতী পরে এলেন, গাছ চ'লল। উজ্জয়িনীর রাজ-পুরীতে এসে রাণী বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রতে গেলেন, সেই অবসরে রাজা নিজের ঘরে শয্যায় শুয়ে পড়লেন। রাণী দেখলেন, রাজা ঘুমাচ্ছেন। রাজা বাসর-ঘর হ'তে চল্যে আসবার সময় তিলোত্তমাকে বল্যে'ছিলেন, "দেখ আমি বর নই, তোমার বর ভোরবেলায় আসবে।" ভোর হ'লে কুব্জ বাসর-ঘরে ঢুকবার উপক্রম ক'রলে। তিলোত্তমা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঘরের ওল-তলায় ফেলে দিলে। সে কেঁদে উঠল। মল্ল-ভূপতি ভোজের কাছে তার তনয়ার অত্যাচারের প্রতিকার চাইলেন, মেরে পিঠে কুব্জ কর্য়ে দিয়েছে! ভোজরাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসলেন। সে ব'ললে, এই কুব্জের সঙ্গে বিবাহ হয়নি, বর চল্যে গেছেন। এই কলহের বিচার কে করে'? অগত্যা দুইরাজা কন্যা ও পুত্র সহ উজ্জয়িনীতে গিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বিচার ক'রতে ব'ললেন। বিক্রমাদিত্য সুযোগ পেলেন, শ্বশুরকে মিষ্ট ভৎর্সনা ক'রলেন, "কন্যার বিবাহ দিলে, মোরে নাই নিমন্ত্রিলে, কহ রাজা কিসের কারণ। এক ঘোড়া বড় আর, কি ক্ষতি হইল তোমার, ভয় হৈল করিতে বরণ॥" † তিলোত্তমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

* ভুরিমল্ল কি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরমল্ল?

† অর্থাৎ "জামাই বরণ করতে একটা ঘোড়া দিতে হ'ত, সেটা আর বড় কথা কি।" শত

'শুনি তিলোত্তমা কয়, ও পতি কখন নয়, কুব্জ ও কুচ্ছিত অতিশয়। বিবাহ করিল যেই, পরম সুন্দর সেই, তনু তার অতি রসময় ॥" কিছু নিশান আছে? রাজা নিজেই বিনা সুতার হার দেখালেন, সব প্রকাশ হয়ে পড়'ল। ভানুমতীর লজ্জার সীমা রইল না ॥

প্রবাসী। ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১—১৯৪১

সুরমার মৃত্যু

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ— ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল—সে'ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারি দিকে দেখিতেন,—দেখিতেন কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন—আকাশে

বৎসর পূর্বে গাঁয়ে গাঁয়ে দল-টাটু দেখা যেত। এখন শহরেও ঘোড়-সওয়ার দেখতে পাই না। মোটরের কল্যাণে রথের অশ্বও অদৃশ্য হচ্ছে।

সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে—মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারি দিক দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন—কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজকাল আর সে সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব—সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে—সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ-পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বউঠাকুরাণীর হাট। ১৮৮২

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের

মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া, বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ। কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঁঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়; মনে হয়, যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই; তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই; তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, 'আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন'—তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

রাজপথের কথা। ১২৯১

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

এখন সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেচি। আমাদের যাত্রার আরো এগারো দিন বাকি আছে। এগারোটা দিন আসলে কত অল্প কিন্তু কি অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

চমৎকার লাগ্‌চে—উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত

শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ—আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী অপরিচিত বিস্মৃত নিভৃত ছায়াস্নিগ্ধ নদী-কলধ্বনিসুপ্ত বাঙ্গলা দেশ—আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, আমার ভালবাসা-লালায়িত কল্পনা-ক্লিষ্ট যৌবন, আমার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাশীল অতিব্যথিত জীবনের স্মৃতি, এই সূর্য্যকিরণে এই তপ্তবায়ু হিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার স্বপ্নভারনত দৃষ্টির সাম্‌নে জেগে উঠ্‌চে। আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাঙ্গলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে—আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনক সূর্য্যাস্ত রঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতি প্রতিপত্তিহীন প্রচণ্ড চেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন, এবং যথার্থ নির্জ্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত্ত, এবং অপর্য্যাপ্ত প্রবল উত্তেজনা চাইনে।

রচনাকাল। ১৮৯০

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

Mrs Smallwoodকে আমাদের ডিনার টেবিলে দেখে অনেক সময় ভাবি—যে সব মেয়ের বয়স হয়েছে—যাদের গৌরবের দিন চলে গেছে তাদের মনের অবস্থা কি রকম? এই Smallwood খুব প্রখর মেয়ে—এককালে বোধ হয় অনেকের উপর অনেক খরতর শরচালনা করেচে—অনেক পুরুষ এর রুমাল কুড়িয়ে দিয়েচে, মিষ্টিকথা বলেচে, নেচেছে, বিবিধ উপায়ে সেবা এবং পূজা করেচে—এখন আর কেউ গল্প করবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় পরিবেশন করে না—যদিও সে নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, এবং তার প্রখরতাও বড় সামান্য নয়। অবিশ্যি বয়স অল্পে অল্পে এগোয়, এবং অনাদর ক্রমে ক্রমে সয়ে আসে। কিন্তু তবু যে সব মেয়ে চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত করেনি, গৃহকার্য্য অবহেলা করেছে, ছেলেদের দাসীর হাতে সমর্পণ করে রাত্রির পর রাত্রি নৃত্যসুখে কাটিয়েচে, উগ্র উত্তেজনায় মত্ত হয়ে জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীততৃষ্ণঃ হয়েচে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উদগ্র আমোদ মদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে স্ত্রী থেকে মা এবং

মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে, পূর্ব্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।—একদিকে Mrs Smallwoodকে এবং অন্যদিকে Miss Low এবং Miss Hedistedকে দেখি—কি তফাৎ! তারা অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে—আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই আত্মা নেই—কেবল চোখেমুখে হাসি এবং কথা এবং তীব্র উত্তর প্রত্যুত্তর। এক ২ দিন সন্ধেবেলা যখন সমস্ত পুরুষ আপন ২ চুরোট এবং তাস নিয়ে স্বজাতি সমাজে জটলা করে—তখন Miss Hedisted কি ম্লান বেকার ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয় যেন আপন সঙ্গহীন অবস্থায় আপনি পরম লজ্জিত। এক-একদিন সেই রকম অবস্থায় আমি গিয়ে তাকে কথঞ্চিত প্রফুল্ল করে তুলি। সেদিন নাচের সময় Miss Vivian-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল—সে বলছিল তোমরা পুরুষ Ball Roomএর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু মনে হয়না—কিন্তু মেয়েদের Wall Flower হয়ে থাকা দুরবস্থার একশেষ—ভারি লজ্জা এবং নৈরাশ্য উদয় হয়।—এই সব দেখে আমার মনে হয় আমাদের পুরুষদের জীবনে যা কিছু সুখ আছে তার স্থায়িত্ব এবং গভীরত্ব মেয়েদের চেয়ে বেশি। অবিশ্যি দুঃখ এবং নিষ্ফলতাও বেশি। পুরুষদের মধ্যে যারা জীবনের সার্থকতা লাভ করেচে বয়োবৃদ্ধিকে তারা ডরায় না বরং অনেক সময়ে প্রার্থনা করে। তাদের আপনার মধ্যে আপনার অনেক নির্ভরস্থল আছে। তাই জন্যে পুরুষরা স্বভাবত কুঁড়ে।—দেখেছি এত পুরুষ আছে কিন্তু মেয়েরা নাচবার সঙ্গী পায় না। বাজ্‌না বাজ্‌চে, সুসজ্জিত উদ্ঘাটিতবক্ষ মেয়েরা উৎসুকভাবে ইতস্তত নিরীক্ষণ করচে—আর পুরুষরা দল বেঁধে জাহাজের কাঠরা ধরে অলসভাবে চুরট খাচ্চে এবং চেয়ে আছে। Gibbsকে বল্লুম তোমার নাচা উচিত—সে বল্লে My dear fellow, my dancing days are over—তার বয়স ২১। শেষকালে Miss Long চটেমটে বল্লে oh, men are so lazy। বলে রাগ করে মুখ ভার করে বেঞ্চিতে বসে রইল। আজকাল তাই নাচ বন্ধ আছে।

রচনাকাল। ১৮৯০

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সাম্‌নে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি—কিয়ৎক্ষণ বাদে বিরলকেশ স্থূল কলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে উপস্থিত—স্নানের ঘর খালাস হবামাত্রই দেখি সে অম্লানবদনে ঢোক্‌বার অভিপ্রায় করচে—কিছুমাত্র লজ্জা কিংবা দ্বিধা নেই—প্রথমেই মনে হল কোনরকম করে তাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি—কিন্তু কোনরকম শারীরিক দ্বন্দ্ব আমার এমন রূঢ় এবং অভদ্র মনে হয় এবং এত অনভ্যস্ত, যে কিছুতেই পারলুম না—তাকে আমার অধিকার ছেড়ে দিলুম। মনে মনে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ভাব্‌লুম খৃষ্টীয় নম্রতা শুন্‌তে খুব ভাল, কিন্তু আপাতত এই পশু পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী, এবং দেখ্‌তে অনেকটা ভীরুতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশী সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয়—কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ আমার একান্ত সঙ্কোচজনক বোধ হল। পৃথিবীতে স্বার্থপরতা অনেক সময়ে এইজন্যে জয়লাভ করে—প্রবল বলে নয়, অতি-মাংসগ্রস্ত কুৎসিত বলে।

রচনাকাল। ১৮৯০

পোস্টমাস্টার

ভূতপূর্ব পোস্ট্‌মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' —কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের

উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার?

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট্‌আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রচনাকাল। ১২৯৮ (?)

ছিন্নপত্র

কিছু আগেই পাবনা থেকে এ— তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত। মেম চা খায়, আমার চা নেই; মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দু চক্ষে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি; মেম ইয়ার্‌স্‌ এণ্ড্‌ টু ইয়ার্‌স্‌ এণ্ড মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি, কান্‌ট্রি সুইট্‌স্‌ ভালোবাসে, তাই একটা বহু কালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহু কষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষরূপে ছিল, সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি; আমি সাহেবকে বলেছি, 'তোমার মেম চা খায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে।' সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' আমি আল্‌মারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই, সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই, কোকোও নেই, পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে। দেখি কী রকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত এবং দুষ্ট দেখতে, সে আর কী বলব। মাঝে মাঝে সাহেবে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না,

চাকর-বাকরদের চেঁচামেচি এবং দম্পতির তর্কবিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আর আর কোনো কাজকর্ম-লেখাপড়ার সুবিধে দেখছি নে। মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে, 'What a little শুয়ার you are!' দেখ তো, আমার ঘাড়ে এ-সব উপদ্রব কেন!

রচনাকাল। ১৮৯২

ছিন্নপত্র

এই-যে একলাটি চুপ ক'রে বসে চেয়ে থাকা—দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি, দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানারকম রঙ ফুটছে; নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের একপ্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে; সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে; গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কুল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ক'রে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই সমস্ত পরিবর্তনশীল ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হল্‌দে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কি রকম করে বলতে পারি নে।

রচনাকাল। ১৮৯২

ছিন্নপত্র

কাল বিকেলের দিকে এমনি ক'রে এল, আমার ভয় হল। এমনতরো রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই

দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টকটকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন খেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্র ভাবে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েছে; এখনই পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ ক'রে দেবে—এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যখেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্ত ভাবে উড়ে উড়ে কা কা ক'রে ডাকছে।

রচনাকাল। ১৮৯২

ছিন্নপত্র

এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলিকে দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত।

রচনাকাল। ১৮৯২

ছিন্নপত্র

বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু

বুনোরকম ; কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।

রচনাকাল। মে ১'৯৩

ছিন্নপত্র

কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ও পারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।

রচনাকাল। ১৮৯৫

কৃষ্ণচরিত্র

বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষ্যমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসংগত হইয়াছে; তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবান্তর

তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমত, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন, অথচ তাহার ভালোরূপ মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কী করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব। যাঁহারা আপত্তি করেন যে যিনি সর্বশক্তিমান তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি, তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই রাবণ কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে পারেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন তবে তাহাতে মানুষের কোনো শিক্ষা হয় না; পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়। এক্ষণে তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে তিনি কি আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির শেষ সীমা?—বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।

পরন্তু, সমস্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সহিত এই তর্কের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। বঙ্কিম নানা স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষের আদর্শ যেমন কার্যকারী এমন দেবতার আদর্শ নহে। কারণ, সর্বশক্তিমানের অনুকরণে আমাদের সহজেই উৎসাহ না হইতে পারে। যাহা মানুষে সাধন করিয়াছে তাহা আমরাও সাধন করিতে পারি, এই বিশ্বাস এবং আশা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং স্বাভাবিক। অতএব কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব-আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। কারণ, ঈশ্বরের পক্ষে সকলই যখন অনায়াসে সম্ভব তখন কৃষ্ণচরিত্রে বিশেষরূপে বিস্ময় অনুভব করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

রচনাকাল। ১৩০১

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা, মরুবাসিনীর কোলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন্ দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্প-কোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সে সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে। বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবৃশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে।

রচনাকাল। ১৩০২

নরনারী

সমীর কহিলেন—'ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। শতরঞ্চফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান ছক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ তাহা নির্জীব কাষ্ঠ-মূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড় সিধা জিনিস নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও

না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্যমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর।'

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্যই স্ত্রীলোকের। কার্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপালক পুরুষ যখন একাকী ঊর্ধ্বনেত্রে নিশীথগগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কী সুখ পাইত! কোন্ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোনো কার্য্যে লাগিবে না কোন্ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? ক্ষিতির কথা মত পুরুষ যদি যথার্থ কার্যশীল হইত তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না—তবে একটি নূতন তত্ত্ব একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জনের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জনতার মধ্যে থাকে। কার্যবীর নেপোলিয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন—তিনি সর্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম তো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল। তিনি কি কাজ করিতেছিলেন, না ধ্যান করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে

কোনো ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত, জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।'

রচনাকাল। ১২৯৯

কাব্যের উপেক্ষিতা

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর-একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখ-বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবিকমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চির-দুঃখাভিতপ্ত নম্র ললাটে সিঞ্চিত হইল না। হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায়-বা তোমার অস্তাচল, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুই-একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবি পরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন তাহা পাঠক বিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে-কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ঊর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। সেক্‌সপীয়র বলিয়া গেছেন, গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও

পারে ; কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণসীমাবদ্ধ, তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশ অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা পাই না, কল্পনা-দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয়, দ্রৌপদীর নাম যদি ঊর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

ঊর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। ঊর্মিলা চিরবধূ—নির্বাক্‌কুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, ইনি কে?' লক্ষ্মণ লজ্জিতহাস্যে মনে-মনে কহিলেন, 'ওহো ঊর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রামচরিত্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখ-চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে তো কেবল বধূ ঊর্মিলা মাত্র।

তরুণশুভ্র ভালে যে দিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, ঊর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যে দিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সে দিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর, যে দিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সে দিন বধূ ঊর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্‌ নিভৃত শয়নকক্ষে

ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া ছিল তাহা কি কেহ জানে! সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল! যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকার আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ তো বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর ঊর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল! সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন; যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচিরপ্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল! পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?

রচনাকাল। ১৩০৭

নববর্ষ

নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েক জন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের

দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন, আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম রক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে; ইংরাজি কোর্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজি মাস্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল, কোথাও থাকিবে না, কোনো কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজিস্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ; তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণসহিষ্ণু, উপবাস ব্রতধারী; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনে বহু আড়ম্বর আস্ফালন করতালি মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে; যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব

না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

স্বদেশ। ১৩০৯

নৌকাডুবি

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। একদিকে চর ধুধু করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। "রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল, হায় হায়" করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মত আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

নৌকাডুবি। ১৯০৬

দুঃখ

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে,

সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই-সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস? ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

রচনাকাল। ১৩১৪

গোরা

এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। সে যে কী, সে যে কোথায় আছে, তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার পশ্চাতে অতীতকাল বলিয়া যেন কোনো পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্রলক্ষবর্ত্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে। সে যেন কেবল এক মুহূর্ত মাত্রের পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভাসিতেছে। তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'। সে কী ধরিবে, কী করিবে, আবার কোথা হইতে শুরু করিবে, আবার কোন্ দিকে লক্ষ স্থির করিবে, আবার দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে কর্মের উপকরণসকল কোথা

হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়া তুলিবে! এই দিক্‌চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে গোরা নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া কেহ তাহাকে আর দ্বিতীয় কথাটি বলিতে সাহস করিল না।

গোরা। ১৩১৬

জীবনস্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দু'ই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু, ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে —তাহা কোন-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে

হইয়াছে ; সুতরাং—পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারের অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাসসংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে ; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

জীবনস্মৃতি। ১৩১৯

নীলকুঠি

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুইধারে সিসুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের একদিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর ; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা—বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে ; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে ; আমি যখন সকালবেলায়

শেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে-ঢেউ তুলিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, সে-তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা। কিন্তু, পৃথিবী কোমোরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে—যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরও এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরোনো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু, আমার দামিনী!

রচনাকাল। ১৩২১

পয়লা নম্বর

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি.এ এম.এ এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল-বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টার-মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্ছি সে দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি, জর্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্‌স্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকেট কিনেছি। তাই আমি হাক্‌স্‌লি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি ইবসেন-মেটারলিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

রচনাকাল। ১৩১৪

পায়ে-চলার পথ

“ওগো পায়ে-চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব ক'রে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।”

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

“ওগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।”

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল স্থর্যোদয়ের দিক থেকে স্থর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

“ওগো পায়ে-চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।”

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।

রচনাকাল। ১৩২৬

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানালা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি ; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে : রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে ; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত ; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে ; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে ; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

রচনাকাল। ১৩২৮

যোগাযোগ

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে বরকনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে ? এমন মন্ত্র আছে যে-মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনও বেজে ওঠে নি। পাশে যে মানুষটি বসে আছে মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেছে। তার ভাবে ব্যবহারে যে একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনও পর্যন্ত কেবলই ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

এ দিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনও লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে—ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি ; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

এমন সময়ে বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখলে। এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ

ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে—অন্তত একটা ভাবনা উঠল এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন করে বললে সংগত হবে।

রচনাকাল। ১৩৩৪-১৩৩৫

শেষের কবিতা

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, "সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান?"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেণ্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরে মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেণ্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো ন্যুর‍্যাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো—খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে; মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমনকি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট-বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।… এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্‌স্‌কে বলব, 'মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।'… মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি

যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ্‌ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।”

রচনাকাল। ১৩৩৫

চোরাই ধন

বিবাহটা জীবনের পালাগান; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ, দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। অপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্‌সার সরবৎ, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনদিন দেখি আইস্‌ক্রীমের যন্ত্রে জমানো, শাঁসে রসে মেশানো, তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায় দিনে দিনে নতুন ক'রে সে অনুভব করছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন ক'রে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর, 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার, নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থৎ ঠিক যে-বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুনেত্রার। ওর নিজের বয়স আটত্রিশ, কিন্তু সযত্নে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

রচনাকাল। ১৩৪০

ছেলেবেলা

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবন গঠনে আরম্ভ হ'ল বিদিশি কারিগরি—কেমিস্‌ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে—কিছু-কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবৌঠান ছিলেন, ছিল তাঁর

ছেলেমেয়ে; জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল-মহলের আশে পাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত-সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি; ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত—আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক—মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হ'ত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়ার বিষয় উল্টে-পাল্টে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ, নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না, ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাক্তারি মতে, এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু, আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মাল-মসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায়, রাত এগারোটা পর্যন্ত, পালা ক'রে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন।

বিলেত গেলেম, বারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি; নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

রচনাকাল। ১৩৪৭

নীলা

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে—নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল—মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রী-বুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোন অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।

বই পড়ে যে-বই টেক্স্‌ট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালু চুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্‌ ছম্‌ ক'রে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

রচনাকাল। ১৩৪৭

সভ্যতার সঙ্কট

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মার্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

রচনাকাল। ১৩৪৮

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

১৮৬১—১৯০১

তিন শত্রু

কথায় বলে, "তিন শত্রু দিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়-জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শবশতঃ গড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশকালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষ-হেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কারা ?

প্রথম।—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্যে ও অনার্যে, ভগবদ্‌গীতায় ও মনসা ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাহা বেদ। বেদগাথা যদিও ইঁহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ী চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল,—"কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।" ভোলানাথ মহেশ ধুতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, আর 'কপালে আগুন' ত শিবের বিশেষ বৈভব। গোঁড়া মহোদয়েরা তেমনি স্বদেশগৌরবের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে

ধন্য মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শনবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল, তণ্ডুলও ভাল, তুষও ভাল। আহা! গোঁড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ

"সকণ্টক কইমাছ করায়ে ভক্ষণ।
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥"

এখন ইঁহাদের গলায় কাঁটা বিঁধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের গোঁড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়—ইরাংজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল। ইহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গ গুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টকাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি তথাস্তু বলিয়া হ্যাট্‌কোট্‌রূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচামচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতাঙ্গদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্ম্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে য়ুরোপীয় হওয়াই উচিত। য়ুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিদ্যায় তাহারা জগদ্‌গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উদাসীন। ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত সমাহিত, স্থির, ধীর, অলসগতি! আর য়ুরোপীয়েরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—এক মাসের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রলঙ্ঘন করে, অভেদ্য গিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা। ভীরুতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীচ্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজিনবীশ সংস্কারকেরা তার-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বচন!" "সত্য বচন!!" আমরা ধর্ম্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ে

কোন মতামত রাখি না—কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আমরা য়ুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজি শিক্ষিত সভ্যদলটি যথেচ্ছাচারী—না স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?

তৃতীয়!—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'-গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হারবার্ট স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণ সত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূত ও সৎও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি, সদাই স্তিমিত-লোচন. আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাঁপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও. তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমান মাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোটবড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোন এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্, অপর পক্ষেরও অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্। পুরাতন সভ্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে, এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পূরা-সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হইতেছে। মুসলমান মাঝী আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরেজী-সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু "দুর্গা আল্লা" "দুর্গা আল্লা" বলিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার-ববম্‌বম্-হালেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন,—যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটী সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন, সর্ব্বনাশী সংস্কারক।

রচনাকাল। ১৩০৮

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬২—১৯০২

পত্র

এদেশে আমার কোনও অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম তেমি শীত। গরমি কলিকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ দাগ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আল্‌কোহল্‌ থার্‌মোমিটার্‌ ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় একরকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, শ্লেজ চক্রহীন ঘস্‌ড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তার পর গঁরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেকচার করে বেড়াচ্চি। গাড়ী ঘরের মত steam pipe যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপ্‌ধপে সাদা—সে অপূর্ব্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাহিরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কিনা, তাই। প্রত্যেক ঘরে সিঁড়িতে steam pipe গরম রাখচে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে এরা অদ্বিতীয়, পয়সা রোজকারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয় কুলীর রোজ ৬৲ টাকা,

চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই; ২৪৲ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০৲ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজকার, তেমনই খরচ। একটা লেক্‌চার ২০০। ৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০৲ পর্য্যন্ত। আমি ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য—আমার এখানে এখন পোয়াবারো। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগল, তখন মজুদার ভায়ার মনেআগুন জ্বললো!

রচনাকাল। ১৮৯৪

পত্র

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অসম্পূর্ণ। * * *

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাড়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার উপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রূপো বাঁধন হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্র-গদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্ম-চক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরাজীতে imbecility বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজ্‌বে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দুবার ঘুরবে, বা চার বার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘাম্‌তে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ

ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সাম্‌নে ধরে দশ মিনিট বস্‌ব কি আধ ঘণ্টা বস্‌ব—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুল্‌চে আর পড়্‌ছে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়্‌চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্চে—মানুষগুলো মরে যাক্। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস্—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা গারদ, দেশ নয়। * * তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের মত উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনও হয় নি। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। * *

Idea ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। Independent হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ—অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোড় তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কাজ করে দেখাতে পারিস্, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস্, তবেই বুঝি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য!! না দেখা, না শোনা—একি চেঙ্গ্‌রামো নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও। সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দেবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি? আমাকে জগমোহন বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, এই ছোকরা। গুরুভাই কি রে?...হাঁ, চেলা বল্‌তে লজ্জা করে! একদম গুরু বন্‌বে! দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।

ঐ যে তুলসী ও সুবোধের মনের অশান্তি, তার মানে কোন কায নেই—গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক,—আমার মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে, তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কী বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও ত বাবা! কোনও চিন্তা রেখ না; নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care, আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা। গুপ্ত কোথা? সে আসতে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই কটি কথা মনে রেখ—

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সব ত্যাগ!

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভেবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্ত্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় করো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা ত কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ—এখন organised হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুপ্তকেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার—"সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"—ইতি

পুঃ—পূর্ব্বের চিঠি মনে রেখ—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের

ভেদ নেই, তাঁকে অবতার বল্লেই হয় না,—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলায় কায নাই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation চাই—কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও ছড়াও; আগুনের মত যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখ না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।

রচনাকাল। ১৮৯৫

বর্ত্তমান ভারত

বাহ্য জাতির সঙ্ঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে, প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্ঘাটিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্ব শরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সঙ্ঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে

—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥"

একদিকে, নব্যভারতভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নীনির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব ; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন-দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চত্ত্যভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ! অনুকরণ-দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয় ?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল ; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান !

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই ? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা কি সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে, সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ

বলেন, "বুঝি কোন ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, এ-ও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা! পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্ত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্ত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে;—মূর্ত্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্ত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্ত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত!

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্ত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্যকর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান লেখকের পাশ্চাত্ত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও ভারতসমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এত পার্থক্য যে, পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্ত্য সমাজে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্ত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটু লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীবেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন

দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুর্দ্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখোপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের,—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল —ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

রচনাকাল। ১৮৯৯

বাঙ্গালা ভাষা

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে

চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিম্ভূতকিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর – সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল – ঐ একচাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব, পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কল্‌কেতার ভাষাই রাখ্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না— কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান

দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটিকে ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখনি বুঝ্‌তে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্তকথা কয়; মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে—"রাজা আসীৎ!!" আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না আছে ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক্ ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে, ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে,—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝ্‌তে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্? সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এ গুলো সোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝ্‌বে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন,—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আস্‌বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্ করবে।

ভাব্‌বার কথা। ১৩১৪

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩—১৯১৩

বিক্ষুব্ধ হৃদয়

আন্টিগোনস্।

এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে।—কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখ্‌বে। আনন্দ হবে না? আর আমি!—দেশে কেউ নাই, যা'র মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বৃদ্ধ মাতা—শৈশবে পালন করেছিলেন বটে,—কিন্তু তার পর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাসার পাত্র কেউ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না।—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একট মহাজ্বালা আর্ত্তশ্বাসে উর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি—একটা তীব্রব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এক মহাব্যাধি—অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার—না তা'রই বা অপরাধ কি।—স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার! সন্তান তার পিতার পাপ, দৈন্য, ব্যাধির ভাগী হয় না? অথচ—যাক! ভাব্‌বো না। ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবো।—মেঘ করে আসছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে!—যাও উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা ক'রে কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে', অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে মৃদুমন্দ আন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন উন্মুক্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক—একই ভাবে চলেছো। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ,—নিচে তুমি তা'র স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে তুমি তোমার অগাধ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর। উন্মুক্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে তোমার দানবী ক্রিয়া কর—ক্ষুব্ধ গম্ভীর মন্দ্রে বজ্রধ্বনির উত্তর দাও। রাত্রিকালে ফেনায়িত পিঙ্গল ফণায় বিদ্যুৎকে উপহাস কর। ঝঞ্ঝার অবসানে আবার নির্ম্মল আকাশের মত নীল, স্থির, মৌন, উদার, গম্ভীর! হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে, যাও বীর! চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।

চাণক্যের চিন্তা

চাণক্য।

কি একটা মহান্ পবিত্র উজ্জ্বল রাজ্য ছেড়ে কোথা চলেছি!—এখনও তার আলোকমণ্ডিত শিখর দেখ্‌তে পাচ্ছি। সব অন্ধকার হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে ফিরি না কেন?—পিশাচী! ছেড়ে দে, ফিরে যাই। না—না কোথায় ফিরে যাবো! কে হাত ধরে' নিয়ে যাবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, হত্যা এও ত একটা রাজ্য।—মন্দ কি! বেশ আছি। চমৎকার!—(দীর্ঘ নিশ্বাস) রাত্রি কত?—দেখি।

গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষ প্লাবিত করিল। চাণক্য সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কহিলেন—

"এ আবার কি! এ এতক্ষণ কোথায় ছিল! এত রাশি রাশি সৌন্দর্য—উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে, দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ত বহুদিন দেখি নাই! কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে। আর তার নিম্নে জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চ'লেছে। কি সুন্দর! পতিতপাবনী মা সুরধুনি! ভগীরথ কি পুণ্যবলে তোমাকে—স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্ত্ত্যে টেনে এনেছিল মা! এ মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস একবার উঠিয়ে দে না মা! আমি একবার "মা মা" বলে' তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি! এ কি!—চাণক্য! তুমি অধীর! না। আমি দেখ্‌বো না।"

চন্দ্রগুপ্ত ১৩১৮ (?)

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৩—১৯৪৯

বিগ্রহ

বেনেটোলা মেসের বাসিন্দাদের সে পাড়ায় বিগ্রহ ব'লে খ্যাতি ছিল। মেসটাকে কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্রও বলতেন, যেহেতু সেটা ছিল সমন্বয় মন্দির, আপিস, আদালত, বেকার, ব্রোকার, টেলার, ফেলারের (ফেল্ হওয়া ছেলের) ফেডারেশন্।

তাঁদেরই দ্বাদশটি বিগ্রহ পূজাবকাশে সখের সফরে বেরিয়ে পড়েছেন।

বোধ হয় ওইটাই এখন মায়ের বাৎসরিকের বিনিময়ে ব্যবস্থা। ঠেকেছেন এসে কাশীর গঙ্গার পশ্চিম তীরে, একটি দ্বিতলের হল-ঘরে। বাড়ীটি কোনো বড়লোকের, অধুনা বে-মেরামৎ। গা-ঢেলে কিছুদিনেই কোনো প্রসিদ্ধ স্তূপে দাঁড়িয়ে যাবার আভাসও দিচ্চে—গবেষকদের খোরাক যোগাবার সদিচ্ছা পোষণ করচে। ধর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকই সৎকর্ম্মে। রমেশ গর্ভ-গবেষক, ইতিমধ্যেই তার ভাবী-নামকরণ করেছে অ-সারনাথ, এবং দ্বারেও সেটা কয়লা দিয়ে দেগে দিয়েছে।

অজীর্ণ জীর্ণ মনিন খুব উত্তেজনাপূর্ণ আওয়াজে বলতে বলতে এসে ঢুকলো, "বুঝলে, পশ্চিমের জলহাওয়ায় শরীরটা বেশ বাগিয়ে, মনটা তাজা করে নিতে হবে। ষ্টমাক বেশ প্যাক্ করে খাওয়া চাই। এখন সেরফ্ আনন্দ আর আহার। মেসের মুখে মারো ঝাড়ু। সেই ওলমুখো দেদো দামোদর ঠাকুর বেটার শ্রীবদন কিছুদিন যে আর দর্শন করতে হবে না—এইটাই পরম শান্তি। বেটা নাগাড় নটেশাগের কাঁড়ি গিলিয়ে নাড়ী বরবাদ্ ক'রে দিয়েছে! এখন দেখে নিও—খিদেও যেমন চন্‌চন্ করে বাড়্‌চে, রক্তও তেমন সন্ সন্ বেগ ধর্‌চে। কি বল?"

মনিনের হাতে ছিল একাংশ-ধ্বংস একটা মুড়ো-শশা, অপর হস্তে লবণ। বদন চর্ব্বণ-চঞ্চল।

মুকুল ব্যাকুল বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বললে, "হঠাৎ এটার এত স্ফূর্তি চাগলো কিসে! পেটে তো গাঁদালের ঝোল তলায় না, আজ যে ধামারের বোল শোনায়! আবার শশা পাকড়েছে দেখছি? ফিরবে না, না-কি?"

"নাঃ ও-রকম 'ডিটারমিণ্ড' (মরিয়া) বকাল্ সঙ্গে রাখা একদম সেফ (সুবিধে) নয়,—তা বলচি। ওকে সরাও,—কাল ছ-ছ খানা ডালপুরী আর এক থাবা জ্যান্তো কুষ্মাণ্ড ঘণ্ট মেরেছে। মরবে নিশ্চয়ই। তারপর ভবিষ্যৎ বিভীষিকাটা ভাবো। মণিহারা মণিপিসির ফোঁসফোঁসানির ঠ্যালায় মেস ছাড়তে হবে—দেখে নিও! কিন্তু অমন মেসও আর জুটবে না। বৃহস্পতি একাদশে ভর না করলে অমন স্বঘর মেলে না;—সাত মাসে সাড়ে তিন টাকা—আর তাগাদা-পিছু এক কাপ চা পেয়ে কোন্ বেটা বুদ্ধিমান থাকতে দেবে বল তো!"

'হিয়ার, হিয়ারের' পর অভয় থামলো।

সে-কথায় কান না দিয়ে মনিন তার বাঁ-হাতটা লম্বা ক'রে দিয়ে, ডান

হাতের চেটোটা চিৎ ক'রে ধরলে। বললে, "এটা সোমবার নয়, শনিবারও নয়—তাজা কিউকম্বার আর এই মাতৃভূমিজ পবিত্র লবণ। বুঝলে না? ফ্রুট-সল্ট চালাচ্ছি! তোমাদের Enoর নয়—খোদ মেনোর; আহার ওষুধ দু-ই। কনেকটিকট্ পড়লেই হয় না, কনেক্ট করে মুখস্থ করতে হয়।" (সঙ্গে সঙ্গে শশায় কামড়!)

সকলে ব্রেভো দিয়ে অভয়ের দিকে চাইলে।

বিচিত্রা। ১৩৩৯

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪—১৯১৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ; কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শন মাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমাণা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ

ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এই সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি, দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতিব মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

* * *

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একেবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত

বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন ; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতা-মাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি।* কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থ-বিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি-পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধিসহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপ পড়িয়া ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে ; কিন্তু শিক্ষানবিস বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না ; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু

* Moral courage.

মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্ত বায়ুমার্গে বিহার-প্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল;—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাট্‌পুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্য-জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

রচনাকাল। ১৩০৩

মুক্তি

বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোঽহম্‌—অহং ব্রহ্মাস্মি। ইহা শ্রুতিসম্মত মহাবাক্য। ইহার তাৎপর্য্য লইয়া গণ্ডগোল নিষ্ফল। ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। ইহা বিচারসহ কি না তাহা লইয়া তর্ক তুলিতে পার; এই মত ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত, তাহা লইয়া বিচার করিতে পার; কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিসংবাদের কোন অবকাশ নাই।

বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-বাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা সহস্র স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজীতে যাহাকে Ego বলে বা Self বলে, তাহাই; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্মা; আমা ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা কিছুই নাই। ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—ইহাই জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ। আমা ছাড়া জীব নাই—আমা ছাড়া ব্রহ্ম নাই—আমিই জীব ও আমিই ব্রহ্ম। যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই অমনি কোলাহল উঠিবে। রামানুজ স্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবেন, কেহ ভ্রূকুটি করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জ্জন করিবেন। বলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ; এই সঙ্কীর্ণ সসীম পরিমিত কর্ম্মপাশবদ্ধ, সংসারচক্রে ঘূর্ণমান, জরামরণশীল দুর্ব্বল ক্ষীণ

জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে জগৎকর্তৃত্ব, জগৎবিধাতৃত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা চায়। এই "minute philosopher, not six feet high"—এই ব্যক্তি বিশ্বভুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাহে। হা দগ্ধোঽস্মি !!

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, কে বলিল যে, আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, জরামরণশীল? কে বলিল যে, আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নহি? কেন আমাকে ঐরূপে পরিমিত বিবেচনা করিব? আমি যদি ঐরূপ মনে করি, তাহা আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয় হইলেই বুঝিব, অখিল প্রপঞ্চে স্রষ্টা বিধাতা নিয়ন্তা আমিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল, আমি সুখদুঃখভোগী অল্পশক্তি জীব মাত্র? এই জগৎ যখন আমারই কল্পনা, উহা যখন আমারই প্রত্যয়, এই স্থূল দেহ, এই জন্ম-জরামরণ, এই সুখ দুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা। বস্তুতঃ আমি এ সকল হইতে মুক্ত; নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত মনে করাই অবিদ্যা। এইটুকু জানারই নাম অবিদ্যার ধ্বংস —তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি।

রচনাকাল। ১৩১০

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না; তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই কর্‌তে চাইলেন; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুতুলখেলা কর্‌ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিন্‌ব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ।

ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন,—জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐদিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐদিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। ১৩১১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশে মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ব্বেও অনেক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কি-যেন-কি একটার অভাব ছিল, তাই তাহারা সাহিত্য-সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। 'বঙ্গদর্শন'ই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিক-পত্রের রচনারীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাসিকপত্র দাঁড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মত এই মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না

বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোন কালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল; এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিন্ কালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোন কালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না, কিন্তু কোন-একটা বেশ ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ ও মাসিক পত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল; যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই দিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল; এখন উহার শস্য-সম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক, এই দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিক পত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।

রচনাকাল। ১৩১৩

মন্দিরের সৌন্দর্য্য

প্রথমতঃ—উপাসনা-মন্দির কেবল মন্দির মাত্র নহে; উহা সমুদয় সঙ্ঘের বা communityর প্রতিকৃতি; উহা আবার মানবের জড় দেহেরও প্রতিকৃতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির, দুইটা দিক্ আছে। ভিতরটা শুদ্ধ,—শয়তানের সেখানে প্রবেশ নাই। বাহিরটা অশুদ্ধ; সেটা শয়তানের রাজ্য। Community সম্বন্ধে এ কথা খাটে; মানবদেহ সম্বন্ধেও খাটে। Communityর শরণ লইলে, সঙ্ঘের শরণ লইলে পরিত্রাণ, নতুবা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে যে কেহ দীক্ষিত হইত, তাহাকে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সহিত সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইত। খ্রীষ্টানের পক্ষেও সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণ; বাহিরে শয়তান ও তাহার অনুচরগণ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, ইঁহারা কেহ কাহারও

অনুকরণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাদৃশ্য শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দৃশ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগন্নাথ-মন্দিরের বাহিরের চিত্রগুলির সহিত প্রকৃতি-সাধনা বা লিঙ্গপূজার কোনও সম্পর্ক থাকিলে মন্দিরের ভিতরেও ঐরূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রগুলি এতটা জঘন্য, এতটা বীভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি বেদান্ত বলেন—"ততো ন বিজুগুপ্সতে," সংসার হইতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, জুগুপ্সার কোনও কারণই নাই। বৌদ্ধ বলেন,—সংসার হেয়, ইহা হইতে জুগুপ্সার হেতু আছে। শয়তান বা মার ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিষয়াসক্তি দ্বারা প্রলোভিত করেন। তাঁহার অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টকে ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় সেই ভয়ের দিক্‌টা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধভাবাভিভূত হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মূর্ত্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্ণার পরবর্ত্তী "স্পর্শ" বা বিষয়ভোগ নামে নিদানের চিত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহাকেই ফলাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই অশ্লীল মূর্ত্তিতে পরিণত করা গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এক মূল হইতে, এক কাণ্ড হইতে দুই দিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাত্র, ইহাই আমার বক্তব্য।

আর একটা কথা। যাঁহারা কারুকার্য্যখচিত এত বড় মন্দির গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিতরে আলো প্রবেশের সুব্যবস্থা করেন নাই কেন? রত্নবেদির উপরে যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্গম; অতি সাবধানে সোপান অতিক্রম করিয়া দীপের সাহায্যে দেবতাকে কতকটা দেখা যায়। অন্যান্য দেবমন্দিরের ভিতরও অন্ধকার; নিকটে সাক্ষী কালীঘাটের মন্দির। জগতের অধিকাংশ লোকই বাহিরের দেহটাকেই সার বস্তু বলিয়া জানেন; দেহের ভিতরে যে আত্মা বা ভগবান্ আছেন, তিনি অধিকাংশেরই অলক্ষ্য। উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গুহার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করিয়া যোগীরা তাঁহাকে দেহের মধ্যে হৃৎপুণ্ডরীকে বা শিরস্থিত সহস্রদল কমলে কিংবা আরও নিগূঢ় প্রদেশে দেখিতে পান। জ্ঞানের বা ভক্তির প্রদীপ না জ্বালিলে তাঁহার দেখা

পাওয়া যাইবে না। অথবা তিনি কৃপা করিয়া হয়ত আপনার অনুগৃহীতকে দেখা দেন। বস্তুতঃ এ রকম প্রসিদ্ধি আছে যে, লক্ষ যাত্রীর মধ্যে দু-এক জন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান। সাহেবদের বর্ণিত hideous মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। সুন্দর মদনমোহন-মূর্ত্তি তাঁহারা দেখেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদির নিকটে যাইতেন না; বেদি হইতে অনেক দূরে একটি ছোট পাষাণস্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বেদ পুলক কম্পন ও মূর্চ্ছা হইত। ইতর সাধারণ লোকে কিন্তু সে স্থান হইতে দেবতাকে দেখিতে পায় না বলিলেই হয়। আমাদের মত লোকের এই জন্যই জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া বৃথা। ভক্তির চক্ষু বা জ্ঞানের চক্ষু জগতে বড় দুর্লভ সামগ্রী। অন্ততঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চক্ষু না লইয়া গেলে জগন্নাথের মহিমা কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যে কথাগুলি বলিলাম, তাহাতে সেই বিজ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে যদি কিছু মাত্র সাহায্য হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।

বিচিত্র প্রসঙ্গ। ১৩১৪

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬—১৯৩৯

সীতা

রাম কৈকেয়ীর নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বিদ্ধিমামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাশ্রিতম্।"

তিনি বনবাসাজ্ঞা অবিকৃত মুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে শান্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ" করিয়া যে দুঃখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি পরিশ্রান্ত হস্তীর ন্যায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন,—"নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।" মাতার নিকট মর্ম্মচ্ছেদী সংবাদ বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ শঙ্কান্বিত ও কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার কথার সূচনা পরিতাপব্যঞ্জক—

"দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।"

মাতার অশ্রু ও শোকের উচ্ছ্বাস তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিতেছিলেন; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাঁহার কথাগুলিতে এক অপূর্ব্ব নৈতিক-মহিমা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানুরক্তা স্ত্রীকে সত্যো-যৌবনের অতৃপ্তকামনায় দারুণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন, একথা বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সীতা অভিষেক-সম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন,অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় নিদারুণ সংবাদে কুসুম-কোমলা রমণীর প্রাণকে কিরূপে চকিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, এই ভাবিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। "অদ্য শতশলাকাযুক্ত জলফেনশুভ্র রাজচ্ছত্র তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষণ্ণ, কি ভাবনায় তুমি ক্লিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কোথায় রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌম্য প্রশান্ত ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন্ন পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন; তিনি বনে গেলে সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে নানা-নৈতিক উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা—সীতা সে সকল কথা উপহাস করিয়া বলিলেন, "তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে পদচারণ করিয়া আমি বনে যাইব।" যাঁহারা রামের বনগমনের কথা শুনিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা একটিও আক্ষেপের কথা বলিলেন না, একবার দশরথকে স্ত্রৈণ বলিলেন না, কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন না, এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবল্কল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন না। পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুপুষ্পিত পদ্মিনীসঙ্কুল সরোবর,

ফেননির্ম্মলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনান্তলীন শৈলখণ্ড, এই সকল দেখিয়া স্বামীর পার্শ্বে স্বামীসোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে গিরিনির্ঝর দেখিয়া ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই আনন্দের উৎসাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। "এই সুরম্য অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে প্রিয়তম স্বামীর পাদছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য।" সীতা দৃঢ়ভাবে ইহাই বলিলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, এই আনন্দ শুধু অনভিজ্ঞতার ফল, সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়া বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। কিন্তু যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের কল্পনা মনে করিয়াছিলেন—তাহা সাধ্বীর অটল পণ! রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাঁহাকে সহস্র প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। সীতা কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা তীর্থোন্মুখী রমণীর বৃথা ঔৎসুক্য নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধ্বী থাকিতে পারিবেন না—এই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের ভীষণতার এক একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; কৃষ্ণ সর্প, বনতরুর কণ্টকপূর্ণ জটিল শাখাগ্র, ফলমুল-জীবিকা এবং অনশন, পঙ্কিল সরোবর, ব্যাঘ্র, সিংহ ও রাক্ষসগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। সীতা ঘৃণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শয্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ",—

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতান্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি।"

"দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যব্রতের অনুব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে জানিও" এবং পরে বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে পর্য্যটন করিব। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারাই প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব?" রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াসী হইলেন। সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন—"নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?" ইহা হইতেও তিনি অধিকতর কটূক্তি রামকে বলিয়াছিলেন:—

"শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।"

স্ত্রীজনসুলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্থানে দৃষ্ট হয়—"তোমার

সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার সকল জ্বালা দূর হইবে ; পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তুলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব।” এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমসূচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; তাঁহার পদ্মদলের ন্যায় দুইটি চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন হইল ; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া ব্রততীর ন্যায় রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া বিমনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সাধ্বীর এই অশ্রুতপূর্ব্ব দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।”

এবং তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, “তোমার ধনরত্ন যাহা কিছু আছে,—তাহা বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হও।” রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অদৃশ্য ও মৌন যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে ; কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হার, কেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিতেছেন, তাহা দেখিবার যোগ্য ! বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের পত্নীকে তিনি হেমসূত্র, কাঞ্চী ও নানা মহার্ঘ দ্রব্য প্রদান করিলেন। সখীগণকে স্বীয় পর্য্যঙ্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নানা অলঙ্কার প্রদান করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরাভরণা সুন্দরী বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে জটাবল্কল পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈকেয়ী তাঁহার হস্তে একখানি চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও।” সুমন্ত্র যেদিন রথ লইয়া গঙ্গাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেদিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন—“অযোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার দিবার আছে ?” সীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই ; দুইটি চক্ষু হইতে তাঁহার অজস্র জলবিন্দু পতিত হইয়াছিল। এই সকল অবস্থায় সীতার মূর্ত্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্তু এই বিনয়নম্রা মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রখর তেজ ও দৃঢ়সঙ্কল্প বিদ্যমান, তাহার পূর্ব্বাভাস ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি।

তারপর রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি রাজান্তঃপুরীর অবরোধে সযত্নে রক্ষিতা, যাঁহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ূর নৃত্য করিত ও হেমপর্য্যঙ্কে সুকোমলচর্ম্মাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাঁহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপরাশি নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিত,

আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী; পদব্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতেছেন, পদ্মপ্রসূনের মত পদযুগ্ম,—তাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, সেই পদযুগ্ম লীলানূপুরশব্দে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়া চলিতেছে, চিত্রকূটের প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া সীতা শ্বাপদসঙ্কুল গহনে আসন্ন কৃষ্ণা রজনীর ভয়াবহ রূপের আভাস পাইয়া ভীতা হইলেন। রামের বাহু-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইঙ্গুদীমূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর সুন্দর বর্ণ আতপতাপক্লিষ্ট ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষণ্ণতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় না,—প্রভাতে চিত্রকূটের শৃঙ্গে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়া রামচন্দ্র সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন—সীতা সেই আদরে ও সোহাগে পুনরায় প্রফুল্লা হইয়া উঠিলেন; পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী সলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাঁহার নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃদুমনোরম বোধ হইতে লাগিল,—তিনি স্বামীর পার্শ্বে স্বভাবের রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার সুখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বনদেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন; কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়া সাধ্বী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অহেতুক-বৈর ত্যাগ কর; তুমি পরিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছ, এখানে রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্ত্তে, আমার এই আশঙ্কা।—

"কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবানাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বমযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্ম্মং চরিষ্যসি॥"

অস্ত্র-চর্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিও।

কখনও ঋষিকন্যা অনসূয়ার নিকট বসিয়া সীতা কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা থাকিতেন, কখনও গদগদনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে ন্যস্তমস্তক মৃগয়াশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখে ব্যজন করিতেন, কখন সুকেশী তাঁহার কর্ণান্তলম্বিত চূর্ণকুন্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাজাইয়া দিতেন,—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বনলক্ষ্মীর বেশে এইভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুতীক্ষ্ণঋষির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিলেন। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে—তুষারমিশ্র জ্যোৎস্না ও মৃদু সূর্য্য নিষ্পত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। বিরাধ রাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের নিম্নপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীব্র বন্যপিপ্পলীর গন্ধে বন্যবায়ু আকুলিত হইতেছিল; শালিধান্য সকলের খর্জ্জুরপুষ্পগুচ্ছতুল্য পক্বতণ্ডুল-শীর্ষসমূহ আনম্র হইয়া স্বর্ণবর্ণে শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্তা মৈথিলী নদীপুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রান্তরে ও কাশকুসুমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুষ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন বা তাপসকুমারীগণের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "আমার স্বামী পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।" ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিতে তাঁহার কণ্ঠ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন ঋষির আশ্রম ছিল না। এই স্থানে শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদূষণাদি চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত হইল। দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব মনুষ্যভয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের নিকট বলিয়াছিল,—"ভয়প্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে স্থানেই পলাইয়া যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্মুখে ধনুষ্পাণি রামের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পায়।" মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল—"বৃক্ষের পত্রে পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্ত্তি দেখিতে পাই।" স্বীয় অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্ত্তে সীতাহরণোদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; সেই আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হইলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষ্মণের মৌন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প কোন গূঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে "কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ" এই আর্ত্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উন্মত্তা মৈথিলী লক্ষ্মণকে "প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দূত, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী" প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন। "আমি রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে

প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।” এই সকল দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ একবার ঊর্দ্ধ-দিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন এবং রোষস্ফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তখন কাষায়বস্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী ও উপানহী পরিব্রাজক “ব্রহ্ম” নাম কীর্ত্তন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা কহিল, তাহা ঠিক ঋষিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি সীতা অতর্কিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাঁহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।”

রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল —“আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকূটশীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ-শত সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের ‘অগ্রমহিষী’ রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাজা মন্দবীর্য্য জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকূটশীর্ষস্থিতা বনমালিনী লঙ্কার সুপুষ্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” সীতাকে আমরা তাপসপত্নীগণের নিকট একটি সুকুমারী ব্রততীর ন্যায় দেখিয়াছি। তাঁহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা সীতার বনবাস সঙ্কল্পে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইল। রাবণ অমিততেজা মহাবীর—তাহার ভয়ে পঞ্চবটির তরুপত্র নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে, পার্শ্বে গোদাবরীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যও যেন রাবণের ভয়ে দিগ্বলয়ের প্রান্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অসুর যখন পরিব্রাজক-বেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ও শক্তির গর্ব্ব করিতে লাগিল,—তখন সীতা লুক্রেশিয়ার ন্যায় কিংবা ছিন্নলতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন না। যিনি লতিকার ন্যায় কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়া যিনি সাশ্রুনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যিনি মৃদুভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে

অমৃতনিষেক করিতেন, সেই তন্বঙ্গী পুষ্পালঙ্কার-শোভিনী সীতা সহসা বিদ্যুল্লতার ন্যায় তেজস্বিনী হইয়া উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন। কে তাঁহার ফুল্লকুসুমকোমলরূপে এই বিজয়শ্রী, এই তেজ প্রদান করিল? কে তাঁহার ভাষায় এই ক্রুদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বালাময় কথা বিচ্ছুরিত করিয়া দিল?—"আমার স্বামী মহাগিরির ন্যায় অটল, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপূজ্য-চরিত্রশালী, জগদ্ভীতিদায়ক-তেজোদৃপ্ত, আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথুকীর্ত্তি; রাক্ষস, তুমি বস্ত্রদ্বারা অগ্নি আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাস-পর্ব্বত হস্তদ্বারা উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে প্রভেদ, রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু।" বক্র কেশকলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া, ফুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্নমিত করিয়া সীতা যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন, তখন আমরা সীতার জলন্ত অগ্নিশিখাবৎ মূর্ত্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অগ্নিচ্ছায়ায় স্বামীর পার্শ্বে বনফুল সুন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভস্মীভূত করিতে পারে নাই, ভারতের প্রত্যেক গ্রাম—প্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যপ্রবাহে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, মরণে যে গরিমা সীমন্তে উদ্ভাসিত করিয়া হিন্দুরমণীর সিন্দুরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে—আজ জীবনে সীতার সেই চিরনমস্য সতীমূর্ত্তি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রচনাকাল। ১৯০৪

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৬—১৯২৩

বঙ্গের ভাস্কর্য্য

বহু দিন—বহু দিন পরে, প্রায় সহস্র বৎসর পরে আবার দেখিলাম, নয়নময় হইয়া, বাঙ্গালার অতীত কীর্ত্তির চিতাচুল্লী হইতে সমাহৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পরিদর্শনের ন্যায়, আবার দেখিলাম!

পুরাণে পাঠ করিয়াছি যে, ব্রজবল্লভবল্লভীগণ সহস্র বৎসর বিরহব্যথা ভোগ করিয়া, প্রভাসতীর্থে আবার কৃষ্ণসন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সে মিলন অপূর্ব্ব; মনুষ্যের রচিত কাব্যগাথায় বুঝি বা যেমন মিলনবার্ত্তা আর কেহ লেখে নাই। তাহাতে শোক আছে, ক্ষোভ আছে, আর আছে, যুগে যুগে সঞ্চিত, বিরহনির্ম্মলীকৃত মিলন-আকাঙ্ক্ষার তটিনীতরঙ্গকল্লোল।

ইতিহাস পাঠে বুঝিয়াছিলাম যে, ছিল এক দিন, যে দিন বাঙ্গালী মানুষের মতন মানুষ ছিল; ছিল এক দিন, যে দিন বাঙ্গালার প্রতিভা ও মনীষা জগজ্জ্যোতিঃরূপে আর্য্যাবর্ত্তকে সমালোকিত করিয়া রাখিয়াছিল; বাঙ্গালার প্রদীপ ভারতের সন্ধ্যাপ্রদীপতুল্য কালতটিনী কালিন্দীর কূলে টিপি টিপি জ্বলিতেছিল। হায়! সে প্রদীপদ্যুতিও নির্ব্বাপিত হইয়া বিস্মৃতির পুঞ্জীকৃত তমিস্রায় ভারত-প্রাঙ্গণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যে মানুষের বংশধর, তাহাও ভুলিয়াছিলাম; আমরা যে জাতির বনিয়াদ, তাহাও জানিতাম না; আমরা যে বিদ্যার ও চতুঃষষ্টি কলার মঞ্জুষাধারী, তাহাও ভুলিয়াছিলাম। সব ভুলিয়া, কীট পতঙ্গের দলে মিশিয়া, মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া দেহভার বহন করিতেছিলাম।

রামপুর বোয়ালিয়ার প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। সহস্রবর্ষব্যাপী গুরু বিরহের স্থবিরতা দূর হইয়াছে। দেখিয়াছি, বরেন্দ্রের ব্রজমণ্ডলে বঙ্গীয় মানবতা স্থলকমলগুঞ্জন অপূর্ব্ব বিভায় কেমন বিকসিত হইয়াছিল; বুঝিয়াছি, যাহাদের চিতাচুল্লী হইতে এমন অর্দ্ধদগ্ধ চন্দনকাষ্ঠ সমাহরণ করা যায়, তাহাদের বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কেমন অরুণ-কিরণে শত ময়ূখ-মালায় প্রাচীগগনোপান্তকে সমুদ্ভাসিত করিতে পারে; জানিয়াছি, মাতা ধরিত্রী সহস্র বৎসরকাল যে চিতাভস্মরাশি কুক্ষিগত করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, তাহা ভস্ম নহে, বাঙ্গালার বিভূতি; সেই বিভূতিভূষণকে অঙ্গরাগ করিতে পারিলে আবার বাঙ্গালী শবসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি-বিন্যস্ত প্রদর্শনী বাঙ্গালার প্রভাসক্ষেত্র; অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গম, অনাগতের দ্যোতক। গতঘনা যামিনীর চন্দ্রিকাদীপ্তি যেমন নিরাবিল, অপসারিত বিস্মৃতি কুজ্ঝটিকায় আত্মানুভূতির দ্যুতিও তেমনিই নিরাবিল। নিশাবসান হয় নাই বটে, পরন্তু মুদিতার হ্লাদিনী লোহিতাভা চক্রবালকে রক্তিমরঞ্জিত করিয়াছে; একনিষ্ঠার শুক্রতারা স্যমন্তকের ন্যায় আকাশের নীল

বক্ষে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ শুন, আশা-পিক পঞ্চম তানে জাগরণের গান ধরিয়াছে।

দেখিয়াছি, শুনিয়াছি,—বুঝিবা কচিৎ বা কদাচিৎ অতীতের অশরীরিণী বাণীর মর্ম্মানুভব করিয়াছি—প্রভাসে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভয়বার্ত্তা, মিলন সমাচার কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছি। সে কথা শুনাইবার জন্য, সহস্রবর্ষব্যাপী গুরু বিরহের অপূর্ব্ব মিলনের আলেখ্য দেখাইবার জন্য প্রাণে কাতরতা জন্মিয়াছে। এক বার শুন, একবার দেখ,—বাঙ্গালী যেমন ভাবে শুনিলে সব শুনিতে পায়, বাঙ্গালী যে নয়নে দেখিলে সব দেখিতে পায়, তেমনই শ্রবণময় নয়নময় হইয়া আমার ভাববিহ্বল অস্ফুট ভাষা ও আমার আশাসুখকম্পিত-লেখনী-লিখিত আলেখ্য শুন ও দেখ; আমার বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক হউক।

সাহিত্য। ১৩১৯

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন বাঙ্গালার ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গীতে বঙ্গদেশে জাতিবৈরের প্রাধান্য যে নূতন ভাবের প্লাবন-তরঙ্গ আনিয়াছিল, যাহার প্রেরণায় এক দিকে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব, অন্য দিকে ভাষার ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল; সেই প্লাবন প্রবাহ অতিবিস্তৃতি হেতু স্থির স্থবির ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বেগ ছিল না; তরঙ্গভঙ্গমহিমা ছিল না; বিরোধ বা বাধা জন্য জলোচ্ছ্বাস—ভাবোচ্ছ্বাসও ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজ শ্রান্ত, ক্লান্ত, ত্রিধা বিভক্ত; বঙ্কিমচন্দ্র মুমূর্ষু, তাঁহার সাহিত্যচেষ্টা ধর্ম্মের প্রণালীতে পড়িয়া একটু জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিল, নব হিন্দুত্বের জলপ্রপাতবিলাসের বালুকায় পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছিল,—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মনীষা যেন নিশ্চল অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নব হিন্দু কেবল আর্য্যামির আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন; এবং রাজনীতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামি'র প্রভাব চারি দিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের

humour বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানি করিয়া, দেশীয় শ্লেষের একটু মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব, সে গানের সুর ও গীতিপদ্ধতিও তেমনই বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গায়িতে তিনি স্বয়ং তেমনই অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলার, সকল সমাজে তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গায়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন, উপাদেয়, অম্লমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। কথায় আছে—"হাসিতে হাসিতে বালা কাঁদিয়া আকুল"—দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বহু ভাবুক বাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কেন না, এই হাসির অন্তরালে, ব্যঙ্গ শ্লেষের অবগুণ্ঠনের ভিতরে আত্মদৃষ্টির সকরুণ অনুরোধ ছিল—সে কারুণ্যপূর্ণ আহ্বানের ক্ষীণ ধ্বনি যাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিয়াছে, তাঁহাকেই কাঁদিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচিত হাসির গানের সাহায্যে বাঙ্গালীকে হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্য হিন্দু তাঁহার ব্যঙ্গে নিজের দিকে তাকাইয়াছিল। বিলাতফেরতা বাঙ্গালী সাহেব তাঁহার শ্লেষের কশাঘাতে দেশের মুকুরে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; রাজনীতিক দেশহিতৈষী তাঁহার বিদ্রূপবাণে অধীর হইয়া বিদেশের আদর্শ প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন—'ন্যাকামি'র সঙ্কোচ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য। ১৩২০

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮—১৯৪৬

জয়দেব

জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয়নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন; প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গাররসকে কবিতার বর্ণিত বিষয়স্বরূপ স্থির করিয়াছেন; সেজন্য আমরা কখনো তাঁহাকে কালিদাসাদি

কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমি আপাততঃ জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি।

জয়দেবের কবিতাসকল প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহমিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ; সুতরাং তাঁহার বর্ণনাবিষয়ে কৃতকার্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন—প্রথম, স্পষ্ট এবং সহজভাবে; দ্বিতীয়, বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ কবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ণনার পরিপাট্য ও সৌন্দর্য উপমাদি অলংকার-সকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোনো-একটি পদার্থ কিংবা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য-একটি কি জিনিসে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সাদৃশ্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি।

উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয়ঃ ১. ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়, ২. ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোনো দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অলক্ষিত কোনোরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতায় যেসকল উপমা ব্যবহৃত হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো-একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি, এবং কেবলমাত্র উপমার যাথার্থ্য দ্বারা মনের তুষ্টিসাধন, সুতরাং জয়দেবের বর্ণনার যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলংকার প্রয়োগের শক্তিসাপেক্ষ।

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বিরহীবিরহিণী-দিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভালো লাগিবার কথা তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য-কোনো অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত-কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

তার পর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমত আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাত পড়ে-পাওয়া-গোছের। জয়দেবের পূর্বে সেইসকল উপমা শত সহস্রবার সংস্কৃতকবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্যজগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্যজগতে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করার প্রথাটা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে এবং কোনো কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে উপার্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে কিছু-একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাত পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটুকাটব্যও ব্যবহার করি; কিন্তু যদি তাহার একটুমাত্রও রূপের পরিবর্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু-আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড় মন্দ সাফাই নহে; আবার অনেক স্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটি রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি, খুব যে খুশি হই তাহা নহে। যে কথা হাজারবার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভালো লাগে। আমার তো পদ্মের মত ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশিক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয়, কারণ ওসব পুরানো কথায় মনে কোনো নির্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসে না। শুনিবামাত্রই মনে হয় ওসব তো অনেকদিনই শুনিয়াছি, আবার অনর্থক ওকথা কেন? ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।

রচনাকাল। ১২৯৭

পত্র

আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে না আমল দেওয়া। অর্থাৎ সচরাচর enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে যাতে না মেলে তার জন্য আমার একটু চেষ্টা আছে কারণ তার ভিতর একটু distinction আছে। বাস্তবিক বুদ্ধির দ্বারা যাচিয়ে নিতে গেলে আর পাঁচ বিষয়ের সত্যের মত বৈজ্ঞানিক সত্যও টেঁকে না। একটু বেশি দূর পর্যন্ত যুক্তি নিয়ে

গেলে দেখা যায় যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্যেরই গোড়ায় গলদ—বড় বড় সব থিয়োরি শুধু হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে।—অনেক জিনিস যা আমরা প্রমাণ-প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মনে করি, তার ভিত্তিতে সব অপ্রামাণ্য জিনিস—অর্থাৎ—আগে একটা ধরে নিয়ে, বিনা যুক্তিতে মেনে নিয়ে তার উপর আমাদের scientific process প্রয়োগ করে scientific philosophy বলে অদ্ভুত জিনিস বার করি। যাতে করে যত ফিলিস্টাইন মহা আনন্দ লাভ করে। Criticism-এর সুমুখে ধর্মের dogmaও দাঁড়ায় না, বিজ্ঞানের dogmaও দাঁড়ায় না। আসল কথা হচ্ছে, যে-সকল কথা প্রমাণের উপর নির্ভর করে তা আমাদের বিশ্বাস করবার দরকার নেই। যা একজন যুক্তির উপর দাঁড় করায় তা আর একজনে যুক্তির দ্বারা ভূমিসাৎ করে। আর বিজ্ঞানে যা বলে তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, তোমার আমার কি এসে যায় বলো। পৃথিবী কমলালেবুর মত দেখতে বলেই যে আমার কাছে বড় রসালো ও মিষ্টি লাগছে তাও না, আর তিনকোণা হলেই যে আমার বড় বয়ে যেত তাও নয়। কি বল?—যেসব কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করি এবং যার কোনো প্রমাণ হতে পারে না, শুধু গায়ের জোরে বিশ্বাস করতে হয়, আমি সেই সব কথাই বিশ্বাস করতে ভালবাসি, কারণ তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কারও সঙ্গে মিছে তর্ক করতে হয় না। আমি যদি দু'শ বৎসর পূর্বে জন্মাতুম, যখন অধিকাংশ লোকের শুভাশুভ লক্ষণে আস্থা ছিল, তা হলে ওকথা (পার্শিবাগানের কথা) হেসেই উড়িয়ে দিতুম। আজকাল অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে না বলে আমি বিশ্বাস করি। খুব ভাল কারণ নয়?

ন-বাবুর কাছে শুনেছি যে পার্শিবাগানে বহুতর প্রেতাত্মা বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছে। ন-বাবুর পিতা বাড়িটি কিনে অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছিলেন। তাঁকে ঐ বাড়ির গুণে ক্রমে theosophist বা spiritualist হতে হয়েছিল। কালিকৃষ্ণবাবু না জেনেশুনে বাড়ি কিনে ঠকেছেন। তাঁর মেয়ে জামাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁদের নতুন বাড়িতে গিয়েই একটি ছেলে মারা যায়। তারপর কালিকৃষ্ণবাবু বাড়িটি হাত থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেন—কিন্তু ন-বাবু ছাড়া আর খরিদ্দার পেলেন না।...ন-বাবু (আজকাল সঙ্গীত সভার বাল্মীকি) বলেন তিনি ছাড়া ও-বাড়িতে আর কেউ থাকতে পারবে না, কারণ যাঁরা সব আগাগোড়া সাদা

কাপড় পরে রাত্তিরে গাছের তলায় কিম্বা ডগায় দাঁড়িয়ে থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে কেবলই ওঠেন ও নামেন, ছাতের উপর ত্বপুর রাতে ফুটবল খেলেন, দোর জানালায় নাড়া দেন, ঘরের অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হাসেন তাঁদের সকলেরই সঙ্গে তাঁর অনেক দিনকার পরিচয়, বন্ধু বললেই হয়, আর তা ছাড়া নিজের ত্ব'একটি নিকট আত্মীয়ও এখন সেই দলভুক্ত হয়েছেন। সেই জন্মে ন-বাবু পার্শিবাগানে বেশ আপনার লোকের মধ্যেই থাকতে পারেন। বাইরের লোকদের এই প্রেতাত্মার দল বড় জালায়।

রচনাকাল। ১৮৯৮

পত্র

তোমার কি মনে হয় না যে ভালবাসাও আমরা কষ্টের ভিতরই বেশ ভাল করে অনুভব করি, স্পষ্ট চিনতে শিখি। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে আত্মার তিনটি অবস্থা আছে,—জাগ্রত, সুষুপ্ত ও নিদ্রিত। সুখ জিনিসটা সুষুপ্তির ধর্ম। আমরা কথায় কথায় বলি—সুখের আবেশ, সুখের মোহ। কাউকে কখনো কোনো কালে কোনো দেশে "ত্বঃখের মোহ" বলতে শুনেছ? কষ্ট জিনিসটার মত আত্মাকে সজাগ সচেতন করে তুলতে আর কিসে পারে? আমি যে সব কথা বলছি তা থেকে অনুমান করে নিয়ো না যে এখন আমার মনের ভিতর একটা কিছু বড় রকমের ব্যথা জেগে আছে। আমার জন্ম একটু কষ্ট করে একটি কাজ করবে? আমাকে Le Gallienne এর তরজমা Omar Khayyam খানি পাঠিয়ে দেবে? আমার বিশ্বাস তোমাদের সে বইখানা আছে। এখানে আমি পড়াশুনা কিছুই করিনে। বইয়ে মন বসে না। তবে মধ্যে মধ্যে এক একবার একখানা বই টেনে নিয়ে ত্ব'এক পাতা পড়তে সাধ যায়। এ বাড়িতে কেতাব কোরানের নাম গন্ধও নেই। দী-র বই সব কলকাতায় পড়ে আছে। থাকবার মধ্যে হাতের গোড়ায় একখানা Shelley আছে। আমি থেকে থেকেই বইখানা খুলে তুটি একটি কবিতার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাই, কিন্তু মনের সুখে পড়া হয় না। Shelley আমি এখন সইতে পারছি নে। আমি যা চোখের আড়াল করে রাখতে চাই—মনের অসহ্য আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্তি—Shelleyর প্রতি পাতায় প্রতি ছত্রে তাই। এক একটি কথা হৃদয়ে ছুরির মত বেঁধে, জলন্ত অঙ্গারের মত গায়ে

এসে পড়ে। Omar Khayyam আমার ভাল লাগবে, কেননা—ভাল মনে পড়ছে না কেন, কিন্তু আমি জানি ভাল লাগবে। বুঝলে?

রচনাকাল। ১৮৯৮

রূপের কথা

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধন-সূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্রাক্‌টেড হয়ে আসে তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা পুরো বুঝুক আর না-বুঝুক; সে তিনটি হচ্ছে সত্য শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে সে সুন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবতঃ যে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর—অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দুর্নীতির কথা। বিষয়বুদ্ধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দরের উপর এ দেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এ দেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতি-অপরটির শত্রু, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ দেশে একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি। আমার বিশ্বাস সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি

ফলাফল হবে সে কথা উপেক্ষা ক'রে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য—তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা ক'রে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা। ও-জ্ঞান বিষয়বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।

তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্মজ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়; এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।

সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

রচনাকাল। ১৩২৩

বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়তটি আজ সুদশুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতসহর কন্‌গ্রেসের পিঠ-পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি; কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আন যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালির পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সেসকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাংলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রত্যাশা কর। আমি যে ইংরেজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোনো দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কন্‌গ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ওসকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনোরূপ ভালবাসার কৈফিয়ত চাওয়াও যেমন অন্যায় দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

রচনাকাল। ১৯২৭

পথের অভিজ্ঞতা

আমি সকাল ছ'টায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য স্টেসনে পাল্কি-বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারিনে। কেননা, চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তার পর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্ম্মসার মানুষ, অন্য কোনও দেশে বোধ হয় হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরই পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাতপায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র

অঙ্গ—উদর—অস্বাভাবিকরকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও অনুমানে বুঝলুম যে, তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃৎ পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের "যকৃচ্চ ক্লোমনাশ্চ পর্ব্বতা"। পীলে ও যকৃৎ নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসঙ্গত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন, শক্তিহীন হ'তে পারে, তার চক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই সব দেহ আশ্রয় করেই টিঁকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু—শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা, শীকার এদের জাত ব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শূয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে বাঘ বার করে; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা—আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।

এ সব ক্লেশের জীবদের কাঁধে চড়ে' বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল। মনে হ'ল, এই সব জীর্ণ-শীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে, বাড়ী থেকে যে মুসলমান সর্দ্দারটি এসেছিল, সে হেসে বললে—

"হুজুর উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছতে পারবেন না।"

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা' বলে' হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেননা, তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা ধনী লোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত, এই ত 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে সুরু করল।

সর্দ্দারজী আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনই কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে 'দিলাশা' মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। কেন না, হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্ব্বে কখনও এতটা ব্যতিব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক, একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙ্গে বীরাসন ত্যাগ ক'রে পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস, এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একাসনে বহুক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারতেন না, কেননা, পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মত, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্ব্বে কখনও পাই নি; কিন্তু অভ্যাসদোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়ি নি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম তখনও হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, নিজ দেহের এই সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে, পূর্ব্বদিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন-মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারিদিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই, দোর নেই, গাছ নেই, পালা নেই, শুধু মাঠ—অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মত বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলিকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝরে' গিয়ে সে মন ঐ আকাশের

মত নির্ব্বিকার ও প্রসন্ন রূপ ধারণ করলে,—তার মধ্যে যা ছিল, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, কেননা, দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মত বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ-বাতাসের উত্তাপ, দেখতে দেখতে একশত' পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে' গেল। যখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না; আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অন্বেষণ ক'রে এখানে ওখানে দুটি একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটল না, কেন না, এ গাছের আর যে গুণই থাক, এর গায়ে শ্যামল-শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন, পত্রহীন, ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্ত্তি ফুটে উঠল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হ'ল না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredith-এর Egoist এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকী ছিল। একটানা দু'চার পাতা পড়ে' দেখি, তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে,—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। বুঝলুম, পাল্কির অবিশ্রাম ঝাকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ ক'রে পাল্কি বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেই সঙ্গে বকশিসের লোভ দেখালুম। এতে ফল হ'ল। অর্দ্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা সমান উঁচু পাড়ের উপর খান দশবারো খড়োঘর, আর এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে, ভিজে কাপড়েই চিঁড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসল। পাল্কি দেখে গ্রাম-বধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেননা, এদের আর যাই থাক,— রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি বা কারও রূপ থাকে ত' তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি বা কারও যৌবন থাকে ত' তা মলিন বসনে চাপা

পড়েছে। এদের পরনের কাপড় এত ময়লা যে, তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রূপোর গহনা। এক যোড়া চুড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন একালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য্য না থাক সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারি নে,—বেহারা-গুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হ্যায়" "রামনাম সৎ হ্যায়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হ'ল যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভুতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে! এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনও প্রভাব ছিল কি না জানি নে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হ'ল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যেরকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশযোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জ্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হ'ল, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তার পর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হ'লে দেখলুম যে, সম্মুখে যা প'ড়ে আছে, তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়ামাটির,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্য্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি, শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা তা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে দেখলে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা

আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ ; কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু' একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ, মাটি, আকাশের সর্ব্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা, আমারই গা ছম্-ছম্ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু, এত করুণ, এত কাতর, যে, মনে হ'ল, সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভ'রে গেল, আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলোভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তার পর দেখি, সেই অগ্নিপ্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছট্‌ফট্ করছে। এই ব্যাপার দেখে ঊনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চীৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হ'ল,—সে হাসির নির্ম্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু, করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হ'ল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে,—সে স্মৃতি ইহজন্মের, কি পূর্ব্বজন্মের, তা আমি বলতে পারি নে।

আহুতি। ১৯২৯

বাংলা ভাষার কথা

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলাভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে তা অসংখ্য ইংরেজি শব্দ শুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে সে তো ধরা কথা। এতে বাংলা তো তার স্বধর্মই পালন করে চলেছে। তবে

আমাদের ভাষার পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে আজ কেন আপত্তি উঠেছে ? এর একটি কারণ, পূর্বে বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে ; অপর পক্ষে আজ তার এই চুরি-বিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাংলা মুসলমানদের কাছ থেকে কর্মের ভাষা নিয়েছিল, পোর্তুগিজ-ফরাসিদের কাছ থেকে নিয়েছিল শুধু জিনিসের নাম, আর আজ আমরা ইংরেজি থেকে ও দুই জাতীয় কথা তো নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি। প্রথম দুইটির ব্যবহার হচ্ছে লৌকিক, আর শেষটির সাহিত্যিক ; লৌকিক কথার চুরিকে চুরি বলে ধরা যায় না, কেননা তার ভিতর অসংখ্য লোকের হাত আছে, ও হচ্ছে সামাজিক আত্মার কাজ, ওর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না। অপর পক্ষে সাহিত্যিক চৌর্য ব্যক্তিবিশেষের কাজ, অতএব সেটা ধরাও যায়, ও সে কথা-চোরকে শাসন করাও যায়।

রচনাকাল। ১৩২৯

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র। মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরাণী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানব-মনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমার-সম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এসব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ ক'রে এই কল্পলোক রচনা করে ; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গ-লোক অর্থাৎ সর্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কথা, আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি ? সে জগৎও তো মানুষের

মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ যথার্থ এই যে, এ দুটি মানবমনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতদৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subject-এরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্চে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে বা আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন শুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয় বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয় বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

রচনাকাল। ১৩৩৪

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক, জীবন নয়—মন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এ রসের নাম আছে। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্চে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল

হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যেসব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক মহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এ হেন ইয়ারকি কোন্ সমাজের সুরীতি? আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জ্যাঠামি? তাঁর নারীগণের পতিনিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ তো ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা এষো ধর্ম সনাতনঃ। এস্থলে পুরুষজাতির কিং কর্তব্য? হাসা না কাঁদা? বোধ হয় কাঁদা। নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি! আমি উক্ত জাতীয় স্বামী-দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না, জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র, অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা, নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটি মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরেজিশিক্ষিত-সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে, উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য? ভারতসমালোচনার যে ক'টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একান্ত বঞ্চিত। আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর-একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে

এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালি জাতির জন্ম তারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

সর্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন—

সেই আজ্ঞা অনুসরি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন।

রচনাকাল। ১৩৩৫

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৮—১৯২৯

হুকা-কলিকা বনাম চুরট সিগ্‌রেট

এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া প্রথম একবার টানিবার পর আবার যতবার হাত ঘুরিয়া আসে, ততই তাহা বেশী মজে। সেই হিসাবে, তামাকুতত্ত্বের যতই অধিক বার আলোচনা করা যাইবে ততই তাহা মিষ্ট লাগিবে। তজ্জন্য বক্তব্য শেষ করিয়াও আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিশেষতঃ এখনকার যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই কথাটির অবতারণা না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে।

আজকাল দেখিতেছি, হুকা-কলিকার বদলে চুরট সিগ্‌রেট বিড়ি বার্ডসাইএর বেশী বেশী চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখন হুকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগ্‌রেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তি-তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

সৌখীন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান্ নটখঠি; তামাক-টিকা চাই, হুকা-কলিকা চাই; তামাক হয়ত ভ্যালসা, টিকা হয়ত ভিজা, খোল দিয়া হয়ত জল পড়ে, নলচে হয়ত বন্ধ,

কলিকা হয়ত ভাঙ্গা, জলটা হয়ত ঝাল হইয়া গিয়াছে, ঠিকরে হয়ত কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুকায় খাইতে গা ঘিন ঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর—এক প্যাকেট হাওয়া-গাড়ি সিগ্রেট ও এক বাক্স দুয়ানি-মার্কা দিয়াশলাই পকেটে রাখ, বস্, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা জ্বাল আর খাও। (প্রায় 'ঢাল আর খাও' এর ধাক্কা!) এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণমেরু আবিষ্কারে (দক্ষিণ দ্বারেরই কাছাকাছি) গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে সিগ্রেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুনীবাবু হয়ত বলিবেন, সিগ্রেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিশ থাকে। কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মত বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগ্রেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুকায় যে ভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যে ভাবে নরম করিয়া ফেলা হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যে ভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতাশক্তিও অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হল বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী; এ সব কথা আমাদের মুখে ভাল শুনাইবে না। সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগ্রেট টানা—এ দুইটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতত্ত্বের নজীর তুলিব না, সুনীতির বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজতন্ত্রতা ও ইউরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। কথাটা খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগ্রেট সবই তৈয়ারী থাকে, কিছু করাকর্ম্মার দরকার হয় না, ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব ইউরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগ্রেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে

না।[১] নিজের পকেট হইতে সিগ্‌রেট-কেস ও দিয়াশলাইয়ের বাক্স বাহির করিলাম, নিজে দিয়াশলাই জ্বালিলাম, নিজে সিগ্‌রেট ধরাইলাম (স্বয়ংসিদ্ধ যাহাকে বলে), তা'র পর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম, তখন দূরে ছুড়ে ফেলিয়া দিলাম, বস্‌ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই। কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের লাভ—ধূম্রের যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও কচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। ইউরোপীয় সমাজের স্ব-স্ব-প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগ্‌রেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক একটি সিগ্‌রেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকদিগকে দিয়াশলাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মত ইহাতে তেমন হৃদ্যতা হয় কি? হুকা বা কলিকা যেমন অসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়, সিগ্‌রেট তেমনভাবে গ্রহণ করিতে যেন কেমন একটা দীনতা-প্রকাশ হয়।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাক অনেকক্ষণ পোড়ে, বহুলোক প্রতিপালন হয়, সিগ্‌রেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজ, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কতকটা শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোটে যব আগ করে পরবেশ'। তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুকার জল ফিরাইল, কেহ বা নল্‌চেয় ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাকু সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে—ঠিক হিন্দু-পরিবারের তথা হিন্দু-সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্দ্য, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গতা, কেমন সামাজিকতা, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌' ভাব বলুন দেখি?

(১) কোন কোন স্থলে একটি সিগ্‌রেট দুই ইয়ারকে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

তবে দৈবাৎ দুই এক জন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলাস্-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্ত্তব্য নহে। ফরশি আলবোলা গড়গড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিতান্ত নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়মানুষি, আমীরি। বঙ্কিমচন্দ্র পদ-গৌরব ও বংশ গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবেন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকান্ত রায়, রমণ বাবু, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি ধনীদিগের প্রসঙ্গে আলবোলা গড়গড়া সটকার গুণ গাহিয়াছেন। আমরা 'রামচাঁদ শ্যামচাঁদে'র মত সাধারণ গৃহস্থের কথাটা বলিতেছি।[২]

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গুড়ুকের পূর্ব্ববর্ণিত সামাজিকতা-গুণ থাকাতে কেহ বাড়ী আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি। (ইদানীং চা ও সিগ্‌রেট এই সনাতনী প্রথার লোপ করিতে বসিয়াছে) অতএব, যাঁহারা প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশীমেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লীভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া হিন্দুগৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেননা, 'জনম অবধি হম' 'ও রসবঞ্চিত'। তথাপি যেমন—

'অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বর্ষতি মধুধারাম্।
অনধিগত-পরিমলা হি হরতি দৃশং মালতীমালা॥'

তেমনি অজ্ঞাতস্বাদ হইলেও মশলাদার তামাকু ঘ্রাণেই আমাকে মসগুল করিয়াছে। আর শাস্ত্রেও আছে—ঘ্রাণেই অর্দ্ধভোজন!

পাগলা ঝোরা। ১৩২৩

(২) ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ, ফরসী গড়গড়া গুড়গুড়িতে ও হুকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০—১৮৯৯

হৃদয়াঞ্জলি

তোমার সঙ্গীতে এত আনন্দ, এত সহানুভূতি, এত প্রেম। কিন্তু তাহার জন্য মানবসমাজের নিকট হইতে কখনও কি দুইটা সহানুভূতি শুনিয়াছ? বিজ্ঞতা চশমা আঁটিয়া তোমাকে উপেক্ষা করিতে চায়। কিন্তু সে তোমাকে উপেক্ষা করিবে কিরূপে? তুমি যে উপেক্ষার অনেক উর্দ্ধে। অনুগ্রহলিপ্সা ত তোমার হৃদয়ের সম্মুখে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। তুমি যে অপার্থিব,—কিন্তু তুমি পৃথিবীর জন্য সহানুভূতি অনুভব কর।

পাপিয়া গান গাহিয়া যায়; তুমি সেই ভাঙ্গা গানে ভগ্ন হৃদয়ের স্মৃতি ফুটাইয়া দাও। তুমি তাহার গানের উত্তর না দিলে সে কি এমন গান গাহিত? তুমি তাহার গানের মাধুরী প্রচার না করিলে সে কি এমন পঞ্চমে তান ধরিত? সে কি তাহা হইলে আকাশ মাতাইয়া তুলিত? পৃথিবীতে বসিয়া বীণা বাজাইয়া দেবতাদিগকে তুমি মুগ্ধ করিয়াছ; দেবতারা তোমার বীণাঝঙ্কার শুনিতে আসেন, পাপিয়া তোমার হৃদয় হইতে ডাকে—'চোক গেল।' দেবতারা নরলোকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ছায়াপথে দেবসঙ্গীত ধ্বনিত হয়; পৃথিবীতে তাহার প্রতিধ্বনি গীত হয়। দেবসভার জ্যোতিতে ছায়াপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া মর্ত্ত্যের পানে চাহিয়া থাকে, তাহাদের রূপের আলোকে চারি দিক আলোকিত হয়।

চন্দ্রলোকে বুঝি এত অশান্তি নাই—এত দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই। কিন্তু সেখানে কি এমন বাঁশী বাজে, এমন সঙ্গীত শুনা যায়। এমন উচ্ছ্বাস, এমন প্রেম, এত আনন্দ জাগে? ভয়চকিত নৈরাশ্যের মধ্যে সেখানে কি কেহ এমন উদাস গান গাহে? ঐ সুদূর কলঙ্ককালিমার মধ্যে কি কাহারও নিভৃত অশ্রুজলসিক্ত নয়নাঞ্জনের রেখা নাই? চন্দ্রলোকের জ্যোৎস্নাবালারা বুঝি ঐখানে বসিয়া চক্ষে অঞ্জন দেয়—ঐখানে বসিয়া তাহারাও বুঝি মর্ত্ত্যবালাগণের ন্যায় কেশবিন্যাস করে, দুঃখের কাহিনী গায়, ভবিষ্যৎগর্ভে সুখের শয্যা রচনা করে। অন্যান্য গ্রহবালারা গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিয়া দেখে।

বামনাবতারের পদচিহ্ন ধরিয়া ঐখান হইতে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে,—তাহার ছায়াময় কেশগুচ্ছের মধ্যে দু একটি নক্ষত্র ফুটিয়া থাকে, তাহার

ফুলসাজের স্নিগ্ধ সৌরভে চারি দিক্ সৌরভান্বিত হইয়া উঠে—তখন অস্তমান রবিকিরণের শেষ ছায়ায় নরলোকে কি মহোৎসবের ভগ্নাবশেষ ফুটিয়া উঠে! পশ্চাতে দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিত স্মৃতি—সম্মুখে শান্তির ছায়া; পশ্চাতে জগতের অস্তমান জ্যোতি—সম্মুখে সন্ধ্যার শ্যামল স্নেহ। এই সৌরভান্বিত সন্ধ্যার ছায়ায় তুমি এক দিন একটি ম্লান মুখের 'বিদায়-চাওয়া-চোখ' ফুটাইয়াছিলে, আর একদিন আর এক বেশে সেই বিদায়-চাওয়া মাধুরীতে তোমার ছায়াস্বপ্ন বিকশিত করিয়াছিলে।

তুমি জীবনের আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া মৃত্যুর মোহন মূর্ত্তি বাহির করিয়াছ। তাপহরণ বিরামসদন মৃত্যুর অসীম-প্রসারিত ক্রোড়ের উপর ত্রিভুবন নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। তুমি এই আশ্চর্য্য গম্ভীর মনোহর দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। এই অনন্ত শিখাবিপুল চিতানল হইতে অবিশ্রাম জীবনস্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সুগভীর রহস্য-নিশীথ ভেদ করিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী দীপ্ত চিতার পবিত্র আভা তোমার উদাস মুখে, উদার ললাটে, প্রশান্ত নেত্রে, তোমার বীণার কনকতন্ত্রীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। এই রহস্যময় জীবন-অন্ধকারে এই মৃত্যুর স্তিমিত আলোকে দাঁড়াইয়া তোমার জন্য হৃদয় উৎসর্গ—হৃদয় অঞ্জলি—; এইখানে এই ভাবে তুমি চিরদিন এই গান গাহিও—এই অনন্তজীবন-প্রবাহময় মৃত্যুর স্নেহ-আকর্ষণে নিখিল জগতের অবিরাম অভিসার-গীতি।

ভারতী ও বালক। ১২৯৪

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা

পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ, পথের দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি

দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের সেই বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ; প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণচাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখী, কখনও মেঘ, কখনও লতা, কখনও পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট্ দৃশ্যের কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিত্রিতব্য বিষয় নহে—কারণ, বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতিনৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

সাধনা। ১২৯৯

কণারক

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির —শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই

মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন!

এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালু ভাঙ্গিয়া একটা ভগ্ন মন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু জগমোহনটুকু বিচিত্র শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যে অক্ষুণ্ণশিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিক জনের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপে মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলিই কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর! কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দুর লেপনপূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়, কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছু কাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

সাধনা। ১৩০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১—১৯৫১

শিলাদিত্য

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে-কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে এক-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোট পাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র ; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে-দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল—চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন—সেই সময়ে একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে কোরে কাঁদতে লাগলেন ; আর মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—"হায়, এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।" হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো-কালো দুটি বড়-বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে—চারিদিকে অন্ধকার ; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও

সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির—কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন! সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কি জানি কি মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে-ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি-কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুইহাতে মুখ ঢেকে বললেন—"হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!" সূর্যদেব বললেন—"ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর।" বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন—"প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।" সূর্যদেব বললেন—"বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর!" তখন সুভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন—"প্রভু, যদি বর দিলে, তবে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি! ছেলেটি তোমারি মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী।"

রাজকাহিনী। ১৯০৯

বুদ্ধমহিমা

ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুণছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধুলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে-নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে-গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো বুদ্ধ-দিবাকরায়। নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।'

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠেমাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে—কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানখেত নিড়োতে কেউ বা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়।' মায়ের কোলে ছেলে শুনছে—'নমো নমো গৌতম-চন্দ্রিমায়।' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নমো কর্, নমো কর্।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠেছে—নমো নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন। আগল খুলে গেছে! খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন—'সুখী হও, মুক্ত হও।'

নালক। ১৯১৬

লুকিবিদ্যে

টিকৃটিকি, গিরৃগিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া আলাপী, ঘাড়ে-চড়া বন্ধু, এক কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি করে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে কোনখান থেকে আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল, সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

'অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি ক'রে রাঙ এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোরপন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটাপথে অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি শহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়োমামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল, তা আর কী বলব! একবার এক কেরানি তার কাছে বাপ মরে ব'লে ছুটি চাইতে সে বললে কিনা, 'ইয়োর ফাদার হ্যাজ নো বিজ্‌নেস টু ডাই হোয়েন্ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন!' দেখো দেখি, বাপ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালোও ছিল। টুনি—সে বড়ো মজার সাহেব ছিল। ধুতি প'রে সে কালী পুজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখি শিকারে ভারি শখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে, পাখিটাকে মেরেই আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাজ-কাটা টুনটুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তার পর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে করে কোন্ বড়ো মিলিটারি পোস্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখানে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম্ গভর্ণমেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে মিস্ত্রি আসত জাহাজে ক'রে আমরা দেখেছি।—ওই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দুধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি হাতে তারা ঘুরে বেড়াত। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওইখানটায়! ব্যাটারা যে জুতো বানাত, বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন' ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার

মামাশ্বশুর, তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মত শৌখিন ছিল না। ওই যেখানটায় এখন রিপন কলেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা সাদা চাঁপার গাছ ছিল; তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা। শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হ'ত। দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছ তো? ওই তাঁরই ওস্তাদ; তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিশনারিরা তাঁর ছিরামপুরের বাগানখানা কিনে ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ। রামধন বলে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিল, তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারত না, বাপু! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান করে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সব-প্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যামডাক্তার। সাহেবেরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড়ো চটেছিল—চটবারই কথা!'

আমরাও কর্তার গল্পের বহর দেখে যে না-চটছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র; সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিশনারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্ষদের সঠিক জীবনবৃত্তান্তে এসে পৌঁছল। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে-মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়, মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাশি হয়েছে, এইরকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়ল তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়োবাজার পৌঁচেছে।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে? আংটিটার তো কোন সন্ধান পাচ্ছি নে!'

'তার পর আংটিটার কী হল, কর্তা?' বলেই অবিন চোখ বুজলে।

গল্প চলল, 'লুকিবিদ্যে বড়ো সহজ বিদ্যে নয়! রাজা কেষ্টচন্দ্রের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবনচরিতে এই রসসাগরের লুকিবিদ্যের কথা লেখা আছে—'

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোল্ ও সমস্ত বাঙ্গলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রুমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কী দিয়ে ভাত খেতেন, এমনি সব ঘরাও খবর

আবিষ্কার করতে করতে বড়োবাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলল—আংটির দিক দিয়েও গেল না! কর্তার শেষ বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে-খবর ঘুণাক্ষরে জানে না, এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা করে দিয়ে কর্তা ডাঙ্গায় পা দিলেন।

আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, যথার্থই কর্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেল না!'

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ওইজন্যেই তো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্তা। নিজের খবর এঁর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে। পরের ছোটোখাটো ব্যবহারের জিনিস—চুরুট, দেশলাই, পান, মায় তার ডিবে, এঁর পকেটে আপনি গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি গিয়ে হাতে ওঠে; পরের বিদ্যেয় ইনি পণ্ডিত; পরচর্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়াসাধক; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্তা—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।'

পথে বিপথে। ১৩২৫

পাখির প্রশ্ন

গ্রামে-গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাটিতে-ঘাটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। "কোন গ্রাম?" "তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া—হাল তেঁতুলিয়া।" "কোন শহর?" "নোয়াখালি—খটখটে।" "কোন মাঠ?" "তিরপুন্নীর মাঠ—জলে থৈ থৈ।" "কোন ঘাট?" "সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।" "কোন হাট?" "উলোর হাট—খড়ের ধুম।" "কোন নদী?" "বিষনদী—ঘোলা জল।" "কোন নগর?" "গোপাল নগর—গয়লা ঢের।" "কোন আবাদ?" "নসীরাবাদ—তামুক ভালো।" "কোন গঞ্জ?" "বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।" "কোন বাজার?" "হালতার বাজার—পলতা মেলে।" "কোন বন্দর?" "বাগাবন্দর—হুকাহুয়া।" "কোন জেলা?" "রুক্সী জেলা—সিঁদুরে মাটি।" "কোন বিল?" "চলন বিল—জল নেই।" "কোন পুকুর?" "বাঁধা পুকুর—কেবল

কাদা।” “কোন দীঘি?” “রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।” “কোন খাল?” “বালির খাল—কেবল চড়া।” “কোন ঝিল?” “হীরা ঝিল—তীরে জেলে।” “কোন পরগণা?” “পাতলে দ—পাতলা হ।” “কোন ডিহি?” “রাজসাই—খাসা ভাই!” “কোন পুর?” “পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।” “কার বাড়ি?” “ঠাকুর বাড়ি।” “কোন ঠাকুর?” “ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।” “কার কাচারি?” “নাম কর না, ফাটবে হাঁড়ি।”

বুড়ো আংলা। ১৩৪১

শিল্প ও ভাষা

যে মানুষ ছবি কথা কিম্বা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারেনি, স্ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে আস্তে একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে—আলপনার পদ্মপত্রের উপরে একটি বুদ্বুদের আকারে; স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়লো বসুন্ধরা—‘হে বিচিত্র-গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারায় তোমার স্তব করেন।’ জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনই গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণনা করে চল্লো আকাশে ভ্রাম্যমাণা পৃথিবীকে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক্ষ ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাতপায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে’ গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা। এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্তি। এর পার্শ্ব-দেবতা হল দুটি—‘বাচন’ ও ‘বর্ণনা’, এই মূর্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—“হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ।” এর পরে এল বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্যন্ত, আবৃত্তি থেকে সুরু করে বিবৃতি পর্যন্ত—“বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্দেবীর করুণায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল।”—ভাষা, বোধোদয় বস্তুপরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোলো। তারপর এলো ভাষার মহিমা সৌন্দর্য ইত্যাদি—“যেমন চালনীর

দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেইভাবে বুদ্ধিমান পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন··· সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন,···ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন···বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন···ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভাষা আহরণপূর্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।" বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পাবার আগে থেকে, কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল—মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিষ্কৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল। মানুষের সবচেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই দিয়ে রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভরা দেখি; "আমার কর্ণ, আমার হৃদয়, আমার চক্ষুর্নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে···দূরস্থবিষয়ক চিন্তাব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে···আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণনা করি কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!" কিম্বা যেমন—"কিরূপ সুন্দর স্তুতি ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।" হৃদয়ের বেদনার অন্ত নেই, দেখতে চেয়ে শুনতে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে, ধাবিত হচ্ছে। অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর। কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না!—"যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতাসকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি!" মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোন রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুসি হচ্ছে না মানুষের মন, সুন্দর উপায় সকল উত্তম উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য সাধনা চলেছে—"হে বৃহস্পতি। আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়।" ছবি দিয়ে যে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল

স্তোত্র আর ভাষা চাইলেন। ভাষার পথে গতি পৌঁছয় কোথা থেকে? মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গলার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙ্গালীর মন বাঙ্গলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাঙ্গলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা জিনিষে যুক্ত হতে. হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের মধ্য দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাঙ্গলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্ট হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—"হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল।" বৃষ্টির জল ঝরনা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাজের হল, আর জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চুড়োয় বসে রইলো—গল্লোও না চল্লোও না, গলালেও না চালালেও না, জলের থাকা না থাকা সমান হল! বাঁধা বস্তুর বা styleএর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার ভাষা সবারি এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেলো অমনি সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজে টেনে আনা বালির বাঁধে। নতুন কবি নতুন আর্টিস্ট এরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে! এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই! ভাষা সকল গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো অথচ দেখে মনে হতো যেন কতই চলছে!

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী। ১৯৪১

সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দর-অসুন্দর—জীবন নদীর এই দুই টান—একে মেনে নিয়ে যে চল্লো সেই সুন্দর চল্লো আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে কোনো

একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে' চলে' যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে,—আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এই ভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে' বাঁধা আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক ওদিক দোলে, তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়! আর্ট এবং আর্টিস্ট এদের মনের গতি এমনি করে' পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দড়ি খোঁটা অতিক্রম করে' উপড়ে' ফেলে' চলে' যায়। বড় আর্টিস্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে, সেইগুলোকেই ভেঙে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমত সুন্দর করে' বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে ঠুকেই মরে, সুন্দর অসুন্দরের জোয়ার ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা নৌকো সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকো সে আর এক ভাবে সুন্দর; তেমনি কোন একটা কিছু সকরুণ সুন্দর, কেউ নিষ্করুণ সুন্দর, কেউ ভীষণ সুন্দর, আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর—আর্টিস্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে; আর্টিস্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিসটাই অসুন্দর, কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর। সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হ'ক তাজাই হ'ক সুন্দর হ'ক অসুন্দর হ'ক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিস্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড় বড় আর্টিস্টরা যা আজ রচনা করে' গেলেন, আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাউরে নেয় তার কারণ আর কিছু নয়, আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে' না বোধ করে' সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন, ক্রমে

দশজন। এবং মনে হয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে, সে, অথবা সুন্দরের কোন ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্যবোধের ভান করছে, সেও, আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে' ধরে,—ঠিক যে ভাবে বিশেষ বিশেষ জাতি আপনার আপনার এক একটা জাতীয় পতাকা ধরে' তারি নিচে সমবেত হয়: সে পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ তোলে নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের standard বা সৌন্দর্য-বোধের চিহ্ন। এইভাবে একের পর আর এসে নতুন নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙা-গড়া হতে হতে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে, কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে' নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিস্টের সৌন্দর্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতিক গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁৎ আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিস্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেন না সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা না একটা ধরে' থাকেই, কাজেই সে সত্য কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছেতাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিস্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটিতে বোঝায় —যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বললে বলি, যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিস্ট এই শব্দটির যথার্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে' পণ্ডিতানাম্ মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে; খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত প্রাণ। তাই দেখছি সুন্দর অসুন্দরের বাছ-বিচার পরিত্যাগ করে' তারি সঙ্গে গিয়ে লাগবার স্বাধীনতা আর্টিস্টের মনকে বড় কম প্রসার দেন না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন, বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে' দেওয়া,—সে লঙ্কাকাণ্ড করে' বসবেই, নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুরিয়ে কিংবা ভরাডুবি করে' স্রোতের মাঝে। বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হ'লে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে

হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছয় মন; আর নিজের ইচ্ছামত চলতে চলতে ভুলে' হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে' যায়, তখন তার কোন কারিগরই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসার-জোড়া সর্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিস্টকেও বাঁচাতে। যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ—একথা যাঁরা শিল্প বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে' নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বল্লেন না। কেন না তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর নয়, হৃদয়ে যা ধরে তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিষে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একেবারেই আর্ট নয়, এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগলো না, মধুকরের মতো উড়ে' পড়লো না ফুলের দিকে, কাদাখোঁচার মতো নদীর ধারে ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগলো পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে, আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই। এই সব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ-পরম্পরায়, তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে' খণ্ড-বিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না ভাল লাগল তা নিয়ে দু'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হ'লে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে' সবার করে' দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে individualityকে universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তাঁর পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার ক'রলে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, art-এও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিস্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি

চলে শতমুখী ছোট ছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা শোভা-সৌন্দর্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান্ সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা-স্রোত বেয়ে আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে' চলে। বাইরে রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, যেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্য-লোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুল্লো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চল্লো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী। ১৯৪১

ঘরোয়া

দেখি আমাদের দেশী দেবদেবীর ছবি নেই। নন্দলালদের দিয়ে আমি তাই নানান দেবদেবীর ছবি আঁকিয়েছি। আর্ট স্টুডিয়ো থেকে যা-সব দেবদেবীর ছবি বের হত তখন! আমি বললুম নন্দলালকে,—আঁকো যমরাজ, অগ্নিদেবতা, আরও সব দেবতার ছবি, থাকুক এক-একটা 'ক্যারেক্টার' লোকের চোখের সামনে। আমার আবার দেবতার ছবি ভালো আসে না, যা কৃষ্ণচরিত্র করেছিলুম তাও ভিতর থেকে ওটা কি রকম খেলে গিয়েছিল বলে। নয়তো আমার ভালো দেবদেবীর ছবি নেই। তা, নন্দলালরা বেশ কতকগুলো দেবতার ছবি এঁকে গিয়েছে, লোকেরা নিয়েছেও তা। ছবি আঁকবার আমার আর-একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ছবি আঁকা এমন সহজ করে দিতে হবে যাতে সব ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে এঁকে যাবে। তখন আর্ট শেখা ছিল মহাভয়ের ব্যাপার। সেটা আমার মনে লেগেছিল। তাই ভেবেছিলুম এই ভয় ঘোচাতে হবে, ছবি আঁকা এত সহজ করে দেব। কারণ

এটা আমি নিজে অনুভব করেছি আমার ভাষার বেলায়। রবিকাকা আমাকে নির্ভয় করে দিয়েছিলেন। তা, আমিও ছবি আঁকার বেলায় নির্ভয় তো করে দিলুম, দিয়ে এখন আমার ভয় হয় যে কী করলুম। এখন যা-সব নির্ভয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছে, ছবি এঁকে আনছে—এ যেন সেই ব্রহ্মার মতো। কী যেন একটা গল্প আছে যে, ব্রহ্মা একবার কোনো একটি রাক্ষস তৈরি করে নিজেই প্রাণভয়ে অস্থির, রাক্ষস তাঁকে খেতে চায়। ভাবি, আমার বেলায়ও তাই হয় বা; আমার মূল কথা ছিল ঐ আর্টকে নিজের করতে হবে, পার,—সহজে করতে হবে। আমি তো বলি যে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে—একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী, তারা সব জিনিস তৈরি করে। তারা সার্ভিস দেয়, ভালো রান্না করে দেয়, ভালো আসবাব তৈরি করে দেয়। তারা হচ্ছে সার্ভার, মানে ক্র্যাফ্‌ট্‌সম্যান। তারা একতলা থেকে সব-কিছু করে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে থাকে ঝাড়লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদি, চারদিকে সব-কিছু ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরি হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলায় বৈঠকখানায় সেসব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি—শিল্পদেবতার সেই হল খাস-দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছেমতো শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।

ঘরোয়া

দেখো মনে সব থাকে। সেই ছেলেবেলা কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকসা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর-এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক

ঢুকছে; কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর. ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও তাই। এই ধরো না বিশ্বভারতীর রেকর্ড, রবিকাকা কোথায় গেলেন, কী করলেন, সব লেখা আছে; কিন্তু তা আর্ট নয়, ও হচ্ছে হিসেব। মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই কি, কিন্তু ওই একটু মিলিয়ে নেবার জন্য, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই তফাত। হিসেব থাকে না মনের ভিতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প। সেই 'ঘরোয়া' গল্পই বলে গেলুম তোমাকে।

ঘরোয়া। ১৩৪৮

জোড়াসাঁকোর ধারে

তোমাদের এখানে আজ বর্ষামঙ্গল হবে? আমাদেরও ছেলেবেলা বর্ষামঙ্গল হত। আমরা কি করতুম জানো? আমরা বর্ষাকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝন্ ঝন্; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম—থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাঁপাই শাড়ি—কি বাহার খুলত! তবে শোনো বলি একটা বাদলার কথা।

সন্ধ্যে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল, সে কি জল, কি ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতালা বাড়ি যেন কাঁপছে, পাকা ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে সব শোবার ঘরে। পিদিম জ্বালায় দাসীরা, নিবে নিবে যায় বাতাসের জোরে। বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে দাসীরা আমাদের কোলে করে দোতলায় নাচঘরে এনে শোয়ালে। বাবা মা, পিসি পিসে, চাকর দাসী, ছেলেপুলে, সব এক ঘরে। এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্ম দাসী কটর কটর কলাইভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দু-একটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে—ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।

ওদিকে শোঁ-শোঁ শব্দ করছে বাইরের বাতাস; এক-একবার নড়েচড়ে উঠছে বড় ঘরের বড় বড় কাঠের দরজাগুলো। খানিক ঘুমিয়ে খানিক জেগে

কাটল ঝড়ের রাত। সকালে কাক পাখি ডাকে না, আকাশ ফরশা হয় না। মাছের বাজারে মাছ আসেনি, পানবারুই পান আনেনি। শশী পরামানিক এসে খবর দেয়, শহরের রাস্তায় হয়েছে এককোমর জল।

ও দিব্য ঠাকুর, আজ কি রান্না?—'ভাতে ভাত খিচুড়ি' বলে খুন্তি হাতে চলে যায় রান্নাবাড়ির দিকে। কেরাঞ্চি গাড়ি চলল না আপিসের দিকে, গোরুর গাড়িতে ব্যাঙের ছাতার নিচে বসে ব্যাঙ্কের বড়বাবুরা সরকারি কাজে যাচ্ছেন। সিঙ্গিদের পুকুর ভেসে মাছ পালিয়েছে, পাড়ার লোক ধরে ধরে ভেজে খাচ্ছে। হিরু মেথর এসে খবর দিতেই, বেরিয়ে পড়ল বিপনে চাকর ছোট ডিঙি বেয়ে শহরের অলিতেগলিতে ফিরতে। কাগজের নৌকো চলল আমাদের ভেসে—এ গাছ ঘুরে, ও বাগানে ডুবে-যাওয়া গোল চক্কর ঘুরে, একটানা স্রোতে পড়ে চলতে চলতে, ফটকের লোহার শিকে ঠেকে উলটে পড়ল কাদায় জলে লটপট্ একগোছা বিচিলির লঙর ফেলে।

ঈশ্বর দাদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ঠকঠকিয়ে ভিস্তিখানায় এসে হাঁকলেন 'বিশ্বেশ্বর!' 'যাই'—বলে বিশ্বের হুঁকো কল্কে হাতে দিতেই—'শনির সাত, মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন' বলতেই হুঁকো শব্দ দিতে থাকল—চুপ চুপ, ছুপ ছুপ, ঝুপুর ঝুপ। তখন বর্ষাকাল পড়লে সত্যি সত্যি বৃষ্টিঝড় আকাশ ভেঙে খড়ের চাল খোলার চাল ফুটো করে আসত, এ দেখেছি। ডালে চালে খিচুড়ি চেপে যেত। মেঘ করলেই শহর বাজার ডুবত জলে, পুকুরের মাছ উঠে আসত রান্নাবাড়ির উঠানে, খেলা করতে করতে ধরা পড়ে ভাজা হয়ে যেত কখন বুঝতেই পারত না।

ফুটো ছাত ভাতে ভাত
ভাজ মাছ।

সাত রাত সাত দিন ঝমাঝম্। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যেদিকে চাও ভিজে শাড়ি ভিজে কাপড় পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন। সন্ধ্যে থেকে কালো ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাংদিং টাকাংদিং মশারি ঘিরে। দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা, শোলার টুপি ওয়াটারপ্রুফ রেনকোট ছিল না; ছিল ছেলেবুড়ো মিলে গানগল্প, বাবু ভায়ে মিলে খোসগল্প—আর কত কি মজা আঠারো ভাজা জিবেগজা। গুড়গুড়ি ফরসী দাদুরীর বোল ধরত গুডুক ভুডুক।

জোড়াসাঁকোর ধারে

আর-একটি জায়গা, সেটি আমার পরীস্থান। দেখো, যেন শুনে হেসো না। আমার পরীস্থান আকাশের পারে ছিল না। ছিল একতলার সিঁড়ির নীচে একটা এঁদো ঘরের মধ্যে। সেই ঘর সারাদিনরাত বন্ধ থাকে, দুয়োরে মস্ত তালা। ওৎ পেতে বসে থাকি সকাল থেকে, বড় সিঁড়ির তলায় দোর-গোড়ায়। নন্দ ফরাস আমাদের তেলবাত্তি করে, তার হাতে সেই তালাবন্ধ ঘরের চাবি। সে এসে সকালে তালা খোলে তবে আমি ঢুকতে পাই সেই পরীস্থানে। সেখানে কি দেখি, কাদের দেখি? দেখি কর্তাদের আমলের পুরানো আসবাবপত্রে ঠাসা সে ঘর। কালে কালে ফ্যাশান বদল হচ্ছে, নতুন জিনিস ঢুকছে বাড়িতে, পুরোনোরা স্থান পাচ্ছে আমার সেই পরীস্থানে। কত কালের কত রকমের পুরোনো ঝাড়-লণ্ঠন, রঙবেরঙের চিনে মাটির বাতিদান, ফুলদানি, কাচের ফানুষ, আরও কত কি। তারা যেন পুরাকালের পরী—তাকের উপর সারি সারি চুপচাপ, ধুলো গায়ে, ঝুলমাকড়শার জাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে; কেউ বা মাথার উপরে কড়ি থেকে ঝুলছে শিকল ধরে। ঘরের মধ্যেটা আবছা অন্ধকার। কাচমোড়া ঘুলঘুলি থেকে বাইরের একটু হলদে আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় তাদের গায়ে থেকে থেকে চমক দিচ্ছে রামধনুর সাত রঙ। আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই টুংটাং শব্দে ঘর ভরে যায়। মনে হয়, যেন সাতরঙা সাত পরীর পায়ে ঘুঙুর বাজছে। সেই রঙবেরঙের পরীর রাজত্বে ঢুকে এটা ছুঁই ওটা ছুঁই, একে দেখি তাকে দেখি, কাউকে বা হাতে তুলে ধরি, এমন সময়ে নন্দ ফরাস তার তেলবাতি সেরে হাঁক দেয়, 'বেরিয়ে এসো এবারে, আর নয় কাল হবে।' তালাচাবি পড়ে যায় সেদিন রাতটার মতো আমার পরীরাজত্বের ফটকে।

জোড়াসাঁকোর ধারে

মধুর তোমার শেষ যে না পাই,
প্রহর হল শেষ।

এ 'মধু'র শেষ নেই। প্রহর শেষ হয়ে যায়। কত মধু, আমাদের এমন পাত্র তাতে এর একফোঁটা মধুও ধরতে পারিনে। ধুলোতেও মধু তাই তো

বলি, গোরুর গাড়ি রাস্তার বুক চিরে চলেছে আঁকলেম, কিন্তু ধুলো উড়ল কই? ধুলো উড়োনো চাই। সেবারে এখানেই এই চেয়ারে এমনিভাবেই বসে বসে দেখতুম, রাস্তার পারের ওই গাছটির উপর দিয়ে লাল ধুলো উড়ে এল, দেখতে দেখতে গাছটি ঢেকে গেল, আবার ধীরে ধীরে গাছটি পরিষ্কার হয়ে ফুটে বের হল, ধুলোর হাওয়া চলে গেল আরো এগিয়ে, মনে হল গাছটির উপরে যেন একপশলা লাল ধুলোর বৃষ্টি হয়ে গেল। সে কি চমৎকার! তা কি আঁকতে পারি? পারিনে। কিন্তু আঁকতে হবে যদি সময় থাকে। এই বৃদ্ধকালেও দেখো মন সঞ্চয় করে রাখছে. কোন্ জন্মের জন্য বলতে পারো?

একবার কি হল, আমার চোখের চশমার একটা কাচের কোণা ভেঙে গেল। তাই চোখে দিয়ে থাকি। বললুম, আরো ভালোই হয়েছে, শার্শি ফাঁক হয়ে গেছে, ওর ভিতর দিয়ে রং আসবে। একদিন নন্দলালকে বললুম, দেখো তো আমার এই চশমাটি চোখে দিয়ে। নন্দলাল তা চোখে দিয়ে বললে, এ যে রামধনুকের রং দেখা যায়; অনেকদিন বুঝি পরিষ্কার করেননি কাচ? আমি বললুম, না না, তা নয়। ছবিতে যত রঙ দিই সেই রঙই এই রাস্তায় লেগেছে।

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও।
দোলাও দোলাও।

মায়ের দোল স্মরণ হয়। যাবার সময় তো হয়েছে, যাবই তো, এ ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে এসেছে। নদীর ওপারে গিয়ে কি দেখব? আবার কি মিলব সবাই সেখানে? কি জানি! তা যদি জানতে পারা যেত তবে কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকার রস চলে যেত। এইখানেই সব শেষ করে নাও; এখানকার পাত্র এইখানেই ধুয়ে ফেলো। শেষ পেয়ালার ফোঁটা ফোঁটা তলানিটুকু, সেখানেই সব রস জমা হয়ে আছে। যত শেষের দিকে যাবে তত রস। চীনেরা বেশ উপমা দেয় তাদের চায়ের সঙ্গে; বলে, চা তিন রকম। প্রথম জ্বালের চা ঢাললে, ছোট ছেলেরা খাবে, পাতলা চা, সোনার বর্ণ, তাতে একটু দুধ, একটু চিনি। দ্বিতীয় জ্বাল, তখনো সেটা ফুটছে, রং আগের চেয়ে একটু ঘন হয়ে এসেছে, তা প্রৌঢ়দের জন্য। আর তৃতীয় জ্বাল, তলার যে চা রয়েছে, অল্প জল আর চায়ের কাথ; এই যে শেষ পেয়ালা, এ সবার জন্য নয়। যাদের বয়েস হয়েছে, সুখ-দুঃখ তিক্ত-মিষ্টের রস সত্যি উপভোগ করতে পারে, এ শুধু তাদের জন্যই।

কালি কলম মন
লেখে তিনজন।

ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিই হয় মাস্টারপিস। অবিশ্যি, সব ছবি আঁকতে যে এভাবে চলি তা নয়। জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে অনেক ছবির কাজ সেরে দিই, মন পড়ে থাকল বাদ। এমন ছবি একটা এঁকে যদি ছিঁড়ে ফেলতে যাই, তোমরা খপ করে হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পালাও। ঠকে যাও জেনো।

জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৩৫১

জোড়াসাঁকোর ধারে

রবিকা বলতেন, 'অবন একটা পাগলা।' সে কথা সত্যি। আমিও এক-একসময়ে ভাবি, কি জানি কোন্‌দিন হয়ত সত্যিই খেপে যাব। এতদিনে হয়তো পাগলই হয়ে যেতুম, কেবল এই পুতুল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নিয়েই কোনোরকমে ভুলে থাকি। নয় তো কী দশাই হত আমার এতদিনে। একটা বয়স আসে যখন এইসব ভুলে থাকবার জিনিসের দরকার হয়। একবার ভেবেছিলুম লেখাটা আবার ধরব, কিন্তু তাতে মাথার দরকার। এখন আর মাথার কাজ করতে ইচ্ছে যায় না। গল্প বলি, এটা হল মনের কাজ। এই মনের কাজ আর হাতের কাজই এখন আমার ভালো লাগে। তাই পুতুল গড়তেও আমার কষ্ট হয় না। সেখানে হাত চোখ আর মন কাজ করে। অন্য আর কিছু ভাবতেও ইচ্ছে করে না। রবিকা যে বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ির মুখ দিয়ে আমাকে বলিয়েছিলেন 'জন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি আমিও কারো জন্য ভাবতে শিখিনি', এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবিকা আমাকে ঠিক ধরেছিলেন। তাই তো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল আমার চরিত্রের সঙ্গে। ও সব জিনিস অ্যাকটিং করে হয় না। করুক তো আর কেউ তিনকড়ির পার্ট, আমার মত আর হবে না। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আসল রূপ। আমি নিজের মনে নিজে থাকতেই ভালোবাসি। কারো জন্য ভাবতে চাইনে, আমার জন্যও কেউ ভাবে তা পছন্দ করিনে। চিরকালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার

গেল না কোনোকালেই। আমার নামই ছিল বোম্বেটে। দুরন্তও ছিলুম, আর যখন যেটা জেদ ধরতুম সেটা করা চাইই। তাই সবাই আমার ওই নাম দিয়েছিলেন। রবিকারাও চিরকাল ওই 'খ্যাপা' 'পাগলা' বলে আমাকে ডাকতেন। আমিও যেন তাদের কাছে গেলে ছোট্ট ছেলেটি হয়ে যেতুম। এই সেদিনও রবিকাদের কাছে গেলেই আমার বয়স ভুলে আমি যেন সেই পাগলা খ্যাপা হয়ে যেতুম। তাঁরাও আমায় সেইভাবেই দেখতেন। কিছুকাল আগে যখন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেম, রবিকার হুকুমে প্রতিমাও কারপ্লে, ওরা মিলে আমার থাকবার জন্য ঘর সাজিয়েছে যেন একটা বাসরঘর। আমি আবার আস্তে আস্তে সব তুলে রাখি, কি জানি কোন্‌টা ময়লা হয়ে যাবে। নিজের বিছানাপত্র খুলে নিই। সকালে উঠেই আমাকে এই বকুনি, 'না, ওসব তুমি কি করছ।' ব'লে আবার সেইভাবে ঘরদোর সাজিয়ে দেওয়ালেন।

জোড়াসাঁকোর ধারে

বাবামশায় আমার কথা বলতেন, 'ওকে আর বিদেশে পাঠাব না। ও আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষ দেখবে, ভারতবর্ষ জানবে। এদেশটাই ওকে দেখাব ভাল করে।' তাই হল, বাবামশাই মারা গেলেন, আমার আর বিদেশে যাওয়া হল না, এখনও ভারতবর্ষকেই দেখছি, জানছি। বড় হবার পরে যখন ছবি আঁকা নিয়েই মেতে রইলুম, মার মনে বড় ভাবনা হল যে, এই ছেলেটার লেখাপড়াও হল না বিষয়কর্মও শিখল না, কিছুই হল না। তার পর যখন দিল্লির দরবার থেকে সোনার মেডেল এল, আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হলুম, চারিদিকে নাম রটতে লাগল, তখন মা বললেন, 'আমি ভয় পেয়েছিলুম যে কিছুই তোর হল না। এখন মনে হচ্ছে যে কিছু একটা হলি তবুও!'

সুমধুর স্মৃতি তেমন ছিল না জীবনে। তবে কবির সঙ্গ পেয়েছি, সেই ছিল জীবনের একটা মস্ত সম্পদ। মাও বুঝতেন, বলতেন, 'রবির সঙ্গে আছিস, বড় নিশ্চিন্ত আমি।'

জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৩৫১

অরবিন্দ ঘোষ

১৮৭২-১৯৫১

কারাকাহিনী

আমার নির্জ্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল, ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শাস্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম ও বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে, মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শাস্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি, আই, ডি-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে—হাতেপায়ে হাত কড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা মারামারির জন্য নয়, বারবার খাটুনীতে ত্রুটি হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসের মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তিস্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ তবে স্বদেশী বা "বন্দেমাতরম্"-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিশের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান তো এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্যসৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্ব স্বরূপ থালা বাটীর এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে "স্বর্গজগতে" নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের

মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন একহাতে আহার করা, একহাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটীটীই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড়পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্ব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিশ, শুল্কবিভাগের কর্ত্তা, মিউনিসি-প্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্ত্তা, পুলিশ, বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও একশরীরে একসময়ে প্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য আমার আদরের বাটীরও তদ্রূপ। বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া যে বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটীতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটীতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটীতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটী আমার এইসকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের একসঙ্গে রাখা হয়, তখন আবার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্ত্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকাল এতদ্দ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল।

কারাকাহিনী। ১৩২৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩—১৯৩৮

আইন প্রসঙ্গ

ছেলেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাঁহার শয়নকক্ষে গেল। বলিল, "কেন আপনি ভাত খেলেন না বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না কিছু নয়। পেটে হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা বোধ হল।"

কার্ত্তিকবাবু বললেন, "এই বল্লেন মাথা ধরেছে, আবার বল্‌ছেন পেটে ব্যথা—আসল কথাটা কি খুলে বলুন। কি হয়েছে, কেন খেলেন না? মাখা ভাত ফেলে রাখ্‌লেন, তার কারণ কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

শরৎবাবু বলিলেন, "ভট্‌চায মশায়?"

"কি?"

"কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য তখন হুঁকাটি নামাইয়া, ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বর নামাইয়া বলিলেন, "সে রামনিধি কোথায়?"

"বোধ হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে—অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ঐ রামনিধি—পাজি বেটা—নচ্ছার বেটা—তোমাদের কাছে নিজেকে কায়স্থ বলে' পরিচয় দিয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভট্টাচার্য্য ক্রোধে স্বর কাঁপাইয়া বলিলেন, "হুঁঃ!—কায়স্থ! বেটা সাতজন্মে কায়স্থ নয়—হারামজাদা বেটার চৌদ্দপুরুষ কায়স্থ নয়। ছি ছি ছি —ঘোর কলি।—ঘোর কলি!"

দুই তিন জনে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি তবে?"

"ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ধোপা—ধোপা—ওর বাপের নাম রেদো ধোপা। বেটা বলে আমার বাবার নাম রাধানাথ।—রাধানাথ! রেদো ধোপা বলেই ত চিরকাল জানি। এদানী রেদো হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে পড়েছিল বটে—

আঙুল ফুলে কলাগাছ—কিন্তু আমরাই ছেলেবেলায় তাকে কালীদীঘির ঘাটে হিস্‌সো হিস্‌সো করে কাপড় কাচ্‌তে দেখেছি। ছি ছি ছি ছি? ধোপার সঙ্গে এক ঘরে বসে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ওসব খৃস্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার সইবে কেন? ছি ছি ছি ছি—তোমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান—কায়স্থ সেজে এসে তোমাদেরও জাতটে খেয়েছে! মহাভারত! মহাভারত!"

বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। ছেলেরা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

শেষে শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, কার্ত্তিকবাবু—এর একটা বিহিত করুন।"

"কি করতে বলেন?"

"পুলিসে দিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের এতগুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশটা কর্‌লে। কনস্টেবল ডেকে হ্যাণ্ডোভার করে দিন।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "এতে কি পুলিস কেস্‌ হতে পারে? তাত জানিনে। বিনয়বাবু কি বলেন?"

বিনয়বাবু কাছে বসিয়া ছিলেন—তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। বলিলেন, "পুলিস কেস্‌? কোন্‌ ধারায় হবে?"

শচীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ধারা ফারা আপনি বুঝুন। এত বড় একটা অন্যায়, আইনে এর সাজার বিধান নেই কখনও হতে পারে!"

বিনয়বাবু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জানি চীটিং-এর মধ্যে পড়ে কি না। —হুয়েভার—হুয়েভার—দূর হক্‌গে ছাই—চীটিং-এর ডেফিনিশনটাও ভাল মনে পড়ছে না। বইটা দেখি তা হলে।—" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, মহা বিপদ উপস্থিত। রামনিধিকে পুলিসে দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই প্রধান সাক্ষী দিতে হইবে। একবার তিনি একটা বিবাহের মোকর্দ্দমায় শিউড়ীতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন—উকীলের জেরায় তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই অবধি উকীলগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, পুলিসে দিয়ে কাজ নেই—পুলিসে দিয়ে কাজ নেই। কালকে ওকে বোলো এখন যে আপনি অন্য বাসায় যান।"

শচীন্দ্রবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাড়াও। কাণ ধরে বের করে দাও। কাল কি? আজ—এই দণ্ডে—এখ্‌খুনি। এস।"

বাসার অন্য সকলেও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধির শয়নকক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উঠিলেন; বলিলেন, "শোন, শোন। আস্তে আস্তে ভাল কথায় বিদায় করে দাও। খবর্দার যেন গায়ে হাত তুলো না।"—পুলিসকোর্ট এবং উকীলের ভয়াবহ মূর্ত্তি বিভীষিকার ন্যায় ভট্টাচার্য্যের মনে ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

দেশী ও বিলাতী। ১৯১০

একটি ভৌতিক কাণ্ড

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি-এ পাস করিয়া চাকরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েক মাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনওরূপ ফল হইল না। অবশেষে শিউড়ী জেলাস্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহুলোকের খোসামদ করিয়া উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া আসিয়া, দুই দিন পরে নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোট খাট সস্তা বাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করি এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে সহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইলাম। বাড়ীটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে, স্থানে স্থানে ভগ্ন, তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচসিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়ীখানি পাওয়া যায় কিন্তু গুজব এই যে বাড়ীটিতে ভূত আছে। তখন আমি নব্য কলেজের ছোকরা—ইয়ং বেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ীটি লওয়াই স্থির

করিলাম। কিন্তু অতদূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে—চোর ডাকাতির ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন—তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি-এ পাস করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়ীটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়ীতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, কাজকর্ম্ম সারিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্ত্তী রবিবারে প্রাতে জিনিষপত্র লইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়ীটি বহুকালের নির্ম্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়ীটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়ীটি দ্বিতল, নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দুইখানি ঘর আছে, সেই ঘর দুইটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ীর পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী, তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ীর অল্প দূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান রন্ধনের জন্য সেই জল ভৃত্য আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেই সঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রভাতে পদব্রজে শিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতী বাঁধা থাকিত, হাতীশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে

সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং আপনার তপ-জপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ।"

আমি উত্তর করিলাম—"শিউড়ী স্কুলে আমার একটি মাষ্টারী চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড় খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

"সহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ী ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি এবং আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাষ্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় শিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি এমন সময় দেখি আমাদের গ্রামের একজন কৈবর্ত্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরে, তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল,—"আজ্ঞে, মাঠাকুরুণ চিঠি দিয়েছেন, আর এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"—বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতাঠাকুরাণী লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন,—'মা, তোমার ছেলে আজ প্রাতে শিউড়ী রওয়ানা

হইয়াছে, পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এক কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখ, যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোন রকম ভয় পায়, তবে যেন তারকব্রহ্মনাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।'—সুতরাং আমি দীনু কৈবর্ত্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্র রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম—"তুই আজ এইখানেই থাকবি ত? তোর খাবার যোগাড় করি?"

সে বলিল,—"আজ্ঞে না, মাঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ী মুড়্‌কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাবি।"—তাহার সম্মুখে কবচটি অমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয় চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দুইজনে কিয়ৎক্ষণ গল্প গুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমজড়িত চক্ষু অল্পে অল্পে খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিনের রোগে শীর্ণ, গালের

চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপ্‌সিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথার সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম, আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্ত্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল; মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রামকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্ত্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িত কণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারী বাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিয়ন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

পরম শুভাশীর্ব্বাদঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই নিশাগমের পূর্ব্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনওরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ

ঘটে তবে তারকব্রহ্মনাম জপ করিবে। সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—

নিয়ত আশীর্ব্বাদক
শ্রীরমাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারী বাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ী গিয়া প্রথমে মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব, এ কথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম, একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে। তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়ীতে ছিলাম, তবে আমার উপরই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

"তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম, পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে। কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোনও বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়াছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরি পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড় শত টাকা হইল। মফস্বলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথমে শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এপাশ ওপাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গোরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও বা দূরে দূরে কোথাও বা ঘন সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস বহিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গোরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে, তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না, বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটিল। আমার একটু একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম, আবার জাগিয়া উঠিতে লাগিলাম। হঠাৎ গোরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকানি দিয়া গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্ত্তি। গোরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ীর জোয়ালের উপর দুইটা শীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্ম্মাবৃত বৃদ্ধ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।

আমি কাঁপিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সেই মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গোরু দুইটা তখন গাড়ী পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল। যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথে দৌড়িতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু এ কি? গোরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলাম—"হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে, তাই ছুটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।" গাড়োয়ান তখন গাড়ী থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গোরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গোরুর গাড়ী দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গোরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক, আজ আর কায নাই, গোরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তারপর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব। আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরে লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দু বাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং অবিকল সত্য।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার।
সাকিম টগরা, জেলা বীরভূম।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সভাস্থ সকলে কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"ইন্দু বাবু, সে চিঠি দুখানি আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"সে ডাকের চিঠিখানির খাম আছে?"

"আছে।"

"ছাপ তারিখ ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাইত!"—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। সভাস্থ অপর সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

তখন সভাপতি মহাশয়, গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—"এর জন্যে আপনারা এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? উপেন্দ্র বাবু যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতি অক্ষর সত্য বলে মেনে নিলেও, ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।"

সভাস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন—"ভূত নয়, তবে কি?" সভাপতি মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ইলেকৃট্রিসিটি"। সভাস্থ সকলে আবার নীরবে বসিয়া রহিলেন। সভাপতি মহাশয় পুনরায় ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত গবেষণাপূর্ণ বাক্যগুলি বলিলেন—

"ভূত নয়, ইলেকট্রিসিটি। মানুষের আত্মা খানিকটা বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। গঙ্গার জল যখন বাড়ে, তখন কূল ছাপিয়েও অনেক দূর পর্য্যন্ত জল পৌঁছে যায়। গঙ্গা আবার যখন কমে, তখন কূলের বাইরে এখানে ওখানে জল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। সেটা গঙ্গার প্রবাহের অন্তর্গত না হলেও, গঙ্গারই একটা ভূতপূর্ব্ব অংশ। সেই রকম মানুষের আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি আছে? কোন কারণে আত্মার বিদ্যুৎ বৃদ্ধি হলে, মানুষের শরীর ছাপিয়ে বাইরেও খানিকটা এসে পড়ে। আবার যখন কমে, তখন আত্মা অর্থাৎ বিদ্যুতের কতক অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাইরে থেকে যায়। সেই বাইরের অংশ সর্ব্বদাই মানুষের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়। সে মানুষ যদি কুসংস্কারাপন্ন হয়, তবে তাই দেখে ভূত মনে করে এবং ভয় পায়।"

ইন্দুবাবু বলিলেন—"তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করাতে, সে ভূতই বলুন আর ইলেকৃট্রিসিটিই বলুন, অদৃশ্য হল কেন?"

সভাপতি মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন—"এইটে আর বুঝতে পারলেন

না? গঙ্গার জল আবার যখন বেড়ে উঠে, তখন কি হয়? সেই পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন অংশ প্রবাহের সঙ্গে আবার মিলে যায়, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। সেইরকম, তারকব্রহ্ম নাম জপ করাতে সেই বাবুটির আত্মা অর্থাৎ ইলেকৃট্রিসিটি হু হু করে বেড়ে উঠ্‌লো, আর অমনি বাইরের সেই বিচ্ছিন্ন অংশটুকু যাকে তিনি ভূত মনে করেছিলেন, ভিতরের অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে গেল।"

এই মীমাংসা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলের মুখে চক্ষে একটা বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনুচ্চস্বরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল—"সভাপতি মশাই কি সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন! আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল।"

ইন্দুবাবু বলিলেন—"আচ্ছা তবে সেই গোরু দুটো ওরকম করলে কেন? যদি বাস্তবিকই তারা কিছু না দেখে থাকবে, তবে ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল কেন?"

সভাপতি বলিলেন—"গোরুর দেহটি একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যুন্মান যন্ত্র অর্থাৎ গ্যাল্‌ভানোমিটার। অতি অল্প পরিমাণ ইলেকৃট্রিসিটি কাছে এলেও গোরু তৎক্ষণাৎ জানতে পারে। এই কারণেই গোরুকে হিন্দু ধর্ম্মে পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই মহাদেব এত জন্তু থাকৃতেও গোরুকেই তাঁর বাহনস্বরূপ নিযুক্ত করেছেন।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—"সে কথা খুবই ঠিক। গোরুই যে মহাদেবের বাহন তা শাস্ত্রেই লেখা আছে। তস্য প্রমাণং যথা—"

এমন সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল। বাচস্পতি মহাশয়ের প্রমাণ প্রয়োগে বাধা দিয়া সভাপতি বলিলেন—"অনেক রাত্রি হয়েছে। এবার সভাভঙ্গ করা যাক্।"

সভ্যগণ তখন উঠিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"মোহিত বাবুকে সে চিঠিখানা লিখে পাঠাতে মনে থাকবে ত?"

সভাপতি বলিলেন—"নিশ্চয়। কাল সকালে উঠেই চিঠি লিখে শিশির বাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

সভ্যগণ বাহিরে আসিলেন। অত্যন্ত অন্ধকার। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া সেই রাত্রে যাইতে অনেকেরই হৃদয়যন্ত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশ্য ভূতের ভয় নহে, কারণ

ভূত নাই; গাছ পালায় যদি কোথাও 'বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎখণ্ড' লুকাইয়া থাকে, এই মনে করিয়া মাত্র।

নবীন সন্ন্যাসী। ১৯১২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৩—১৯৩৮

ভালবাসা

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে কিম্বা মানুষ সখ করিয়া কাঁদে, কিম্বা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখনও পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া এক চোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটা-ফাটি কাণ্ডও বাধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শত হস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়; এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে; যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিত মুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া প্রশান্তভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে তাহাদের বুকখানা ফাটিয়া যাক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি

না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু বিসর্জন ভগবানপদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয় ত পাগল বলে, আমিও হয়ত পূর্ব্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ করা হয়।*

শুভদা। ১৯৩৮ (প্রকাশকাল)

শ্রীকান্ত

আমার এই 'ভব-ঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলে-বেলা হইতে এম্‌নি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে একটা 'ছি-ছি' শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এ সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইতেছে, হয়ত ঠিক ততই বড় ছিল না। মনে হইতেছে, হয় ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল-ছেলে হইয়া একজামিন্ পাশ করিবার সুবিধাও দেন না; গাড়ী-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয় ত তাহাদের কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সু-বুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এম্‌নি অসঙ্গত, খাপছাড়া এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার

* শরৎচন্দ্র বাল্যস্মৃতিতে বলিয়াছেন, তাঁহার "দ্বিতীয় বই শুভদা।"

বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া ধাক্কা খাইয়া ঠোক্কর খাইয়া, অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘ দিন আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক্। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া-চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি! গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্ব্বতকে পাহাড়-পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় থাক্—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারও মুখ-টুখ ত কখনও নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

শ্রীকান্ত (১ম পর্ব্ব) ১৯১৭

গৃহদাহ

সুরেশ পাশের গাড়ীতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার চেহারা তা সে যত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্ত্তে এই কি-একটা নূতন ষ্টেশনেই গাড়ী বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার গায়ের জামা সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার বার মুখ বাহির

করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই জানে, কিন্তু এ-কথা মন তাহার কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ গাড়ীতে তাহার স্বামী নাই—সে একেবারে অনন্য-নির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন এক দিগ্বিহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতে পারে না! এই গাড়ীতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন।

সুরেশ যাই হোক, এবং যাই করুক, একজন নিরপরাধ রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া এই অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দিবে, এত বড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এ সোজা কথাটুকু যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত ভালবাসার কথা আনিয়াছিল কোন্ মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই।

সহসা একটা প্রবল জলের ঝাপ্টা তাহার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল এবং ততক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই! বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে, অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাতে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে কম্পিতহস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গাড়ীর গতি অতি মন্দ হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ ষ্টেশন জানিবার উপায় নাই; তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশবাবু!

এই কামরায় জন-দুই বাঙ্গালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া

ছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয়ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর মত তীব্র আর্ত্তনাদের মত শুধু সুরেশকেই নয় উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা, তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ীর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনই একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখচি নে—কৈ তিনি? কোন্ গাড়ীতে তাঁকে তুলেচ?

চল দেখিয়ে দিচ্চি, বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল এবং যে দিক্ হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেই দিক্ পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল, ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূলুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং স্তব্ধমুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুললে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও-থাক্—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও—না হয়, শুধু ব'লে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্চি; বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ী ছেড়ে দিয়েচে দেখতে পাচ্চো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য। গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে নিরাশা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝেয়

লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? 'তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন ক'রে তোমার—

এত বড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকের ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপরে তাহার পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে পা দুটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এ কাজ আমি পারি ব'লে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি করেচ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বল; বলিয়া সে আর একবার তাহার পা দুটা ধরিয়া তাহারই পরে সজোরে মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু পা দুটো যাহার, সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ন্যায় কেবল নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারম্বার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনি ভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিল।

গৃহদাহ। ১৯২০

তাজমহল

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানি নে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই— সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানি নে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিও নে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর

অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখান। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্ম্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশি হতে পারে কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু, সে তাঁর ছিল না।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিম্বা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ্য। নইলে এম্‌নি সুন্দর-সৌধ তিনি যে-কোন-ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম্ম উপলক্ষ্য হ'লেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ-মানুষ-বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ্য হ'লেও এমনি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বারবার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের সে শ্রদ্ধার আসন আর থাকবে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয় সুন্দরও নয়!

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসী-কন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সম্বরণ করিতে

পারিল না, অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক্, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের পক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি মা!

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়-মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে। এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি?

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসি গে।

শেষ প্রশ্ন। ১৩৩৮

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৩২৯

আশা ও নৈরাশ্য

কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া সমুদ্রতরঙ্গ বেলাভূমির পাষাণ কাঠিন্যের উপর আসিয়া আছড়িয়া পড়িতেছে আবার ফিরিয়া যাইতেছে—বিরাম নাই, নৈরাশ্য নাই। বেলাভূমি ভাঙিয়া-চুরিয়া রূপান্তরিত করিয়া বিশাল ফেনায়িত ঊর্মিপ্রবাহ ফিরিয়া যায়—আবার পরক্ষণেই ফুলিয়া গর্জিয়া ছুটিয়া আসে—এই বহুভঙ্গিম অক্লান্ত চেষ্টার মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার,—মুক্তির আনন্দে ছুটিয়া যাইবার একটা পরম আগ্রহ সমস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যেও স্থির অচল হইয়া রহিয়াছে। মানুষের জীবনও তাহাই। যুগ যুগান্ত হইতে সমস্ত প্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে মানুষ ক্রমাগত বিদ্রোহ করিতেছে। বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। কোন সুখ, কোন দুঃখ—কোন আশা ও নৈরাশ্য মানুষের প্রকৃতিগত এই ধর্মকে বিলুপ্ত করিতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের

এই চেষ্টা অধিক প্রবল, অধিক ব্যাপক ও সুদীর্ঘরূপে প্রকাশ পায় জাতির জীবনে। ইতিহাসপথে পর্যটন করিলে দেখা যায় মানব পরিবারের প্রত্যেক জাতি নানাভাবে বন্ধনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে—জয় হউক, পরাজয় হউক, ভ্রূক্ষেপ নাই। মুক্তি চাই, মানুষের জন্য অপ্রতিহত স্বাধীনতা চাই—ইহাই মানব জীবনের চিরন্তন কামনা। যখন যে দেশে; যে জাতির মধ্যে বন্ধন ও দাসত্ব অতিমাত্রায় ঐকান্তিক হইয়া উঠে, যখন ব্যক্তিস্বাধীনতা পদে পদে প্রতিহত হয়, জাতির অস্বাভাবিক বিকাশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে—তখন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হইয়াই মানুষ ব্যষ্টি হিসাবেই হউক আর সমষ্টি হিসাবেই হউক, সে বাধা, সে বন্ধন চূর্ণ করিতে উদ্যত হয়। কোন ভীতির বিভীষিকা, কোন নির্মম অত্যাচার, সে ইচ্ছা, সে চেষ্টার গতিরোধ করিতে পারে না,—বন্ধন ও দাসত্বের তিক্ত অনুভূতি মানুষকে বিব্রত, অস্থির, অধীর করিয়া তোলে—বন্ধন অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই। আজ ভারতবর্ষের এই অবস্থা! সে বুঝিয়াছে, বাঁধন ছিঁড়িয়া, সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে স্বরাজ পাইতে হইবে।...

সম্পাদকীয়। ১৩২৯

ভোঁদড় নাচ

মডারেট ও 'হাঁ জী ইয়ে বাৎ সচ'এর দল ইতর-উল্লাসে দেশের চারিদিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে,—অসহযোগ আন্দোলনের দফা রফা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র মানস-সরোবর হইতে উত্থিত এই মন্দাকিনী ধারা "পাষাণ বন্ধ টুটিয়া" ঋজু, বক্র নানা ভঙ্গীতে দুকূল ভাঙিয়া গড়িয়া ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া পরম গৌরবে, স্বরাজ-সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ স্রোতাবর্তে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার বিলীন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই এক একটি অভাবনীয় অভিনব তরঙ্গফেন—শুভ্রশীর্ষ উন্নত করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে—বিরাম নাই, শান্তি নাই। যে ঘটনা ভারতের ইতিহাসে আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে—এখনি তাহার অবসানের কল্পনা করিতে পারি না।

একদিকে বলদর্পে উদ্ধত রাজ-কর্মচারিগণের রক্তভ্রূকুটি, অপরদিকে জনসাধারণের মনের কথা খুলিয়া বলিবার, একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার,

সর্বগ্রাসী সিডিসান আইন—মডারেটদল এই দুই অন্ধ ষণ্ডের উদ্যত শৃঙ্গের মধ্যস্থলে কি সুখে আছ, খুলিয়া বলিতে পার কি? পার না, পার না—ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যবসাজীবী রাজনৈতিক—এসব প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিতে পার নাই, পারিবেও না!…

'…ভারতের আত্মপুরুষ জাগ্রত! তিনি স্বদেশী ও বিদেশী পশুত্বের সহস্র লাঞ্ছনা, ধৈর্য-কঠিন বক্ষে ভৃগুপদচিহ্নের মত ধারণ করিবেন, তথাপি অননুতপ্ত অন্যায়ের সহযোগিতা করিবেন না, রিফর্মের রজ্জু গলদেশে লইয়া আত্মহত্যা করিবেন না! তিনি সাত্ত্বিক বল সম্বল করিয়া পশুবলের সম্মুখীন হইবেন। তিনি 'সিডিসান আইনে'র অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি ত্যাগ ও দুঃখের মূল্যে চিরকৃপণ আমলাতন্ত্রের শ্রদ্ধা ও অনুতাপ ক্রয় করিবেন! তিনি সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন সহজ উপায়ে সুলভ সাফল্য বাঞ্ছা করেন না! তিনি এবার মৃত্যুপণে, বিধাতার হস্ত হইতে অমৃতত্ব আহরণ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর কারাগমন তাহার শেষ নহে—আরম্ভ মাত্র। অন্ধ, জাগো! আর ভোঁদড় নাচিও না।

সম্পাদকীয়। ১৩ ৯

যুগান্তর

আমাদের কথা

'যুগান্তরে'র প্রথম যাত্রাপথে আমরা স্বদেশবাসীর আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

বাঙ্গলার জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সংবাদপত্র যেমন বাঙ্গলার মনুষ্যত্ব ও আত্মচেতনার পথে প্রেরণা জাগাইয়াছে, জাতীয় ভাবধারার প্রচার ও পুষ্টিবিধান করিয়াছে, বাংলা ও ভারতের অগ্রগামী চিন্তাধারাও তেমনই সংবাদপত্রকেও অগ্রসর করিয়াছে। কিন্তু যে লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া একদা বাঙ্গলা দেশ সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রথম হোতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য আজিও পূর্ণতা লাভ করে নাই, নবীন বাঙ্গলার ব্রত আজিও উদ্‌যাপিত হয় নাই। 'যুগান্তর'—এই নামের সঙ্গে যুবক বাঙ্গলার

জন্মান্তরের ইতিহাস বিজড়িত—চিন্তায় ও কর্মে, সাধনায় ও ধ্যানে সেদিনের বাঙ্গলা দেশ আপনার মধ্যে এক নূতনতর জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল। সেই যুগ হইতে আজিকার দিনের সময় হিসাবে কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু উহার লক্ষ্য স্থির, উহার দীপশিখা ভাবীকালের যজ্ঞশালায়ও অনির্ব্বাণ!

এই দীপালোকে আমরা যাত্রাপথে বাহির হইলাম। আমাদের চারিদিকে আজিও পুরাতন দিনের লাঞ্ছনা ও গ্লানি,—শাসকশক্তির যে ভ্রূকুটিভঙ্গী রুদ্রের আশীর্ব্বাদের মত বাঙ্গলায় যুগান্তর আনিয়াছিল, তাহার রোষকটাক্ষ আজিও মিলাইয়া যায় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহীর মত বাঙ্গলাদেশ বহু লাঞ্ছনায় ও নির্য্যাতনে জাতীয় পরাধীনতার মূল্য দিয়াছে। সেই মূল্যের বদলে যাহা আসিয়াছে, তাহা স্বাধীনতা নহে।

সম্পাদকীয়। ১৯৩৭

রবীন্দ্রনাথ

রোগমুক্তির পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশবাসীর নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাকেই বিচলিত করে নাই, তাঁহার দেশবাসীকেও অভিভূত করিয়াছে। স্বভাবজাত আন্তরিকতা উৎসারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যাহার জীবন তোমরা বাঁচাইয়া তুলিলে, তাহার জন-সেবার শক্তি যে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, অথচ তাহার দায়িত্বটা যে তেমনই থাকিয়া গেল।" দেশ সেবার জন্য এই আকুলতা, জনকল্যাণের এই সুগভীর অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসীর চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। তাই বয়সের হিসাবে অশক্ত হইলেও শুধু আলোকবর্ত্তিকারূপে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই দেশবাসীর এত ব্যাকুল প্রার্থনা।

সম্পাদকীয়। ১৯৩৭

সাংহাই সন্দেশ

আর কীল চড় নয়, এমন কি ঘুষিও নয়!—জাপান এক্ষণে সঙ্গীন কাঁধে করিয়া পরাক্রান্ত ইংরাজকে বলিতেছেন, "হঠ যাও! যদি রাজী না হও, তবে,—এস প্রস্তুত।" কিন্তু ইংরাজ নিঃশব্দ, নির্ব্বিকার!

ইংরাজের মুখে কথা নাই, কিন্তু পেটে পেটে নাকি ভয়ানক বুদ্ধি। সুতরাং গত সপ্তাহে যখন সাংহাইতে ইংরাজ পুলিশ সার্জেণ্ট পৃষ্ঠদেশে "মৃদু যষ্টি সঞ্চালন" কিঞ্চিৎ বেশী মাত্রায় অনুভব করিল, তখন মুখে তাঁহারা কিছুই বলিলেন না, কিন্তু লিখিত প্রতিবাদ জানাইলেন। তাহাতেও যখন ফল হইতেছে না, তখন স্বয়ং বৃটিশ পুলিশ বৃটিশ সরকারের উপর অভিমান করিয়াছেন। কয়েকজন কর্ম্মচারী কার্য্য হইতে ইস্তফা দিয়া বাঁচিয়াছেন! একখানি মার্কিণ পত্রিকা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিতেছেন, "বৃটিশ সরকার যখন আপন কর্ম্মচারীদের মান রাখিতে পারিতেছেন না, তখন বেচারাদের আর উপায় কি?" মার্কিণ চাচা দয়ার্দ্র বটে!

যুগান্তর। ১৯৩৮

শ্রীরাজশেখর বসু

১৮৮০—১৯৬০

ট্রেনে

বাংলার নদ-নদী ঝোপ-ঝাড়, পল্লী-কুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এ সব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পাঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম্, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner Sir, at Shikohabad? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু'পাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান বনানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-

পেট ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত্, ওয়া হমীন্ অস্ত্।

কজ্জলী (কচি-সংসদ)। ১৯২৭

নামতত্ত্ব

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক্? ষষ্ঠীতৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথ নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ রাজার রাজা। রাজেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্রও বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুংসংস্করণ। মোট কথা লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভাল হইলেই হইল। রাজা-মহারাজরা গাল-ভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা connotation। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনওরূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু

মল্লিকামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধ হয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নাম রূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালীদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে আসিবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনা, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন। এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায়, কিন্তু কোমল, নারীজনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিশ কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছু-কাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেমেদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসিস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতী বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা

সধবা বা বিধবা সূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধ হয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

লঘুগুরু। ১৯৩৯

ত্রিজটার স্বপ্ন

রাবণ চ'লে গেলে একজটা হরিজটা বিকটা দুর্মুখী প্রভৃতি রাক্ষসীগণ সীতাকে বললে, ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি পুলস্ত্য যাঁর পিতামহ, মহর্ষি বিশ্রবা যাঁর পিতা, সেই মহাত্মা দশগ্রীব রাবণের ভার্যা হওয়া কি গৌরবের বিষয় মনে কর না? যিনি ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতাকে পরাজিত করেছেন, তাঁর ভার্যা হওয়া অবশ্যই তোমার উচিত। রাবণ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পত্নীকেও ত্যাগ ক'রে তোমার অনুরক্ত হবেন। নাগ গন্ধর্ব ও দানবগণকে যিনি বহুবার পরাজিত করেছেন তিনিই প্রণয়প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছিলেন। যাঁর ভয়ে সূর্য তাপ দেন না, বায়ু প্রবাহিত হন না, তরু পুষ্পবৃষ্টি করে, শৈল ও মেঘ বারিদান করে, সেই রাজাধিরাজের পত্নী হ'তে তোমার ইচ্ছা হয় না? আমরা তোমাকে ভাল কথা বলছি শোন, নয়তো তোমাকে মরতে হবে।

সীতা বললেন, মানুষী কখনও রাক্ষসের ভার্যা হ'তে পারে না। তোমরা বরং আমাকে ভক্ষণ কর, তোমাদের কথা আমি শুনব না। রাক্ষসীরা ক্রোধে পরশু[১] উদ্যত ক'রে লম্বিত ওষ্ঠ লেহন করতে করতে বললে, রাক্ষসপতি রাবণের ভার্যা হবার যোগ্য এ নয়। বিনতা নামে এক করালদর্শনা লম্বোদরী রাক্ষসী বললে, সীতা, তুমি যথেষ্ট পতিপ্রেম দেখিয়েছ, সকল বিষয়েরই

---

১ টাঙ্গি

অতিবৃদ্ধি হ'লে বিপদ হয়। তুমি মানুষের যা কর্তব্য তা করেছ, তাতে আমরা সন্তুষ্ট। এখন আমাদের হিতবাক্য শোন, রাবণকে পতিরূপে ভজনা কর, সর্বলোকের অধীশ্বরী হও, দীন গতায়ু রামকে নিয়ে কি হবে? যদি আমাদের কথা না রাখ তবে এই মুহূর্তেই আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলব।

লম্বিতস্তনী বিকটা মুষ্টি তুলে বললে, মৈথিলী, আমরা দয়া ক'রে তোমার অনেক অন্যায় কথা সয়েছি, এখন আমাদের হিতবাক্য যদি না শোন তো ভাল হবে না। দুর্গম সমুদ্র পার ক'রে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, আমরা তোমাকে পাহারা দিচ্ছি, স্বয়ং পুরন্দরও তোমাকে পরিত্রাণ করতে পারবেন না। আর অশ্রুপাত করো না, শোক ত্যাগ কর, যৌবন থাকতে থাকতেই রাবণের প্রিয়া হয়ে সর্ব সুখ ভোগ কর। যদি কথা না শোন তবে তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন ক'রে ভক্ষণ করব।

চণ্ডোদরী তার শূল ঘুরিয়ে বললে, আমার সাধ হচ্ছে এর যকৃৎ প্লীহা বক্ষ মুণ্ড সমস্তই খাই। প্রঘসা বললে, আমরা একে গলা টিপে মারব। অজামুখী বললে, বিবাদের প্রয়োজন কি, এস আমরা সবাই এর মাংস ভাগ করে খাই। শূর্পনখা[২] বললে, আমারও সেই মত,—

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্বশোকবিনাশিনী ॥
মানুষং মাংসমাসাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্। (২৪।৪৪-৪৫)

—সর্বশোকবিনাশিনী সুরা শীঘ্র নিয়ে এস, মানুষের মাংস খেয়ে নিকুম্ভিলার[৩] কাছে নাচব।

শোকে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে সীতা বিলাপ করতে লাগলেন—আমার হৃদয় লৌহনির্মিত অজর অমর, তাই এত দুঃখেও বিদীর্ণ হচ্ছে না। ধিক, আমি অনার্য অসতী, সেজন্য রামের বিরহেও এই পাপজীবন ধারণ ক'রে আছি। রাক্ষসীগণ, কেন প্রলাপ বকছ, ছিন্ন ভিন্ন বা দগ্ধ করলেও আমি রাবণের কথা শুনব না। আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি জানলেই রাম এই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন, রাক্ষসীরা অনাথা হয়ে গৃহে গৃহে আমার মতই রোদন করবে।

রাক্ষসীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, সীতা, আর এক মাস অপেক্ষা কর, তার পর আমরা মনের সুখে তোমার মাংস খাব। এমন সময় ত্রিজটা নামে

২ 'তিলক' টীকাকার বলেন, এ রাবণভগিনী নয়।

৩ লঙ্কার এক দেবী; যে গুহায় তাঁর মন্দির তারও এই নাম

এক বৃদ্ধা রাক্ষসী নিদ্রা থেকে উঠে বললে, তোমরা এই জনকতনয়া দশরথ-পুত্রবধূ সীতাকে না খেয়ে পরস্পরকে খাও। আমি আজ রোমহর্ষকর দারুণ স্বপ্ন দেখেছি যে রাক্ষসদের ধ্বংস হবে, সীতাপতির জয় হবে।

রাক্ষসীরা স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে ত্রিজটা বললে, আমি দেখলাম, সহস্র-অশ্ব-যোজিত আকাশগামী দিব্য যানে রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন, তাঁদের গলায় শুক্ল মাল্য, পরিধানে শুভ্র বসন। সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত পর্বতে শ্বেতবসনা সীতা ব'সে আছেন, তাঁর সঙ্গে রামের মিলন হ'ল। আবার দেখলাম, লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম এক চতুর্দন্ত পর্বতাকার মহাগজে চ'ড়ে সীতার কাছে এলেন, সীতা রামের ক্রোড় থেকে উঠে হস্তীর স্কন্ধে ব'সে হাত দিয়ে চন্দ্র সূর্য স্পর্শ করলেন। আবার দেখলাম, রাম-লক্ষ্মণ অষ্ট-শ্বেত-বৃষভ-বাহিত রথে চ'ড়ে লঙ্কায় সীতার কাছে এলেন এবং তাঁকে পুষ্পক রথে নিয়ে উত্তর দিকে গেলেন। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত ও তৈলাক্ত, তিনি রক্ত বসন প'রে করবীর মালা গলায় দিয়ে উন্মত্ত হয়ে পুষ্পক রথ থেকে ভূতলে প'ড়ে গেছেন। আবার, তিনি কৃষ্ণ বসন প'রে রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে খর-বাহিত রথে ব'সে আছেন, এক রমণী তাকে টানছে। রাবণ উদ্‌ভ্রান্ত তৈলপান করেছেন, হাসছেন আর নাচছেন, এবং গর্দভে চ'ড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। তিনি ভয়াকুল হ'য়ে মাথা নীচু ক'রে গর্দভ থেকে প'ড়ে গিয়ে আবার উঠলেন। তার পর তিনি উন্মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে দুর্বাক্য বলতে বলতে নরকতুল্য ঘোর অন্ধকার দুর্গম মলপঙ্কে নিমগ্ন হলেন এবং তা থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে এক অকর্দম হ্রদে এলেন। একজন কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত দেহে এল এবং দশাননের গলায় দড়ি বেঁধে তাঁকে দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে চলল। আরও দেখলাম, কুম্ভকর্ণ এবং রাবণের পুত্র মুণ্ডিতমস্তকে তৈল মেখেছেন, রাবণ ইন্দ্রজিৎ আর কুম্ভকর্ণ যথাক্রমে বরাহ শিশুমার[৪] আর উষ্ট্রে চ'ড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। কেবল বিভীষণের মস্তকে শ্বেত ছত্র, তিনি চার জন সচিবের সঙ্গে আকাশে উঠেছেন, তাঁর সম্মুখে মহাসভায় গীতবাদ্যের রব হচ্ছে। রমণীয় লঙ্কাপুরী চূর্ণ হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে, ভস্মীভূত লঙ্কার রাক্ষসীরা তৈলপান ক'রে বিকট হাস্য করছে, কুম্ভকর্ণাদি সকলেই রক্তবাস প'রে গোময়হ্রদে প্রবিষ্ট হয়েছেন। রাক্ষসীগণ, তোমরা পালাও, সীতাকে উদ্ধার ক'রে রাম তোমাদের সকলকে মারবেন,

---

৪ শুশুক

তোমরা তাঁর প্রিয়া বৈদেহীকে তর্জন আর ভর্ৎসনা করেছ, রাম তা সইবেন না। যে স্বপ্ন দেখেছি তাতে সীতার সমস্ত দুঃখের অবসান এবং অভীষ্টলাভ সূচিত হচ্ছে। এখন এঁকে সান্ত্বনা দাও, ক্ষমা চাও, প্রণিপাত ক'রে প্রসন্ন কর, ইনিই তোমাদের ত্রাণ করবেন। এই দেখ, এঁর পদ্মপলাশতুল্য আয়ত বাম নেত্র স্ফুরিত হচ্ছে, বাম বাহু রোমাঞ্চিত হচ্ছে, বাম ঊরু স্পন্দন করছে, পক্ষীরা শাখায় ব'সে শান্ত স্বরে ডেকে যেন রামাগমনের সংকেত করছে।

লজ্জাবতী সীতা হৃষ্ট হয়ে বললেন, তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে আমি তোমাদের রক্ষা করব।

সা বীতশোকা ব্যপনীততন্দ্রা
শান্তজ্বরা হর্ষবিবুদ্ধসত্ত্বা।
অশোভতার্যা বদনেন শুক্লে
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন ॥ (২৯।৮)

—সীতার শোক জড়তা ও মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি আনন্দে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শুক্লপক্ষে চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত রজনীর প্রফুল্লবদনে শোভিত হলেন।

বাল্মীকি-রামায়। ১৩৫৩

গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন—কৃষ্ণকে অভিশাপ

ব্যাসের আজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরাদি কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী ক'রে কৌরব-নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। রুদ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন ক'রে রক্তাক্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই যে, নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষ্মণজননী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে করাঘাত ক'রে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক দেখে অনেকে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃধ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ

শোন। শ্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মুখমণ্ডলের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাঁকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ অধিক শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদুহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ ক'রে বলছেন, বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের কুলস্ত্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ভূতলে প'ড়ে গেছেন, শ্বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছে। গৃধ্র ও শৃগালগণ সিন্ধুসৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দুঃশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে ঊর্ধ্বরেতা সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপী শোকে বিহ্বল হয়ে পতির সেবা করছেন, জটাধারী ব্রাহ্মণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে শকুনগণ বেষ্টন ক'রে আছে, এই দুর্বুদ্ধিও অস্ত্রাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন!

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুসূদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে? তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পতির শুশ্রূষা করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার জ্ঞাতিগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহীন পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে।

মহাভারত। ১৩৫৬

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২—১৯২২

সবাই-রাজার-দেশ

বাইশ শো বছরের কথা। সুপ্ত স্মৃতির বাইশ কৌটোর ভিতরকার জিনিস। সাত পুরুষের বহু পূর্ব্বের, তোমার আমার সত্তর পুরুষ আগেকার কাহিনী। আকাশে সপ্তর্ষি তখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে; আর, মর্ত্ত্যে আর্য্যাবর্ত্তে, মগধের সিংহাসনে, আর্য্য শূদ্র মহাপদ্ম নন্দের সন্তান, মহারাজ দশসিদ্ধিক নন্দ, তখন মহামহিমায় বিরাজ করছেন। চারলাখী শহর পাটলিপুত্র তাঁর রাজধানী। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী থেকে চম্পানগরের চাঁপার জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য। তিন লাখ তাঁর সৈন্য, আর দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।

আমরা যে সময়কার কথা বল্‌ছি তখন এই দশসিদ্ধিক নন্দের চতুরঙ্গ সেনার ডঙ্কা ধ্বনিতে চির-বিদ্রোহী ও চির-স্বাধীনতাপ্রিয় বৈশালী নগরের দ্বার-গ্রাম পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর, চীনাংশুকের তৈরী—রক্তমাখা চিলের ডানার মতন—মগধসম্রাটের বিজয়োদ্ধত নিশানগুলো যেন বৈশালী-বাসীদের শেষ স্বাধীনতাটুকু মাংসের টুক্‌রোর মতন ছোঁ দিয়ে কেড়ে' নেবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। নগর ঘেরাও করে' মগধের সেনা থানা পেড়েছে। আর অপর পক্ষ ক্রমাগত হট্‌তে হট্‌তে, পদে পদে হার মেনে', শেষে বৈশালী রাজ্যের স্বয়ম্প্রভুতার শেষ আশ্রম দুর্ভেদ্য বজ্রক-দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়ে, তার চার তোরণে ইন্দ্রকীলক এঁটে দিয়ে, মৃত্যু বা জয়ের প্রতীক্ষায় দিন গুন্‌ছে।

দুর্গের চারিদিকে ত্রিশ হাত চওড়া বিশ হাত গভীর পরিখা; পরিখায় পোষা কুমীরের দঙ্গল। তারপর কাঁটার বেড়া। তারপর জানুভঞ্জনী ত্রিশূলের বেড়া। এত সত্ত্বেও মগধ-সৈন্যের চেষ্টার ত্রুটি নাই। নগরবাসীরা তাদের উপর কখনো বা যন্ত্র-সাহায্যে যমদণ্ডের মতন গুরুভার লোহার সজারু দেবদণ্ড নিক্ষেপ করে' একসঙ্গে অনেককে জখম কর্‌ছে, কখনো বা উপর থেকে তপ্ত তেল ঢেলে' মনের ঝাল মেটাচ্ছে, আবার কখনো বা রাশি রাশি এঁটো পাতা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যঙ্গ কর্‌ছে। আর তার জবাবে মগধসেনা যে অস্ত্রবৃষ্টি কর্‌ছে তা দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে' ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়িয়ে নিচ্ছে এবং সময় বুঝে প্রয়োগ কর্‌তেও ত্রুটি কর্‌ছে না।

দিনের পর দিন ; এম্‌নি করে' আশী দিন কেটে গেল ; মগধ-সেনা বজ্রক দুর্গের চল্লিশ হাত চওড়া কোমর-কোঠার একখানা পাথরও খসাতে পার্‌লে না। কত দুরন্দাজ কত যন্ত্রপাষাণ প্রয়োগ কর্‌লে, কত তীরন্দাজ তীর বৃষ্টি কর্‌লে। সব ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তাই বলে' মগধ-পল্টনের ঘাঁটি ওঠাবার লক্ষণও দেখা গেল না।

এদিকে দুর্গের ভিতরে দুর্ভিক্ষ উঁকি দিতে সুরু করেছে, সঞ্চিত খাদ্যের অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই! দুর্গের ভিতরকার তালের-গুঁড়িবিছানো গোটা-কয়েক রথ্যার তাল-গাছের তৈরী পাঁজরা খুলে' ফেলে' সেখানে ধানের চাষ দেওয়া হয়েছিল, জলের অল্পতায় তা শুকিয়ে গেছে। নগরের মেয়েরা স্বেচ্ছায় একাহারব্রত গ্রহণ কর্‌লে ; তার পর বৃদ্ধেরা ; তার পর সকলেই ঐ ব্রতে ব্রতী হ'ল। দেশাত্মবোধ যাদের জেগেছে তাদের এই ধারা। দেশের কল্যাণে এই সবাই-রাজার-দেশের প্রত্যেক লোকই স্বেচ্ছায় কষ্ট বরণ করে' নিলে, তবু দুর্গের দরজা খুল্‌তে রাজী হ'ল না।

মগধের চর তীরের মুখে চিঠি পাঠিয়ে অনেক প্রলোভন দেখিয়েও ও-কাজে কাউকে সম্মত কর্‌তে পার্‌লে না। কারণ বৈশালী সবাই-রাজার-দেশ, এখানে সবাই মাথা উঁচু করে' চলে, বল্‌বার কথা স্পষ্ট বলে, কর্‌বার কাজ সহজেই কর্‌তে জানে। সবাই জানে এ-দেশ আমার। এর অভ্যুদয়ে আমার উন্নতি, এর আদর্শে আমার উল্লাস, এর গৌরবে আমার নিজেরই গৌরব। সে গৌরবের চেয়ে বড় কিছু লোভের সামগ্রী মানুষে যে মানুষকে দিতে পারে সে কথা এরা বিশ্বাস করে না। তাই মগধের পক্ষ থেকে প্রলোভনের চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হ'য়ে গেল। যুদ্ধের সময় এরা সবাই মিলে যুদ্ধ করে, লুটের ধন সবাই মিলে ভাগ করে' নেয়। শান্তির দিনে সবাই মিলে চাষ করে, সবাই মিলে তাঁত বোনে, আবার সবাই মিলে পঞ্চায়তের সন্থাগারে বসে' প্রয়োজন-মত বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনও করে। এদের রাজা নেই ; তাই বলে' অরাজক বল্‌তে যে বিশৃঙ্খলা বোঝায় বৈশালীর সর্ব্বরাজক তন্ত্রের শাসনে তার নাম-গন্ধও নেই। নগরজ্যেষ্ঠকে এরা রাজার মতন মানে। সকলের সম্মতিতে ইনি নির্ব্বাচিত হন। তাই এঁর আর-এক নাম মহাসম্মত। মহাসম্মতের একলার ইচ্ছায় কোনো কাজ হয় না। কারণ এ সবাই-রাজার-দেশ, সকলেরই মতামত জান্‌তে হয়, মানতে হয়। মতভেদ হ'লে এরা নাম-গুটিকার সাহায্যে সংবহুল করে, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে বহুলোকের মত যে পক্ষে,

সেই পক্ষের মতই গ্রহণ করে। যে পক্ষ হেরে' যায়, সংবহুল করার রীতিকে মান্য করে বলে', তারাও অধিকাংশের মতকেই শিরোধার্য্য করে' নেয়। তাই দলাদলি বড় একটা ঘটে না, রেষারেষির বড় একটা অবকাশ নেই। তাই এরা দুর্জ্জয়, ঐক্যের বলে দুর্জ্জয়, অবস্থার সাম্যে দুর্জ্জয়, ব্যবস্থার গুণে দুর্দ্ধর্ষ। শাক্য বুদ্ধ এদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন, অজাতশত্রু এদের জয় করেছিলেন মাত্র, বশ করতে পারেন নি। তার পর থেকে মগধের সিংহাসনে যিনিই বসেছেন, এই সবাই-রাজার-দেশের স্বদেশনিষ্ঠ স্বাধীনচেতা মানুষগুলিকে বাগ মানাতে তাঁদের সকলকেই বেগ পেতে হয়েছে। অজাতশত্রুর সময়েও যেমন, দর্শসিদ্ধিক নন্দের সময়েও তেম্‌নি। এরা পাহাড়ীদের মগধের বিরুদ্ধে টুইয়ে দেয়, বনচরদের ক্ষেপিয়ে তোলে। দু'দুটো শতাব্দী কেটে গেছে। বৈশালীর মতি-গতির তবু পরিবর্ত্তন হয় নি। এদের সৈন্যবল অল্প, কিন্তু মনের তেজ অপ্রমেয়।

সীমা-সাক্ষী

"সন্ধি চিরস্থায়ী কর্‌তে হ'লে সীমান্তে দুই তরফের সীমা-সাক্ষী পোঁতা আবশ্যক। তা হ'লে আর কেউ সীমা লঙ্ঘন কর্‌তে সাহস করবে না।"

"সীমা-সাক্ষী, সে আবার কি?"

"সীমা-সাক্ষী জানেন না? যাদের মধ্যে সন্ধি পাকা হবে তাদের দুই তরফের দু'জন জীয়ন্ত লোককে দুটো গর্ত্ত কেটে পিঠোপিঠিভাবে পুঁতে ফেলা হয়। পাহাড়ীদের বিশ্বাস এরা ম'রে ভূত হ'য়ে নিজের নিজের স্বদেশের সীমা রক্ষা করে। জীয়ন্ত বিদেশী বা বিদেশীর ভূত কাউকে নিজের এলাকায় ঢুকতে দেয় না। এদেরি বলে সীমা-সাক্ষী। পাহাড়ীরা এদের প্রাণান্তে চটায় না। এ-কথা আমি পাহাড়ীদের মুখে অনেকবার শুনেছি। আমার বিবেচনায় এরূপ একটা অনুষ্ঠান ক'রে রাখা মন্দ নয়। পরে অনেক উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে।"

চন্দ্রগুপ্ত সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লেন—"না, না, না; সে হ'তে পার্‌বে না! তুমি বল কি গোপরাজ, যুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণের হানি অনেক ক'রে ফেলা যায়, তাই ব'লে সুস্থচিত্তে হত্যা তো আর কর্‌তে পারিনে।"

"আমিই কি হত্যা কর্‌তে বল্‌ছি?...তবে দণ্ডনীয় কেউ থাক্‌লে, তাকে

দণ্ডও দেওয়া যেত অথচ পাহাড়ীদের মনের উপরে সীমা-সাক্ষীর স্বাক্ষরটাও উজ্জ্বল হ'য়ে থাকৃত। কারণ, সন্ধির সর্ত্ত ওদের দিয়ে মানাতে হ'লে, ওরা মানে এমনি ধারা মন্তরই ত চাই...”

প্রবাসী (ডঙ্কা-নিশান)। ১৩৩০

সতীশচন্দ্র রায়

১৮৮২—১৯০৪

রসাতল

রসাতল আর কিছুই নয়, রসাতল একটি মনোরম কবিকল্পনা। একটি গাছকে পোষণ করিতে বাহিরের বায়ু এবং আলো—এবং মাটির অন্ধকারের ভিতরে সুশীতল রসের দরকার—আর এই প্রকাণ্ড সৌরজগৎরূপ গাছটিকে পোষণ করিতে রসের প্রয়োজন হইবে না ?—তেজের প্রয়োজন হইবে না ? কবিগণ যখন ধ্যানের দ্বারা এই রসের আভাস পাইলেন, গ্রহ উপগ্রহে শোভিত সৌরজগতের সৌন্দর্য্য, বিশালত্ব এবং তেজস্বিতার আধার ভাবটি যখন তাঁহাদের মনটিকে পূর্ণ করিল, তখন সেই তেজ এবং রসের আনন্দে তাঁহারা নানা বিচিত্র কল্পনা দ্বারা এই রসভাবটি প্রকাশ করিলেন, এই তেজের ক্রীড়া ব্যক্ত করিলেন।

রসাতলই সেই অতল রসের ভাণ্ডার যেখান হইতে রস টানিয়া এই সৌরজগৎ একটি গাছের মত বিকশিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছের যেমন শিকড় মাটির মধ্যে থাকে,—সেখানে মাটি তাহাকে প্রত্যহ রস পান করাইয়া পুষ্ট করে, তেমনি সৌরজগতের মূল রসাতলের মধ্যে গিয়া নামিয়াছে। এই জগতের উপরে আলোক বিদ্যুতে বিকীর্ণ যে তেজ দেখিতেছ—সেও রসাতলের গোপন-কক্ষে আপনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে : এবং পৃথিবীর উপরে যে বৎসরের অংশে অংশে ঋতুর বিচিত্র ছবি দেখিতেছ, ইহাও সেইখানকার একটি মূল ছবিরই প্রতিবিম্ব, এবং পৃথিবীর নিত্য নূতন দিবা রাত্রিও সেখানকার একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলামাত্র। এই পৃথিবী, এই সূর্য্যমণ্ডল নানা ক্ষয়সত্ত্বেও যে প্রতিদিন সজীব রহিয়াছে ঋষি-কবিগণ সেই সজীবতার মধ্যে যে ঐশী-শক্তি দেখিতে পাইতেন তাহাকেই বলিতেন দেবতা অশ্বিনীকুমার। জগতের

স্বাস্থ্যের তরুণ দেবতাযুগল অশ্বিনীকুমারও সেই রসাতলে তাঁহাদের তেজোময় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

বাস্তবিক রসাতলের ভাণ্ডারে জগৎ পোষণ করিবার জন্য নানা আশ্চর্য্য জিনিষ সঞ্চিত রহিয়াছে। তাই এই রসাতল ভয়ঙ্কর। এখানে কেহ যাইতে পারে না। ভীষণ নাগগণ চারিদিকে মহাতেজে শ্বসিয়া বেড়াইতেছে—পৃথিবীর এবং সমুদ্রের সমস্ত রত্নরাশিকে পাহারা দিয়া রাখিতেছে। রসাতলের উপরে কোথাও সর্ব্বদাই মেঘের মত মলিন আলো ঘনাইয়া আছে—মাঝে মাঝে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে; কোথাও বা স্থির বিদ্যুৎ তীব্রসুন্দর আলো দান করিতেছে। এখানকার বায়ুও স্থির। আমাদের বায়ুর মত চঞ্চল নহে। সর্ব্বদাই অত্যন্ত শীতল ভাবে ধীরে ধীরে বহিতেছে। রসাতলের চারিদিক হইতে একত্রিত লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনির মত গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে।

এই রসাতলের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই উতঙ্ক সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন। উতঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

তোমরা বুঝিতে পার উতঙ্কের মনটি তখন কি একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকার, সেই গর্জ্জন শব্দ, তার উপরে আবার মনের ভয় এবং কষ্ট। অনেকক্ষণ কষ্টের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া, ব্রহ্মচারী তাঁহার ধীর মনটিকে একাগ্রতম করিয়া ইন্দ্রের ধ্যানে বসিলেন।

গভীর ধ্যানের শক্তি থাকিলেই দেবতাকে পাওয়া যায়; কারণ, দেবতার করুণা আমাদের চারিদিকে চিরকাল রহিয়াছে। উতঙ্ক ব্রহ্মচারী, গভীর ধ্যানের শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

উতঙ্ক যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন তখন একটা ভীষণ শব্দ হইয়া উতঙ্কের ডান দিকে কিছুদূরে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া যেন একটা অগ্নিশিখার আলো প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার কানে গম্ভীর শব্দে দৈববাণী হইল "উতঙ্ক এই কক্ষে প্রবেশ কর।"

উতঙ্ক উঠিয়াই সেই উজ্জ্বল সুন্দর আলোক-শিখাটিকে দেখিতে পাইলেন, চমকিয়া উঠিলেন। তখনি তাঁর মন আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি কতদিন রাত্রিশেষের অন্ধকারের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির বন্দনা করিতে গিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ রসাতলের অন্ধকারে এই বিরাট অগ্নিশিখার আলোকে নিমেষে তাঁর প্রাণ যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

উতঙ্ক দীর্ঘচ্ছন্দে এক অগ্নিবন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন অগ্নিশিখা কোথাও নাই একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণময় দ্বার ঐরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে।

উতঙ্ক বড়ই লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন, "হায়, সোনার দুয়ারটাকে অগ্নি ভাবিয়া বন্দনা করিলাম! কিন্তু আমার বন্দনা কখনো বৃথা হইবে না, নিশ্চয় এই কক্ষমধ্যে অগ্নিদেবের দেখা পাইব।" উতঙ্ক স্বর্ণময়-দ্বারে আঘাত করিলেন। ছুঁইবামাত্র একটা প্রবল বাতাস তুলিয়া দুয়ারটা খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিয়া উতঙ্ক এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

দেখিতে পাইলেন শুভ্র আলোকে পরিপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড ঘর—তাহার মাঝখানে প্রজ্বলিত বহ্নির মত তেজস্বী একটি ঘোড়া তাহার সুদৃঢ় সুন্দর তেজঃপূর্ণ ঘাড়টি তুলিয়া বড় বড় চক্ষু দুটি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘোড়ার কেশর ধরিয়া এক বলবান্ পুরুষ তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বিচিত্রবেশধারী ছয়টি পরম সুন্দর বালক মত্ত হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরণের কাপড় ছাড়িয়া একখানি নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেছে। কিছুদূরে স্বর্ণাসনে বসিয়া দুইটি পরমাসুন্দরী যুবতী, তাহাদেরি অঙ্গের গৌরবর্ণের মত উজ্জ্বল এবং তাহাদেরি চুলের মত কালো—এই দুই রঙের সূতা মিশাইয়া একটি তাঁতের উপরে নিমেষে নিমেষে এক একটি কাপড় বুনিয়া ঐ শিশুগুলির গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে—তাহারা হাসিয়া হাসিয়া এই কাপড়ই কুড়াইয়া লইয়া পরিতেছে। একপাশে দুইটি তরুণ তেজস্বী দেবতা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

উতঙ্ক আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্য হইয়া এ ছবি দেখিতে লাগিলেন। ঐ তরুণ দেবতা দুটিকে এমন বলবান বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ আগুনের মত তেজস্বী ঘোড়াটিকে তাহারা অনায়াসে দৌড়াইয়া আনিতে পারে। তাহাদের শরীর দুটি এমনি আলস্যশূন্য সোজাভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বাহুদুটি এমন সরল ভাবে রহিয়াছে, যে মনে হয় যেন এখনি উহারা লাফ দিয়া উঠিয়া কোন সিংহের ঘাড়ে গিয়া পড়িবে—অথচ মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে একটি মৃদুহাস্য হাসিয়া দেবতা দুটি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

উতঙ্ক, ঘোড়ার কাছে যে পুরুষটি দাঁড়াইয়া আছে তার দিকে চাহিলেন। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেই উতঙ্ক বুঝিতে পারিলেন, এই পুরুষই সেই যিনি বৃষে চড়িয়া মাঠের মধ্যে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন।

উতঙ্ক কিছু বলিতে না বলিতেই পুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বৎস, এই অশ্বটিকে বাহিরে লইয়া যাও; ইহার নাসারন্ধ্রে এক ফুৎকার প্রদান কর, তোমার কুণ্ডল পাইবে।"

উতঙ্ক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত হইয়া ঘোড়াটিকে বাহিরে লইয়া গিয়া পুরুষের আদেশমত উহার নাসারন্ধ্রে এক প্রবল ফুৎকার লাগাইয়া দিলেন। ফুঁ দিতেই অশ্বের সমস্ত শরীরের রোম দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রমে বোধ হইতে লাগিল যেন রোমশিখা হইতে আগুন বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই হাহা করিয়া আগুন ছুটিল। কোন শব্দ নাই—নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দ অগ্নি সমস্ত রসাতলে ছড়াইয়া পড়িল—রসাতল তপ্ত হইয়া উঠিল। উতঙ্কের গায়ে আগুন লাগিল না। উতঙ্ক উচৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এইবার আমার অগ্নি বন্দনা সফল হইল। হে তেজস্বী বৈশ্বানর তোমাকে নমস্কার, সুন্দর জাতবেদা তোমাকে নমস্কার! বলবান অগ্নি আমাদিগকে সোনার রথে চড়াইয়া জগতের মূলে লইয়া যাইবেন। অগ্নিদেব তোমার আসনই বুঝি এই নিগূঢ় রসাতলে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে—হে মহান্ তোমাকে নমস্কার।" আনন্দে স্তব শেষ করিরা সেই পলাশের মত রাঙা, নিঃশব্দ, বিস্তীর্ণ, কম্পমান অগ্নির আভায় উজ্জ্বল ললাট উচ্চ করিয়া উতঙ্ক সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভীষণ অগ্নির তাপে পাগল হইয়া তক্ষক ঘাড় লম্বা করিয়া তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল,—সোনার ফুলের মত ঝলমল সেই স্থূল কুণ্ডলটি উতঙ্কের পায়ের কাছে ফেলিয়া তখনি আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মুহূর্তে সমস্ত আগুন গুটাইয়া আসিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উতঙ্ক পায়ের কাছ হইতে কুণ্ডল তুলিয়া লইয়া কি বলিতে যাইবে—সহসা কোথায় রসাতল, কোথায় কি? উতঙ্ক দেখিতে পাইল চারিদিকে নূতন প্রভাতের রৌদ্র পড়িয়াছে, পাতার শিশির এখনো শুকায় নাই, সম্মুখেই তাহার গুরুর আশ্রমের পাশে ছোট্ট নদীটি বহিয়া যাইতেছে, পাখীরা গোলমাল করিতেছে।

গুরুদক্ষিণা। ১৯০৪

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১৮৮৪—১৯৬১

কাব্যের ফল

কিন্তু জীবন যেমন যেমন নূতন 'সঞ্চারী ভাব'-এর সৃষ্টি করে, পুরাতন 'সঞ্চারী ভাব'-এর তেমন ধ্বংসও করে। যে-সব ভাব মনের মৌলিক উপাদান নয়, জটিল যৌগিক সৃষ্টি—জীবনের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাদের জন্ম হয়, এবং তার পরিবর্তনে এদের বিলোপ ঘটে। এরা হচ্ছে মনের 'আনস্টেবল কম্পাউণ্ড'। সেইজন্য প্রাচীন কবিদের কাব্যের অনেক অংশ আমাদের মনের রসের তারে ঠিক তেমন ঘা দেয় না, যা তা প্রাচীনদের মনে নিশ্চয় দিত। যে ভাবের উপর সে রসের প্রতিষ্ঠা ছিল, আমাদের মন থেকে সে ভাব একবারে লোপ না হলেও ঠিক তেমনটি নেই। এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, মধ্যযুগের খ্রীস্টান কাব্যরসিক দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-তে যে রস পেতেন, এ যুগের খ্রীস্টান অখ্রীস্টান কোনো কাব্যরসিক ঠিক সে রস পান না। ও-কাব্যে যেটুকু 'স্থায়ী ভাব'-এর রসে রূপান্তর, মাত্র সেইটুকুর আস্বাদই আমরা পাই। ওর যে 'সঞ্চারী'র আস্বাদ মধ্যযুগের কাব্যপাঠকেরা পেত, তা থেকে আমরা বঞ্চিত।

যেমন প্রাচীন যুগের অনেক কাব্য আমাদের মনে আর রস জোগায় না, তেমনি আমাদের নবীন যুগের অনেক কাব্যও আমাদের যে রস দেয়, ভবিষ্যদ্ বংশীয়েরা তা থেকে ঠিক সে রস পাবে না। কারণ, তাদের ভাবজগৎ ঠিক আমাদের ভাবজগৎ থাকবে না। একটা চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

মনে হলো এ পাখার বাণী
দিল আনি,
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ :
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি,
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশে খুঁজিতে কিনারা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

এই অদ্ভুত কাব্য আধুনিক কাব্যরসিকের চিত্তের প্রতি অণুকে যে রসের আবেশে আবিষ্ট করে, তার একটা প্রধান উপাদান—'গতি' ও 'বেগ' এ যুগের লোকের মনে যে 'ভাব'-এর আবেগের সৃষ্টি করেছে। "অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা" যে কাজ কবিকে "উতলা" করেছে—তার মূলে আছে এ যুগের মানুষের মনে বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিশেষ রূপকল্পনা। এ ভাব ও কল্পনা যে মানুষের মনে চিরস্থায়ী হবে, তা মনে করার কারণ নেই। বিশ্বপ্রকৃতিকে আজ মানুষ যে চোখে দেখছে, সে দেখার যখন বদল হবে, তখন এ ভাব ও কল্পনারও বদল হবে। 'বলাকা'র "ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত" পাখার ধ্বনিতে আমাদের চিত্তে যে রসের বিস্ময় জাগছে, সেদিনের কাব্যরসিকেরা তার অর্ধেকেরও আস্বাদ জানবে না। আমাদের অনাস্বাদিত কোন্ কাব্যরসের আস্বাদ তারা পাবে, তা নিয়ে তাদের হিংসা করব না। এ কাব্যের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি তাদের পূরণ হবে কি না, কে জানে।

কাব্যজিজ্ঞাসা। ১৩৩৫

অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৮৮৬—১৯১৮

ছিন্নপত্র

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাঁত-ব্যভ (Sainte-Beuve) যে-সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোট-খাটো ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

জুবেয়ার, মাদাম রেঁাল্যা শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে এ কথা সুস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আর্নল্ড অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।

ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটা উপায়। যেমন নাট্য-উপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা গীতিকবিতায় মনের ভাবকে মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর-এক রকমে তাহার সেই কার্যই সাধিত হয়। উপন্যাসে বা নাটকে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প—সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোকচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে সাড়া দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ছোটগল্পে সে ক্ষেত্র আরো একটু সংকীর্ণ—কবিতাতে বা প্রবন্ধে আরো বেশি—সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাহার কারণ চিঠিতে একটিমাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাহিরের পাঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।

"যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চারপৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিংবা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র' হইতেই এই অংশটি উদ্ধৃত করিলাম। এই পুস্তকের সকল চিঠিতেই ঐ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কবি ইহাতে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহাতে তাঁহার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনি ধরা পড়িয়াছেন।

সেইজন্য এই চিঠিগুলিতে কোনো কলাচাতুরী নাই, ভাষার ইন্দ্রজাল নাই। নানা লোকের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য কবিকে স্বভাবতই যে সকল মোহিনী মায়ার আশ্রয় লইতে হয়, নারীর অবগুণ্ঠনের মত যে কারুপূর্ণ আবরণটুকু নহিলে তাঁহার সৌন্দর্যই প্রকাশ পায় না, এখানে তাহার কোনো আবশ্যকতা ঘটে নাই। কারণ, এখানে একজনের কাছেই সব বলা হইতেছে।

কিন্তু কবির জীবিতকালে এই পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া

ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সবটা দিতে পারেন নাই। সম্ভবত সংকোচ তাহার কারণ। এইজন্য এই চিঠির টুকরা-গুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠিমাত্রেরই যেটি বিশেষ রস। একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দনগন্ধটুকু বহন করিতেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।

কিন্তু না, আমি বোধ হয় ভুল করিতেছি। এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্নদলের মত নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ—দশ বৎসর কালের এই চিঠিগুলি। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এত দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুই অনুভূত হয় না। দশ বৎসরে কত কীর্তি ভূমিসাৎ হইতে পারে, কিন্তু একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকাবাসের জীবনে পরিবর্তন নাই। মালার সূত্রে ফুলের পর ফুলের মত দিনের পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে, পূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যের পায়ে নিবেদনের একটি সাজি সুগন্ধে আমোদিত হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। কি নিবিড়, কি গভীর, কি আশ্চর্য এই মানুষটির অনুভূতি এবং উপভোগ। মনে হয় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য সার্থক যে, একজনও তাহাকে এমন একান্ত আগ্রহে, এমন বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াছে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির এই ভাব-ঐক্য এই ছিন্নপত্রগুলির মাঝখানে সূত্রের মত থাকায় ইহারা আর এলোমেলো ভাবে উড়িতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে এই একটি মাত্র কথা—"হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালো-বাসি।" তাহাই "শেষ কথা" এবং চিরকালের কথা। সোনার ভাবের কালিতে লেখা পরম সুন্দর কথা।

তথাপি এগুলি ছিন্ন করিবার বেদনা আমার মন হইতে মুছিতেছে না। চিঠিকে সাহিত্যের কড়া বাটখারায় ওজন করিয়া তাহার কতটুকু রাখিতে হইবে এবং কতটুকু ছাঁটিতে হইবে তাহা হিসাব না করিলেই ভালো হয়। কারণ চিঠি তো আর সাহিত্যের মত করিয়া লেখা হয় নাই, তাহার অলংকারের অভাবই তাহার সকলের চেয়ে বড় মূল্য। অবশ্য চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত অংশ বেশি থাকিলে তাহা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হয় না—কিন্তু এ-সকল চিঠিতে কেহ তো গয়লার হিসাব বা সংসার খরচের তালিকা

প্রত্যাশা করে না। এ তো কাজের চিঠি নয়, ভাবের চিঠি। মানুষকে লেখা হইলেও এস্থলে মানুষ অনেকটা পরিমাণেই উপলক্ষ্য। বোধ হয় বিশ্বপ্রকৃতি যদি ভাষা জানিত এবং তাহার সঙ্গে মোকাবিলায় আলাপের কোনো সুযোগ থাকিত, তবে এই চিঠিগুলি তাহারই নিকটে প্রেরিত হইত। সুতরাং এ চিঠিগুলি যেমন ছিল তেমনি বাহির করিলে কি ক্ষতি ছিল!

রচনাকাল। ১৯১৯

বিনয়কুমার সরকার

১৮৮৭—১৯৪৯

লালদীঘি ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট

১৯২৫ সনে প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যেখানে-সেখানে যেসকল বুখ্‌নি ঝাড়িয়াছি তাহার ভিতর অন্যতম মুদ্দা ছিল নিম্নরূপ:—"লালদীঘির জল আনিয়া ঢালিতে চাই গোলদীঘিতে।" নানাস্থানে নানা উপলক্ষ্যে, ঝালে, ঝোলে, অম্বলে,—এই অধম লেখককে লালদীঘির সঙ্গে গোলদীঘির কুটুম্বিতা পাতাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই সম্বন্ধে হদিশ দেওয়াও বিগত আট-নয় বৎসর ধরিয়া এক প্রধান ধান্ধা রহিয়া গিয়াছে।

লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মুড়োটাকে ব্যবসা-পাড়ার আঁক-কষা আর বৈশ্যবৃত্তির সাধনায় চষিয়া দিতে না পারিলে বাঙালীর রক্ত সাফ হইবে না। অতএব ভট্‌চায্যিপাড়ায় চাই কেজো-জীবনের আবহাওয়া, লোহালক্কড়ের ঘা, আর যন্ত্রপাতির আধ্যাত্মিকতা। এই হইল অর্থনৈতিক আয়ুর্বেদের নবীন সাল্‌সা,—নয়া বাঙলার বেদান্তসূত্র। তাহারই নানা বয়েৎ "আর্থিক উন্নতি" মাসিকে আর বঙ্গীয় বণিক ভবন (বেঙ্গল ন্যশন্যল চেম্বার অব কমার্স) কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী ত্রৈমাসিক "জার্ণ্যালে" হোমিওপ্যাথিক্‌ ডোজে বাঁটিয়া চলিতেছি।

এই আট-নয় বৎসরের ভিতর বামুন-বৈশ্যের যোগাযোগে বাঙালী জাতি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। লালদীঘির পানি গোলদীঘির একিনারায়-ওকিনারায় খানিকটা লহর উঠাইতে পারিয়াছে। শেষ পর্যন্ত আজ "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" নাম লইয়া লালদীঘি বাঙালী-ভগীরথের দৌলতে জননী-বঙ্গভাষার

মারফৎ বাঙলাদেশের জেলায়-জেলায় হাটবাজারে অলিতে-গলিতে প্রবেশ করিতে চলিল (এপ্রিল ১৯৩৩)। যুবক বাঙলা এইবার ক্লাইভ ষ্ট্রীট দখল করিতে আগুয়ান হউন।

তালতলা

তালতলা বলিলে প্রথমেই মনে আসে একটা তালগাছ আর তার তলায় একটা পুকুর। সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখিতে পাই, একটা তাল ঢিপ্ করিয়া ডাঙায় অথবা ছপ্ করিয়া জলে পড়িতেছে। হয়ত কলিকাতার এই অঞ্চলে কোনো দিন গণ্ডা-গণ্ডা পুকুর ছিল, আর তার পাড়ে ছিল ডজন-ডজন তাল গাছ। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ছিল। আর অবশ্য মাঝে মাঝে যথা সময়ে তালও ঢিপ্ করিয়া পুকুরের কিনারায় বা ছপ্ করিয়া জলে পড়িত।

একালের তালতলা বলিলে পুলিশের লোকে হয়ত দেখাইবে অমুক রাস্তা, অমুক রাস্তা ইত্যাদি রাস্তার ভিতরকার নির্দ্দিষ্ট করা একটা জনপদ। আবার পোষ্ট অফিসের লোককে যদি জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে হয়ত দেখিব আর কোন প্রকার চৌহদ্দি। তালতলায় যাঁহারা লাইব্রেরী কায়েম করিয়াছেন তাঁহাদের মগজে সীমানাগুলা হয়ত এই দুই প্রকারের কোনোটাই নয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক তালতলার রকমারি ব্যাখ্যা, রকমারি সীমানা, বিভিন্ন গণ্ডী, বিভিন্ন চৌহদ্দি হওয়া সম্ভব।

লোকসাহিত্য

কাজেই গণসাহিত্য কি এই সম্বন্ধেও হরেক রকম সীমানা-নির্দেশ চলিতে পারে। গণসাহিত্যের এক সোজা ব্যাখ্যা সুপ্রচলিত আছে। সেই ব্যাখ্যা দেখিতে পাই—বেশ স্পষ্ট ভাবে—জার্ম্মাণ দার্শনিক হার্ডারের সাহিত্য-সাধনায়। জনসাধারণ যে-সকল কিচ্ছা-কাহিনীতে আনন্দ পায়, সেই সব হইল "লোকসাহিত্য।" এই লোকসাহিত্যের দিকে নজর না ফেলিলে জনগণের আত্মা, 'জাতীয়' চেতনা ইত্যাদি আবিষ্কার করা অসম্ভব। অতএব সাধারণ্যে প্রচলিত গল্প-গুজব, গান, আখ্যায়িকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার দিকে আন্দোলন চালানো কর্ত্তব্য। এইরূপ মত প্রচার করিয়া হার্ডার গ্যেটে-

যুগের জার্ম্মাণ-সমাজে "জাতীয়তার" ভিত্তি কায়েম করিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণির গ্রিম ভাইয়েরা এই ধরণের লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজে প্রসিদ্ধ। বিলাতী ম্যাক্‌ফার্সন জালিয়াতির জোরে প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিকে ইংরেজ সাহিত্যসেবকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। তাহা ছাড়া সুইস-ফরাসী সাহিত্যবীর রুসো সেকালের ইয়োরোপে লোকসাহিত্যের রস বাঁটিয়া গিয়াছেন। যে-কয়জন লোকের নাম করা হইল তাঁহারা সকলেই "রোমান্টিক" অর্থাৎ ভাব-নিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া যেখানে-যেখানে রোমান্টিক ভাবুকতার আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে সেই সকল স্থানে লোকসাহিত্যের ইজ্জৎ দেখা গিয়াছে।

শক্তিধরের আদমসুমারি

জগতের শক্তিধর পুরুষ-নারী মাত্রই গণসাহিত্যসেবীর "পূজাস্থান।" বাঙালী জাতির যাহারা গাহিতে পারে, নাচিতে পারে, গাহাইতে পারে, নাচাইতে পারে, তাহারা সকলেই গণসাহিত্যের "সেন্সাসে" ঠাঁই পাইবার যোগ্য। বাঙ্‌লার যে সকল নরনারী হাসিতেছে ও হাসাইতেছে, স্বপ্ন দেখিতেছে ও দেখাইতেছে,—গণশক্তির উদ্বোধক হিসাবে তাহারা প্রত্যেকেই বঙ্গবীর। যে সকল বাঙালী মাথার জোরে "হাঁ"কে "না"য়ে পরিণত করিতেছে, অথবা "না"কে "হাঁ"য়ে ঠেলিয়া তুলিতেছে, যে সকল বাঙালী হাতের জোরে পুকুরের "লোঁদ" উঠাইতেছে, নর্দমা সাফ করিতেছে, বনজঙ্গল লোপাট করিয়া পল্লী কায়েম করিতেছে, চরের খোলা মাঠে চাষ বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী ব্যবসা বাণিজ্যের জোরে পল্লীকে শহরে পরিণত করিতেছে, শহরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ কায়েম করিতেছে; যে সকল বাঙালী কর্ম-কৌশলের জোরে অজ্ঞাত-কুলশীল নরনারীকে নামজাদা নরনারীর আসনে বসাইতেছে; যে সকল বাঙালী আত্মত্যাগের জোরে, স্বদেশসেবার জোরে, গলাবাজির জোরে, লেখালেখির জোরে অথবা পাণ্ডিত্য-গবেষণার জোরে যুবক-বাঙ্‌লাকে বড় বড় আন্তর্জাতিক ইজ্জৎ পাইবার যোগ্য করিয়া তুলিতেছে, তাহারা সকলেই বাঙালী জাতির মহাপুরুষ হিসাবে গণসাহিত্যের নায়ক-নায়িকা। গণসেবকের চোখে একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যক্তি হইল স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, গঠনক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিযোগী চিন্তাবীর ও কর্মবীর।

গণসেবকের চোখে একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু হইল সৃষ্টিশক্তি, প্রকৃতিকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া, দুনিয়াকে ভাঙিয়া-চুরিয়া, ভূতলকে টানিয়া-ছিঁড়িয়া নতুন করিয়া রূপ দিবার ক্ষমতা।

ডানপিটের বীরত্ব

এই ধরণের শক্তিধর ও স্রষ্টা নরনারী অন্যান্য দেশের মত বাঙ্‌লা দেশেও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চোখের ঠুলি খুলিয়া বাঙ্‌লার জেলায় জেলায়, পল্লীতে-পল্লীতে, নৌকার ঘাটে, জঙ্গল-মাঠে, পাহাড়ে-উপত্যকায় ঘুরা আবশ্যক। দেখিতে পাইবে যে, অনেক লোক অসংখ্য দুঃখকষ্ট সহিয়া দিনের পর দিন আবাদ করিতেছে, মাছ ধরিতেছে, সংসার চালাইতেছে। কে তাহাদিগকে সাহায্য করিল, কে তাহাদিগকে বাধা দিল, সে সব দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। সাহায্য পাইলে তাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নয়। বাধা পাইলেও তাহারা বিচলিত হয় না। ধাক্কা খাইয়া, মার খাইয়া, ফেল মারিয়াও তাহারা হাল ছাড়িতেছে না। পল্লীমোড়লদের কোঁদল, পাড়াপড়শীদের হিংসাগঞ্জনা তাহাদের নিত্যসহচর। তাহারা দুবেলা আঁচাইলে তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের চোখ টাটাইতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা সটান বুকে ঘাড় খাড়া রাখিয়া নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া চলিতেছে। রোদকে রোদ, বৃষ্টিকে বৃষ্টি, রসকে রস, কষকে কষ, বিজয়কে বিজয়, পরাজয়কে পরাজয় তাহারা সবই সমানভাবে বরদাস্ত করিতে অভ্যস্ত। তাহারা পাঁচ ঘা খাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ঘা না হউক, তিন ঘা লাগাইতে তাহারা সুপটু।

এই ধরণের ডানপিটে লোক বাঙালী জাতির এখানে-ওখানে-সেখানে ছোট-বড়-মাঝারি সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রেই নজরে পড়ে। ডানপিটেগুলা না থাকিলে দুনিয়া পচিয়া যাইত। ডানপিটে না থাকিলে বাঙ্‌লা দেশও পচিয়া যাইত। বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের আসল বনিয়াদ হইল ডানপিটের কর্মকাণ্ড। ডানপিটেদের সৃষ্টিশক্তি জগতের সর্বত্র মানব জাতির জীবনলীলা বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালী জাতির ডানপিটেগুলাকে চুঁড়িয়া বাহির করা, ডানপিটেদের বীরত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, ডানপিটেদের কৃতিত্ব সমূহের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা গণপূজার প্রধান সরঞ্জাম।

তঁ্যাদড়ের ভবিষ্যনিষ্ঠা

আর একপ্রকার শক্তিধর নরনারী জগতের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহারা মামুলি মতে সায় দেয় না। লোকজনের পছন্দ-সই কথা বলিয়া বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। সার্বজনিক লোকপ্রিয় মতগুলিকে তাহারা অতি-চোঁথা মত বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত! দশ, বিশ, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কোনো-একটা কথা অনবরত প্রচারিত হইতে থাকিলে, তাহা কালে রামা-শ্যামা-ইসমাইল-আবদুলের বোধগম্য হয়। অর্থাৎ মালটা পুরোনো, অতি-বাসি, একঘেয়ে আর তেতো না হইলা গেলে বারইয়ারিতলার আসরে তাহা বরদাস্ত হয় না। কিন্তু, তাই সব পচা ও বাসি মতামতের প্রচারক যাহারা হয়, তাহারা দুনিয়ায় নতুন দাগ রাখিতে অসমর্থ। বারইয়ারিতলার সর্বজনপ্রিয় দর্শন বা বিজ্ঞানগুলা জগৎকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে না।

শক্তিধর নরনারী এই বারইয়ারিতলার হাততালি আর খবরের কাগজের লোকপ্রিয়তা অথবা নিজ গোষ্ঠীর ভিতরকার সাধুবাদ হজম করিবার দিকে প্রলুব্ধ হয় না। মাথা তাহাদের সজাগ। সংসারটা যে পথে চলিতেছে, লোকেরা যাহা চাহিতেছে, জনসাধারণ যাহাকে সর্ববাদিসম্মতক্রমে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বিবেচনা করিতেছে, হয়ত সেই সব জিনিষে বাস্তবিক পক্ষে উন্নতির যন্ত্রপাতি নাই। লোকেরা আজও যাহা চাহিতে শিখে নাই, জনসাধারণ আজও সে সকল কর্ম-প্রণালী ও চিন্তা-প্রণালীকে বাধা দিতেছে, দেশের লোকেরা আজও যে সব জিনিষ পদদলিত করিতে অগ্রসর, হয়ত সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেই দুনিয়ার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ চিন্তা করিতে যাহারা অভ্যস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নিন্দা-গঞ্জনা সহিতে সুপটু, এই ধরণের চিন্তা প্রচার আর তদুপযোগী কর্মব্যবস্থার ফলে যাহারা বারইয়ারিতলার খোলা আসরে দাঁড়াইয়া সমবেত নরনারীর জুতা খাইতেও ডরায় না, তাহারাই জগদ্‌বৃদ্ধির দর্শনবীর।

এই সকল জুতা-পেটাকরা, সার্বজনিক মতামতকে কলা দেখাইবার ক্ষমতাওয়ালা, বেয়াড়া রকমের তাজা-তাজা চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক লোকগুলাকে এক কথায় আমি বলি তঁ্যাদড়। এই সকল তঁ্যাদড় নিজ মাথায় সকল প্রকার কুৎসা-নিন্দা বহিয়া সমাজ-রাষ্ট্র-মন্দির-পরিবারের জন্য নতুন-নতুন পথ খুলিয়া ধরিতে পারদর্শী। তাহারা সোজা পথের পথিক নয়। তঁ্যাদড়ের চিন্তা-প্রণালী পথে-বেপথে চলে, কাজেই সহজে গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু এই সব অ-লোকপ্রিয় আর অ-সোজা চিন্তার ফলে যথাসময়ে এক পল্লীমোড়লের ঠাঁইয়ে আসিয়া খাড়া হইতেছে আর এক পল্লীমোড়ল, কোনো প্রতিষ্ঠান উপিয়া যাইতেছে, আর অন্য এক প্রতিষ্ঠানের দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। ত্যাঁদড়েরা ভবিষ্যপন্থী, বিপ্লবপ্রবর্তক সমাজ-বীর। এই সকল বীরদের মহত্ত্ব গণসাহিত্যের আসরে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি। সকল প্রকারে ত্যাঁদড়-সম্বর্দ্ধনায় আগুয়ান হওয়া বাঙালী গণসেবকদের পক্ষে অন্যতম সেবানুষ্ঠান।

গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিশ্বরূপ

এই যে এত অসংখ্য পথে অসংখ্য রূপে ডানপিটে-ভবঘুরে-ত্যাঁদড়েরা বাঙালী-জীবনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে তাহার কাব্য চাই, নাট্য চাই, গল্প চাই, উপন্যাস চাই। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতির সৃষ্টি-বিশ্বকোষ আকারে-প্রকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিশ্বকোষ সম্বন্ধে চিত্রকরেরা তুলির সদ্ব্যবহার করুন; স্থপতিরা হাতুড়ি-বাটালি ধরুন। নৃতত্ত্ব-সেবকেরা, অর্থ-শাস্ত্রীরা, সমাজতত্ত্বসেবীরাও এই বিশাল জীবনস্রোতের সঙ্গে মগজের সহযোগ চালাইতে বিশেষরূপে ব্রতবদ্ধ হউন। আর যুবক বাঙ্‌লার স্বদেশসেবকগণ আদিম-পতিত্‌-নিরক্ষর বাঙালীর মহত্ত্ব ও বীরত্বের যথোচিত কদর করিতে অভ্যস্ত হউন। অপর দিকে রাষ্ট্রিকেরাও এই সকল কোটি-কোটি লোকের জীবন-বৃদ্ধি জরীপ করাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী শাসন-বিভাগের তদ্‌বিরে একটা স্থায়ী "জাত-পাঁত" বিষয়ক দপ্তর কায়েম করিবার জন্য আন্দোলন রুজু করুন।

বাঙালী জাতি সকল তরফ হইতে গণ-পূজায় উদ্বুদ্ধ হউক। গণ-সাহিত্যের চর্চা বস্তুনিষ্ঠভাবে ও ব্যাপকরূপে বাঙ্‌লার মাটিতে শিকড় গাড়িতে থাকুক। গণশক্তি ও গণসাহিত্যের বিশ্বরূপ দেখিয়া যুবক বাঙ্‌লার নরনারী জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হাজার-ভুজা বাঙালী জাতিকে আদিম-পতিত্‌ হিন্দু-মুসলমান মা বলিয়া ডাকিতে শিখিবে। তাহার পর বাঙ্‌লায় দেখা দিবে বৃহত্তর বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্রষ্টা, মহা-বঙ্গের বিরাট ঋষি।

বাড়তির পথে বাঙালী। ১৯৩৩

ভূমিকা

হাজার-ভূজা বাঙালী জাতি অনেক-কিছু ভাঙিতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক-কিছু গড়িতেছে। এই ভাঙা-গড়ার ভিতর আশুতোষ ঘোষ ঢুঁড়িতেছেন জ্যান্ত-তাজা কর্মযোগের হদিশ।

লেখক রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের পথ-ঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবৃহাল। বিবেক-অভেদকে তিনি শক্তি-যোগের ও স্বদেশ-যোগের খাসি সম্ঝিতে অভ্যস্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ডুবুরি হিসাবে তিনি তুলিয়াছেন "শিশুমন থেকে আরম্ভ ক'রে মানব-মনের প্রত্যেক স্তরের" শিল্প-বিশ্লেষণ, আর আবিষ্কার করিয়াছেন "জীবনের পরিপূর্ণতার" পথ। "পৃথিবীতে ভাবগত-জীবন প্রতিষ্ঠা" হইতেছে তাঁহার বিচারে অরবিন্দ-দর্শনের আসল মুদ্দা। তাহা ছাড়া তিনি "সাহিত্যিক কবি সুরশিল্পী দিলীপ কুমারের" হাতে "জড়ধর্মী মনের একটা নূতন বনেদ গ'ড়ে তোলার" বাস্তুশিল্প পাকড়াও করিয়াছেন।

তেত্রিশ পৃষ্ঠার রচনা,—কিন্তু যারপরনাই শাঁসাল। চিন্তাগুলা বলিষ্ঠ। লেখাটা গোঁজামিল শূন্য, নিরেট ও সরল। লেখকের বাহাদুরি তারিফযোগ্য। চোখ আছে। বাজে মালের দিকে নজর নাই। প্রাণটা দরদশীল ও আন্তরিকতাময়।

বিশেষ আনন্দের কথা,—আশুতোষ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার খপ্পরে পড়িতে রাজি নন। তাঁহার ভাবধারা মানব-নিষ্ঠ, জীবন-নিষ্ঠ, ও বর্তমান-নিষ্ঠ।

এ-কালের বঙ্গ-সংস্কৃতির যাচাই করিতে করিতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য আশা ছড়াইতেছেন। তাঁহার মগজের প্রধান ধান্ধা :—"ভারতের অবনতি কেন হইল?" তাঁহার প্রাণের কথা :—"সে-জাতির ধ্বংস কোথায়?" বেশ প্রশ্ন, বেশ জবাব।

যুবক বাঙলার অন্যতম বিচক্ষণ প্রতিনিধির সংস্পর্শে আসিয়া জীবনে বাড়তি উপভোগ করিতেছি।

ভাবধারা। ১৯৪৩

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৮৮—১৯২৯

মনে মনে

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাথার উপরে অনন্ত নীল আকাশ, সামনে তীব্রগতি স্বচ্ছ নদীর কুলুকুলু তান, পূর্ণিমার রজত কিরণে উচ্ছ্বসিত রজনী, গাছে-গাছে কোকিল-কোয়েলার কলসঙ্গীত, বসন্তের মলয় সমীরণ—এ সমস্ত কিছুই ছিল না। ঘোর অমাবস্যা নিশীথে বিজন বনে একাকিনী দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা হয়ে, সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী আর্ত্তনাদ করেছিল, আমি অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়ে তাকে উদ্ধার করলুম;—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, সে বহু-যত্নে শুশ্রূষা করে আমায় সুস্থ করলে; তারপর আমার সামান্য উপকারের বিনিময়ে তার অমূল্য হৃদয়টি আমার হাতে তুলে দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল;—আমি অবাক হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, সেই অমূল্য উপহারটি গ্রহণ করে, একবার মাথায়, একবার বুকে ঠেকিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলুম—এমন কবিত্বময় ব্যাপারও ঘটেনি।

কোনো নিরালা নির্জ্জনে তার আমার সঙ্গে দেখা হয়নি;—তাকে দেখেছিলুম আমি এক ভীষণ জনকোলাহলের স্রোতের মধ্যে;—ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেষি, তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি লুটোপুটি তারই মাঝখানে! স্থানটি কোনো মেলাক্ষেত্র না হলেও, মেলার চেয়েও সেখানে ঢের বেশী ভিড়; বিরাট বক্তৃতাসভা না হলেও ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল সেখানে। জায়গাটি একেবারে আক্রহীন খোলা মাঠের মতন নয়, অথচ মনে হয় যেন হাট কি বাজার।—অর্থাৎ সেটি হাওড়া ষ্টেশন।

আমি যাচ্ছিলুম হাওয়া-বদলাতে দেওঘরে। সঙ্গে ছিল কেবল চাকর ও বামুন। পাঞ্জাব-মেলের এক দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরায় একটা জান্‌লা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে চুপ করে বসে ছিলুম। অসুস্থ দেহের দুর্ব্বলতা বিদেশযাত্রা-কাতর মনটাকে ক্রমেই যেন আছন্ন করে ফেলছিল। শেষে এমন মনে হতে লাগল যেন আমার দেহ-মন সমস্ত আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখের সাম্‌নে লোকজন ছুটোছুটি করছে, মালপত্র বহে নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ির দরজা টানাটানি করে খুলে পিল্‌-পিল করে লোক সেঁধচ্চে, মুটের সঙ্গে ঝগড়া, সঙ্গী

নিয়ে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি চলছে—এ সমস্ত শুধু চোখেই দেখছিলুম, কানেই শুনছিলুম, মনের যেন কোন সাড় ছিল না।

হঠাৎ আমার সেই অসাড়তার উপর একটা ধাক্কা দিয়ে একটি ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে জায়গা হবে কি?"

আমি থতমত খেয়ে গাড়ির ভিতর চারিদিকটা চেয়ে বল্লুম—"একটা জায়গা আছে বোধ হয়।"

ভিড়ের সময় রেল-কামরার যে-দরজা খোলা হয়, সেইদিকে সবাই ছোটে। ভদ্রলোকটি দরজা খুলতেই তাঁর আশেপাশে অনেকগুলি লুব্ধ যাত্রী এসে দাঁড়াল। তারপর, জায়গা নেই দেখে আবার অন্যদিকে ছুট দিলে।

ভিড় সরে গেলে দেখি, আমার সাম্‌নে এক বৃদ্ধ একটি সুন্দর মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে কি ভাবছেন।—ঠিক যেন শিল্পীর হাতের আঁকা একখানি ছবি! হঠাৎ আমার মনের উপর এই ছবিটি একটা ঝট্‌কার মতো এসে লাগল—তাইতে আমার সেই তন্দ্রা একেবারে ছুটে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার গায়ের রং, তার সেই মুখ, চোখ, ঠোঁট, ভুরু,—এমন-কি তার সেই ফিরোজা-রঙের সাড়িখানির ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত আমার মনের উপরে কেঁপে-কেঁপে দাগ কাটতে লাগল। তার সেই কালো চোখের পাতার কাঁপুনি, তার হাতের চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্, তার পায়ের আল্‌তার লাল আভাটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না;—এই সমস্ত রং ও শব্দের রেখা নিয়ে আমার চোখের লেন্স মনের উপরে একখানি জীবন্ত ফটোগ্রাফ তুলে নিলে।

আমি তার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলুম; হঠাৎ সে আমার পানে টানা-টানা চোখ তুলে একবার চাইলে। খুব শান্ত স্থির সে দৃষ্টি, কিন্তু আমার বুক কেমন থর্‌-থর্‌ করে উঠল।—যেন একটা বিদ্যুত-প্রবাহের স্পর্শ এসে লাগল।

এত ব্যাপার ঘটে গেল একমুহূর্ত্তের মধ্যে। বৃদ্ধটি খুব অল্পক্ষণই সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত ধরে ডাকলেন, মেয়েটি ধীরে ধীরে চলে গেল। তার পায়ের পাঁয়জোরের ঘুঙুর বাজতে লাগল—ঝুন্, ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্! আমার বোধ হল সেই সুর যেন আমায় ডেকে গেল। আমি উঠতে পারলুম না, কিন্তু আমার মন ঐ সুরের সঙ্গী হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে, শেষে হতাশ হয়ে একা ফিরে এল।

আমি বসে-বসে ভাবতে লাগলুম। সেই ভাবনার গভীরতার মধ্যে চারিদিকের গোলমাল, চারিদিকের আলো ডুবে গিয়ে, সব ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ হয়ে

এল; কেবল সেই মেয়েটির ছবি জল্‌জল্‌ করে চোখের সাম্‌নে ভাসতে লাগল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। আমি চোখ-বুজে শুয়ে পড়লুম। আমার অসুস্থ শরীর-মন ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। সেই ঝিম্‌ঝিমানির ভিতরে-ভিতরে তার চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্‌, পাঁয়জোরের ঝুন্‌ঝুন্‌-শব্দ কোন্‌ সুদূর থেকে এসে বেজে-বেজে আমায় কেমন আকুল করে তুলতে লাগল।

গাড়ি যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ মনে এইরকম একটা তৃপ্তির আবছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, মেয়েটি কাছে না থাকলেও সঙ্গে আছে। কিন্তু যেই বর্দ্ধমানে এসে গাড়ী থামল, অমনি আমার বুকটা ছাঁৎ-করে উঠল। আমি শুয়েছিলুম, তাড়াতাড়ি উঠে বসে জানলা-দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে আকুল-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলুম; ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ব্যাকুলতা কেবলই গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠতে লাগল—যদি সে এইখানে নেমে চলে যায়! মনকে ধমক দিয়ে বল্লুম—'যাক্‌ না, তাতে তোর কি।' কিন্তু তাতে তাকে দাবাতে পারলুম না; সে ক্রমেই বিষম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ অস্পষ্ট আলোকে দেখলুম, পিছনে চার-পাঁচ কামরার পর এক কামরা থেকে কারা-দুজন নেমে প্লাটফরম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমার হতাশদৃষ্টি তারই পানে অসাড় হয়ে পড়ে রইল।—চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলুম, যেন আমার জীবনের শুভ্র শুক-তারাটি বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ধীরে-ধীরে অস্ত যাচ্চে। সমস্ত হৃদয় আমার হায়-হায় করতে লাগল; এমন তার চঞ্চলতা যে তাকে সামলানো আমার দায় হয়ে উঠল। এই সময় হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কে যেন একটা সন্দেহের আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"যে নেমে গেল, সে যে সেই, তা তোমায় কে বল্লে?" তাও ত বটে। এই সন্দেহের আশ্বাসটাকে দৃঢ় করবার জন্যে একটা নিশানা আমি চতুর্দিকে হাৎড়াতে লাগলুম—কিন্তু কিছুই পেলুম না। মন আবার দমে গেল,—একটা সংশয়ের দোলায় দুলে-দুলে সে ক্রমেই শ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল।

মনকে আবার ধমক দিয়ে বল্লুম—"ঐ ত কত লোক চলে গেল, যদি সে গিয়ে থাকে ত গেছে!" মন কেঁদে বল্লে—"আর কারুর যাওয়ায় তো কিছু ক্ষতি টের পাচ্ছি না; কিন্তু সে যে আমার মাঝে বিদায়ের একটি নিবিড় ব্যথা জাগিয়ে দিয়ে গেল! আমি যে তাকে ভুলতে পারছি না।" কি আশ্চর্য, যাকে জন্মে কখনো চিনি না, যার সঙ্গে জীবনে কোনো সম্পর্ক ঘটেনি, সে

হঠাৎ এসে এক-নিমেষে কেমন-করে আমায় এতখানি দখল করে বসলে। আমার পরে এতবড় দাবীর অধিকারই বা তাকে কে দিলে? হায় পাগল-মন, তুমি কোন্ সাহসে, কিসের জোরে এই অপরিচিতাকে এতখানি আপন-করে-নেবার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে তুলছ! এ কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটে বেরুবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ! কোথায় তাকে পাবে? কে তোমায় পথ বলে দেবে? কতকাল গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে মরবে? কোনোদিন কি তোমার এ-যাত্রার অবসান হবে? না, কেবলই ব্যর্থতা নিয়ে চিরদিন কেঁদে-কেঁদে ফিরবে? এ অজানার সঙ্গে জানার সৌভাগ্য তুমি কোন্ দেবতার বরে লাভ করবে? সে যে অসম্ভব! গাড়ি ছেড়ে দিলে। এতক্ষণ আমি যেন স্বেচ্ছায় যাচ্ছিলুম, এইবার কে এসে জোর-করে আমায় টেনে নিয়ে চল্ল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, এইখানটিতে—এই বিচ্ছেদের পুণ্যতীর্থে—চিরজীবন ধরে পড়ে থাকি —হয়তো কোনোদিন এই পথে আবার তার পায়ের ধূলো পড়বে! কিন্তু তা হল কৈ? গাড়িখানা আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে চল্ল! হায় হতভাগ্য অক্ষম!

আমি হতাশ হয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। গাড়িখানা দোল-খাইয়ে-খাইয়ে বায়না-ধরা ছেলের মতো আমাকে ভোলাতে লাগল। আমি এই দোলার কোলে অসাড় হয়ে পড়ে রইলুম।

* * * *

কবিরা যে বলেন, প্রেম অন্ধ, এ-কথা খুব ঠিক। প্রেম যে মানুষের চোখে খামকা ধাঁধা লাগায়, তার প্রমাণ আমি যেমন পেয়েছি, তেমন বোধ হয় কেউ কখনো পায় নি। সে-মেয়েটি সমস্ত পথ আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল; সকালবেলা আমার সাম্‌নে গাড়ি-থেকে নেমেছে, উঠেছে, আবার নেমেছে, তবু কিছুই টের পাইনি। আমি কাণা হয়ে ছিলুম, নইলে দেখতে পেলুম না কেন?

সকালে দেওঘর ষ্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে আম্‌মনে দাঁড়িয়ে কি সব ভাবছি, এমন-সময় সে আমার গায়ের পাশ দিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেল। আমি একেবারে অবাক! তার যে উজ্জ্বল দৃষ্টিটি আমার চোখের উপরে এসে পড়ল, মনে হ'ল, তার মধ্যেও একটি বিস্ময়ের কৌতুক যেন খেলা করছে! এখানে আমাকে দেখে, সেও তবে আমারই মতো আশ্চর্য হয়েছে! কালকের এই ভিড়ের মধ্যেকার আমাকে তা হলে সে মনে করে রেখেছে!

আনন্দে আমার বুক দুলে উঠল। তখন তাকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, কাল রাত্রের সেই তীব্র হতাশার ঘন-কুয়াশা ঠেলে যেন আনন্দের সূর্য উদয় হলেন। তার দীপ্তিতে আমার হৃদয় ভরে গেল। নবীন উৎসাহে আমার নিভন্ত মন আবার জ্বলে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ষ্টেশন-থেকে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ির উদ্দেশে।

সেই দিন তার সঙ্গে আবার দেখা—সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার পথে। তখন সূর্যাস্তের রাঙা রঙের আভা মেঘের গা থেকে মাটির উপর ঠিকরে পড়চে। পাখীর গানে আকাশ ভরে উঠেছে। এই রং আর সুর্যের শতদলটির উপরে হঠাৎ তার আবির্ভাব হল। চোখকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলুম না—বোধ হল যেন এ আমার মনের স্বপ্ন আকাশের গায়ে তুলি-বুলিয়ে চিত্র রচনা করেছে।—এ শুধু ছবি! কিন্তু না, চট্‌কা-ভেঙে দেখলুম সত্যই সে! তখন মনে হতে লাগল, যে দূরে ছিল, স্বপ্নে ছিল, যেন আমার কাছটিতে এগিয়ে আসছে—চুপি-চুপি পা-ফেলে-ফেলে।

কি আশ্চর্য, সত্যই সে আমার অত্যন্ত কাছে এসেছে।—একেবারে আমার চোখের উপরে—সাম্‌নের বাড়িতে। এত কাছে যে তার গলার আওয়াজটি পর্যন্ত কানে এসে লাগে, তার চোখের পাতার কাঁপনটি পর্যন্ত দেখা যায়।

আমি দেখা সুরু করলুম।

মনে-মনে। ১৯১৯

মোহিতলাল মজুমদার

১৮৮৮—১৯৫২

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

কিন্তু জাগরণে বিলম্ব হয় নাই। পশ্চিমের প্রবল প্রভাব—শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও আশা-বিশ্বাস—যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিল; তাহার অন্তরের অন্তস্তলে—সুগভীর মর্ম্মমূলে, তাহার জাগ্রত চেতনারও অন্তরালে যে হাহাকার জাগিয়াছিল, বাহিরে বিদ্রোহচ্ছলে সেই অসীম আকুতিই মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসে প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। মেঘ-

নাদবধ-কাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে ?—কেহ কি এখনও পড়ে ? এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িত-কুন্তলা রোদনোচ্ছূননেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্ত্তি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য্য আর কি ফুটিতে পারে ?—তাহার জীবনে আর আছে কি ? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদ-বধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে; বাঙ্গালীর গৃহ-সংসারের সেই পুণ্য-দীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার, ভার্জ্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙ্গালীবধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতল-ব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোক-কাননে বন্দিনী নারী লক্ষ্মীর মূক শোক-ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে ; এবং শক্তিশেল-মূর্চ্ছিত ভ্রাতার-শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্ম্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী লবণাম্বুগর্ভে নির্ম্মল উৎস-বারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

> সুখের প্রদীপ, সখি ! নিবাই লো সদা
> প্রবেশি সে গৃহে, হায় অমঙ্গলারূপী
> আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
> নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
> বনবাসী, সুলক্ষণে ! দেবর সুমতি
> লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
> শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
> শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীম-ভুজ বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।

—কবির কাব্য-লক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না. —ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমার-মিল্‌টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জ্জিলের কল্পনা এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি বাক্য-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্ম্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ-রাজির মধ্যেও এ কার কুলু-কুলু ধ্বনি?—এ যে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন, নব তারাবলী", এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে! সমুদ্র গর্জ্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন মধুর! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল,—"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।"

আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ১৩৩৬

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১৮৯

নব্য কাব্য

আধুনিক কবি কেবল আত্ম-চেতনই নন, তিনি আবার বিশ্বচেতন। কবির জ্ঞান যে কেবল তাকে নিজের সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছে তা নয়, বিশ্বের সম্বন্ধেও

তাকে সজ্ঞান করেছে। ভাবে অনুভবে বিশ্বের সাথে একটা সাধারণ ঐক্যের বা সৌহার্দ্যের কথা বলছি না, মস্তিষ্কের ধারণায় চিন্তায় কবির মধ্যে প্রতিফলিত হবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্যা সিদ্ধান্ত সব। আধুনিক চিত্তকে চেতনাকে স্পর্শ করে আলোড়িত করে যত তত্ত্ব—আধুনিকেরা বস্তু-হিসাবে বস্তুকে নিয়ে আর তত তৃপ্ত নন্, বস্তুকে কেটে ছিঁড়ে, তাকে বিশ্লেষণ করে, যে তত্ত্ব পাওয়া যায় কি যায় না, বস্তু যে মনোজ্ঞ সমস্যার প্রতীক বা বাহন, সে-সবই কাব্যের অঙ্গীভূত হওয়া চাই, তাদের সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা চাই, তাই হল কাব্যের মুখ্য সার্থকতা।

আধুনিক কবির বিশ্বচেতনা দুই ধারায়—দেশে ও কালে ভূগোলের আর ইতিহাসের জ্ঞান আধুনিক মনকে বিচিত্র রকমে সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে সমসাময়িক সমগ্র ভূখণ্ড, আর একদিকে সমগ্র অতীত বিবর্ত্তন, কত প্রকার অনুভূতির উপলব্ধির আলোচনার বিষয় আধুনিক চেতনায় সঞ্চিত করেছে, স্তরে স্তরে কোষে কোষে। দেশান্তরিত, কালান্তরিত বিবিধ শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি মিলে-মিশে আধুনিক চিত্তের যে গঠন দিয়েছে তাতে আধুনিক মানুষ আত্যন্তিকভাবে—সূক্ষ্ম আকারে নয়, স্থূলতঃ কার্য্যতঃ বস্তুতঃ—হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী। ফরাসী শিল্পীর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়েছে, তুলিকা স্পন্দিত হয়েছে সুদূর পলিনেশীয় প্রকৃতির, পলিনেশীয় আদিম মানুষের সৌন্দর্য্যে, প্রাগৈতিহাসিক মিশরের শিল্প রচনায় পাই যে রেখা-ভঙ্গির অপরূপ কঠোর মাধুর্য্য, তপস্বী-সুলভ নগ্নতা, দৃঢ়তা একাগ্রতা, যেমন আধুনিকের মধ্যে পাই তার ছায়া! আমাদের দেশেও আধুনিকের হাতে কেবল যে সুদূর অজন্তার টান পাই তা নয়, অনেক আধুনিক কণ্ঠেও শুনি ভারতীয় সুরে ইউরোপীয় ছন্দ। অবশ্য অতীতকালে দেশে ও দেশে, যুগে ও যুগে আদান-প্রদান ও একটা মিশ্রণ যে ছিল না তা নয়—কিন্তু তা ছিল যেন প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার মত সহজ ও অনায়াস। কারণ বিদেশ হতে আগত অথবা অতীত হতে গৃহীত উপাদান-উপকরণ এতখানি আত্মসাৎ করে ফেলা হত, বর্ত্তমানের চিত্ত-রসায়নে এতখানি গলে মিশে যেত, যে সে-সকল আবিষ্কারের জন্য রীতিমত প্রয়োজন রাসায়নিক বিশ্লেষণ, পণ্ডিত গবেষকদের সমগ্র কলাকৌশল (critical apparatus)। আর্য-সংস্কৃতির কোন কোন অঙ্গ অনার্য্য বা অনার্য্যের জীবন-ধারায় আর্য্যের পদাঙ্ক কোথায় কোথায়, এ সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে আজ আমরা গলদ্-ঘর্ম্ম। কিন্তু আধুনিক শিল্পীচিত্তের গঠন দেখি অন্য রকম—এখানে

বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ সকলেই তাদের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বর্ত্তমান। কারণ কবির অনুভবের চেয়ে কবির মস্তিষ্কেই তাদের স্থান বেশি—কবি এ-সকলকে ব্যবহার করেন সজ্ঞানে।

প্রকাশকাল। ১৩৫২

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯০

বের্লিন

আমার কাছে বের্লিনের প্রধান আকর্ষণ—এর মিউজিয়মগুলি। বের্লিনের প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহশালা; মধ্যযুগের আর আধুনিক কালের ভাস্কর্য আর চিত্রের সংগ্রহশালা; আমেরিকা ও আফ্রিকা এবং মধ্য-এশিয়া চীন জাপান তিব্বত প্রভৃতির প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পদ্রব্যের সমাবেশে অতুলনীয়, নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈহাসিক সংগ্রহাবলী; বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাস্কর্যের সমস্ত নিদর্শন-আকৃতির সংগ্রহ;—এই রকম গোটা দশেক মিউজিয়ম আছে, সেগুলি আধুনিক সভ্যজগতের অতি মূল্যবান সম্পদ। ভূতপূর্ব কাইসার ও তৎপুত্রের প্রাসাদ দুটি এখন শিল্প-দ্রব্য আর প্রাচীন আসবাব-পত্রের মিউজিয়মে রূপান্তরিত হ'য়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম আর সাউথ-কেনসিঙ্‌টন মিউজিয়ম; পারিসের লুভ্র, চের্নুস্কি মিউজিয়ম, গীমে মিউজিয়ম, আর লুক্সাঁবুর্গ মিউজিয়ম; ইটালীর কতকগুলি মিউজিয়ম; আর সেই সঙ্গে বের্লিনের এই মিউজিয়মগুলি,—এগুলির আর তুলনা হয় না।

বের্লিনের সংগ্রহের বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রবো না। প্রাচীন মিসরের কতকগুলি অসাধারণ সুন্দর ভাস্কর্য এখানে আছে; তার মধ্যে সব চেয়ে লক্ষণীয়, মিসরীয় শিল্পের চরম বিকাশ-স্বরূপ, রাজা রাণী আর অভিজাতবর্গের কতকগুলি মুখ। মিসরীয়েরা পাথরের বড়ো-বড়ো শবাধার তৈরী ক'রত, আর তার ঢাকনীতে নানা ছবি খুঁদে দিত। এই রকম একটি ঢাকনীর উপরের খোদাই ছবির ছাপ নিয়েছে, সেটী আমাকে খুবই মুগ্ধ করে। আকাশের দেবী Nut 'নূৎ' নক্ষত্র-খচিত আকাশ ব্যেপে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে; সুদীর্ঘ, সুঠাম, ঋজু ও তনু দেহ; শক্তিশালী রচনা। গ্রীক ভাস্কর্যের বিভাগে অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি আর প্রস্তর-ফলক আছে, তার মধ্যে লক্ষণীয়

হ'চ্ছে কতকগুলি সমাধির উপরে প্রোথিত, খোদিত ফলক। একটী নারী-মূর্তি আমার বড় চমৎকার লাগে, মূর্তি মানে খালি মুণ্ড—মুণ্ডটী একটী পাথরের অসম্পূর্ণ দেহের উপরে বসানো—প্রাচীন গ্রীক যুগের শিল্পের ছাঁদে তৈরী খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের—ঈষৎ চিন্তাশীল মুখে অপূর্ব বিষাদ-মিশ্র স্নেহের ভাব মাখানো—দেবী-মূর্তির মহনীয় কল্পনা বটে। প্রাচীন গ্রীক চিত্র-আঁকা মাটীর পাত্র, তানাগ্রা আর অন্য জায়গার পোড়ামাটীর পুতুল আর অন্য মূর্তি, ছোট-ছোট ব্রঞ্জের মূর্তি,—কত আর নাম করা যায়? বের্লিনের মিউজিয়মে পুরো বাড়ী-কে-বাড়ী এনে জমা করেছে: পের্গামসের গ্রীক মন্দির প্রায় সবটা তার বিরাট ভাস্কর্য সমেত; বাবিলনের সিংহদ্বার, মশাত্তার আরব প্রাসাদ। ইটালি, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, জরমানি প্রভৃতি দেশের মধ্য-যুগের আর রেনেসাঁস-যুগের শিল্প,—চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি—এরও প্রচুর সংগ্রহ। নৃতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়মে মধ্য-এশিয়া আর চীন জাপানের সংগ্রহ লক্ষণীয়। প্রাচীন বা আধুনিক ভারতের জিনিস তেমন বেশী নেই। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার মিউজিয়মে অন্যতম কর্মচারী ডাক্তার Waldschmidt ভাল্টশমিট আর ডাক্তার Meinhard মাইন্‌হার্ট—এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল; এঁরা খুবই সৌজন্য দেখান,—আর ডাক্তার ভাল্টশমিট আমায় মধ্য-এশিয়া আর ভারতের সংগ্রহ যা আছে তা বেশ ভালো ক'রে দেখান। আমেরিকা আর এশিয়ার সংগ্রহ ছাড়া, মেক্সিকোর প্রাচীন মূর্তি ভাস্কর্য প্রভৃতির, আর নিগ্রো শিল্পের, খুব বড়ো আর সুন্দর সংগ্রহ আছে। এগুলিও আমার পূর্ব-পরিচিত প্রিয় বস্তু, আবার দেখবার ঝোঁক অনেকদিন ধ'রেই ছিল, এবার এগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখলুম। পশ্চিম আফ্রিকার সুবিখ্যাত বেনিন-শহরের লোকেরা আফ্রিকার মহাদেশে শিল্প বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল, এই নগরে তৈরী ব্রঞ্জের মূর্তি আর ঢালাই-করা চিত্র-ফলক, আর হাতীর দাঁতের কাজ, বের্লিনে এসে ভালো ক'রে দেখবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঠিক এই সংগ্রহটি থেকে প্রায় সব মূল্যবান বা শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সরিয়ে রাখা হয়েছে, কে এই সব নিয়ে আলোচনা ক'রছেন, তাঁর জন্য। লণ্ডনে বেনিন্‌-নগর থেকে আনা একটি নিগ্রো মেয়ের জীবন্ত আকারের ব্রঞ্জে ঢালা মুণ্ডু আছে, সেটি ৩০০।৪০০ বছর আগেকার কীর্তি, নিগ্রো শিল্পের এক চরম প্রকাশ হ'য়েছে এই কন্যা-মূর্তিটিতে। লণ্ডনের এই মূর্তিটির ঠিক একটি জুড়িদার—অন্য ঢালাই-করা অনুকৃতি—

বের্লিনের বেনিন্‌-সংগ্রহে আছে জানতুম, তার ছবিও দেখেছি—এবার সেটি চাক্ষুষ দেখবো আশা ছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হ'ল না। এই মূর্তির (অন্য পাঁচটি শ্রেষ্ঠ মূর্তির সঙ্গে) ছাঁচে-ঢালা প্লাস্টর্‌-অফ-পারিসের ব্রঞ্জের রঙে রঙীন নকল, যন্ত্র-সাহায্যে তৈরী ক'রে মিউজিয়মেই বিক্রী হ'চ্ছে, যাঁরা এই নকল রাখতে চান তাঁরা কিনতে পারেন। দুধের সাধ ঘোলে মেটালুম,—ছাঁচে-ঢালা-রঙ করা প্লাস্টরের এই নকলটিই দেখা গেল। নিগ্রো জাতির মেয়েদের মধ্যে যে কমনীয়তা, আমাদের চোখে অপ্রকটিত যে একটা সৌন্দর্য আছে, নিগ্রো মুখের সত্যকার আদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌন্দর্য আর কমনীয়তাটুকু এই অখ্যাত অজ্ঞাত বেনিনের নিগ্রো শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছে। মেয়েটির গলায় একরাশ পলার কণ্ঠী, মাথায় পলার টুপী, তা থেকে ঝুলছে কানের পাশে পলার মালা। ঐ শহরের রাজবংশীয়দের প্রাচীন অলঙ্কার এই রকম হ'ত। জগতের ভাস্কর্য-শিল্পের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান দিতে হয় এই মূর্তিটিকে।

ইউরোপে রেনেসাঁস-যুগে, গ্রীসের বাস্তু-রীতি এবং গ্রীক আর রোমান ভাস্কর্যের প্রভাবে প'ড়ে, ইউরোপীয় শিল্পীরা মধ্য-যুগের বিজাতীয় ও গথিক শিল্পধারাকে বর্জন ক'রে, পঞ্চদশ শতকে যে নোতুন ধারার প্রবর্তন ক'রলে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের baroque 'বারক' আর rococo 'রোকোকো'-তে সেই রেনেসাঁস শিল্প-ধারার পর্যবসান হ'ল। সুপ্রাচীন আর শ্রেষ্ঠ যুগের গ্রীক ভাস্কর্য হ'চ্ছে নিছক ধ্রুপদ; সে ধ্রুপদকে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপ ঠিক আয়ত্ত ক'রতে পারলে না—এই ধ্রুপদ রেনেসাঁসের শিল্পীদের হাতে হ'য়ে দাঁড়াল' খেয়াল; অলঙ্করণ-বাহুল্যে এই খেয়াল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের শিল্পে বারক আর রোকোকোর টপ্পা ঠুম্‌রী হ'য়ে প'ড়ল। তখন ইউরোপীয় শিল্পে আবার চেষ্টা হ'ল, গ্রীকের গুরুগম্ভীর ধ্রুপদকে নোতুন ক'রে আনা যায় কিনা। অষ্টাদশ শতকের শেষ-ভাগে আর ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে—বিশেষ ক'রে ফরাসী সম্রাট নাপোলেওন-এর আমলে—শুদ্ধ গ্রীক শিল্পের রূপটুকু আবার ফিরিয়ে' আনবার চেষ্টা হয়। আরও গভীর-ভাবে গ্রীক আর লাতীন সংস্কৃতির রস-ধারার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা ইউরোপের—বিশেষ ক'রে জরমানির—পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দেয়; তারই ফলে এটা হয়। জরমানিতে গ্রীক আর লাতীন ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা

আগের চেয়ে অন্তরঙ্গ-ভাবে আরম্ভ হয়। গ্রীক-লাতীন-প্রেমী অনেক জরমান এমন কি নিজেদের বংশ-পদবীও গ্রীকে বা লাতীনে অনুবাদ ক'রে নেন—Neumann হ'য়ে যান Neander, Holtmann হন Xylander বা Dryander, Goldnagel হ'লেন Chryselius, Hering হ'লেন Alexis; এগুলি জরমান পদবীর গ্রীক অনুবাদ—আরও গুটিকতক এরকম অনুবাদ আছে; আবার লাতীনও ক'রে নেওয়া হয়—Schmidt হ'লেন Faber, Goldschmidt হ'লেন Aurifaber, Weber হ'লেন Textor, Schneider হ'লেন Sartorius, আর Bauer হ'লেন Agricola। নিজেদের ব্যক্তি-গত জীবনে যারা এইভাবে গ্রীক-রোমান জগতের স্পর্শ পাবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, তাদের বাহ্য জীবনেও যে গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির ছাপ আরও গভীরভাবে প'ড়বে, তার আর আশ্চর্য কি? ফ্রান্সের মতন, ইংলণ্ডের মতন, জরমানিতেও শুদ্ধ গ্রীক বাস্তু-রীতি আর শুদ্ধ ভাস্কর্য দেখা দিলে, নোতুন ভাবে এসে লোকের শিল্প-চেতনাকে জয় ক'রলে। দোরীয়, ইওনীয়, কোরিন্থীয় রীতির ইমারত চারিদিকে উঠতে লাগল। ইটালীর ভাস্কর Canova কানোভা, ডেনমার্কের Thorvaldsen টরভালডসেন, ইংলাণ্ডের Flaxman ফ্লাক্সমান, আর ফ্রান্সের চিত্রকর David দাভিদ—এদের মত নামী শিল্পী জরমানিতে কেউ উদ্ভূত না হলেও, বহু সুযোগ্য শিল্পী এসে জরমানির বাস্তু-রীতিতে আর ভাস্কর্যে গ্রীক দেবলোকের হাওয়া বহালে। পারিসের Madelaine মাদ্‌লেন গির্জা আর Arc de Triomphe অর্ক-দ্য-ত্রিওঁফ-এর তোরণ—এগুলির মত বিরাট ব্যাপার (পারিসের এই দুটী ইমারত রোমান ধাঁজে তৈরী) বের্লিনে গ'ড়ে ওঠেনি; তবে Unter den Linden উন্টের-দেন-লিন্দেন সড়কে শুদ্ধ গ্রীক রীতির দুটী জিনিষ দেখে চোখ জুড়িয়ে' যায়,—একটী হ'চ্ছে এই রাস্তার পশ্চিমের মোড়ে বিখ্যাত Brandenburg Tor বা ব্রন্দোনবুর্গতোরণ—এটী আথেন্স-এর আক্রোপলিস-গড়ের তোরণের নকলে তৈরী; আর অন্যটী হ'চ্ছে, এই রাস্তার পূর্ব-মোড়ে একটী ছোটো-বাড়ী; সেটী রাজার পাহারাদার সেপাইদের আড্ডা ছিল (Koenigswache), এখন বাড়ীটীকে জরমান জাতীয়তার বা Germania গেরমানিয়া মাতার মন্দিররূপে ব্যবহার করা হয়; এই বাড়ীটী ছোটো, আর শুদ্ধ দোরীয় রীতির স্থাপত্যের একটী অতি চমৎকার নিদর্শন।

পশ্চিমের যাত্রী। ১৩৩৫

চীনা থিয়েটার

চীনা থিয়েটার—সে এক অপূর্ব ব্যাপার। ইংরেজী ঢঙের থিয়েটারের মতনই প্রায় সব ব্যবস্থা, তবে কোনও কোনও বিষয়ে পার্থক্য আছে। দামী আসনগুলি আমাদের থিয়েটারের স্টল, পিট আর গ্যালারীর স্থানে। দামী আসনগুলির ব্যবস্থা এই রকম—দুখানি চেয়ার পাশাপাশি, আর চেয়ারের ডাইনে আর বাঁয়ে একটী ক'রে ছোটো টেবিল। এই চেয়ার টেবিল সব দামী আবলুশ কাঠের, খুব চীনা কারুকার্য করা। এই টেবিলগুলি, চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকদের ডান হাতের কাছে বা বাঁহাতের কাছে থাকে। এই টেবিলগুলি খাদ্য-দ্রব্য চা প্রভৃতি রাখবার জন্য। দর্শকেরা চোখে অভিনয় আর নাচ-টাচ দেখেন, কানে গান বাজনা আর কথা শোনেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখেরও কার্য চলে। হয় গরম চা চলে—চীনা চা, দুধ-চিনি বিহীন,—নয় কমলা লেবু, নয় চীন দেশে যা আমাদের চা'ল-কড়াই-ভাজার মত লোকে খেয়ে থাকে সেই-রকম খরমুজের বীচি ভাজা—নখে ক'রে ভেঙে-ভেঙে তার শাসটুকু মুখে দিতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে নীচের তলায় বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা, সেখানে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' নাটক দেখবার ব্যবস্থা, অত্যন্ত গরীব লোকেরা দু-এক আনা দিয়ে টিকিট কিনে সেখানে এসে তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে' থেকেই নাটক দর্শন করে। সর্বত্রই থিয়েটার দেখার সঙ্গে সঙ্গে 'মুখ-চলা'র রেওয়াজ। এক পাল রিকৃশওয়ালা, জেলে, কুলী, নৌকার মাঝিদের ঘরের মেয়ে—ময়লা মুখ, উস্ক-খুস্ক চুল—এরা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে' নাটক দেখ্‌ছে। দোতালায় তেতালায় বক্স আসন, নানা রকম চীনা জালি-কাটা কাঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া, সেখানে ধনী ঘরের পরিবারের মেয়ে আর পুরুষেরা এসে ব'সেছে।

উঁচু রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্তটা পুরোপুরি ইউরোপীয় থিয়েটারের মতন নয়। দৃশ্যপটের জন্য খুব বিশেষ ব্যবস্থা নেই। প্রেক্ষকদের স্থান থেকে সিঁড়ি বেয়ে রঙ্গমঞ্চে ওঠবার পথ আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরেই, দর্শকদের বাঁ দিকে Orchestra বা 'ঐক্যতান বাদক'-দলের স্থান। এদিকে নাটক-অভিনয় চ'ল্‌ছে, পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রণয়ী আর প্রণয়িনী গানে বা মৃদু আলাপে কথা কইছে, বা দুই বীর হুহুঙ্কার ক'রে (খালি হুঙ্কার নয়!) বাগ্‌যুদ্ধ ক'রছেন, তার-ই মাঝে-মাঝে নাট্যালয়ের লোকে রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয়-ব্যাপৃত নট-নটীদের পোষাক বা গহনা ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বা বীরদের হাতের

অস্ত্র-শস্ত্র মাটিতে প'ড়ে গেলে আবার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে। ষ্টেজের উপরেই, দু-ধারে রঙ্গ-মঞ্চের উপরে, দর্শকদের চোখের সামনে, বাজে লোকে ভিড় ক'রে আছে। বাদকদের দলে দু-একজন খালি গায়েও আছে—থিয়েটারের ভিতরটা বড্‌ডো গরম কিনা।

আমরা বস্‌বার পরেই দেখলুম, চীনাভাষায় লাল কালীতে লেখা একখানা খুব বড়ো ইস্তাহার যেটা ষ্টেজের একদিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ছিল, সেটা ব'দলে তার জায়গায় কালো অক্ষরে লেখা আর একটি বিজ্ঞাপনী দিয়ে গেল। ফ্যাঙ্‌ ব'ললেন, কবি আসবেন ভেবে লাল অক্ষরে তাঁর স্বাগত করা হ'য়েছিল, এখন কালো অক্ষরের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হ'ল যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল না। সন্ধ্যারাত্র থেকেই নাটক আরম্ভ হ'য়েছে, এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটা, অভিনয় পূর্ববৎ চ'লতে লাগল। প্রাচীন চীন ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক ; অদ্ভুত-অদ্ভুত পোষাক প'রে অভির্নেতারা আসতে লাগল,—এ-সব হ'চ্ছে চীনাদের প্রাচীন পোষাকের থিয়েটারী নকল—নানা রঙের সমাবেশ, নানা জরীর আর ছুঁচের কাজের ফুল পাতা, নক্‌শা, ড্রাগন বা চীনা নাগমূর্তি, প্রভৃতির রঙীন ছবি এই সব পোষাকে। নট-নটীদের মুখে এম্‌নি ক'রে রঙ মাখানো হ'য়েছে—লাল, হ'লদে, কালো,—আর এম্‌নি ক'রে ভুরু এঁকে দেওয়া হয়েছে, যে মুখ দেখে মনে হয়, মানুষ নয়, পুতুল। বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের আবক্ষ পাটের গোঁফ-দাড়ী, পাকা বা কালো, চীনা-সুলভ গোঁফ-দাড়ী যা বেরিয়েছে তা কেবল ওষ্ঠের উপরে আর-থুতনীতে। লড়াইয়ে' সেনাপতির চণ্ড মূর্তি, তার পোষাকে আর মুখের রঙে বিশেষ ভাবেই প্রকট। অভিনীত ঘটনাটী সব বুঝতে পারা গেল না। দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল—অভিনেতারা ঢুকে, বহু স্থলে ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে এসে, স্টেজের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে পরে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'রতে লাগলেন, বোধ হয় দর্শকদেরকে। কোথাও রাজসভা, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও গ্রাম্যজনের সভা আর তার আনুষঙ্গিক হাস্যরস আর ভাঁড়ামি, আর কোথাও বা চীনা প্রেমিক প্রেমিকার বিশেষ সংযত ভাবে রমন্যাসের বিন্যাস। নাচ-ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—ঝল-মলে' ঢিলা পোষাক পরা তন্বঙ্গী নটীর মনোহর নৃত্য, যাতে দৌড়-ধাপ নেই, আছে কেবল চমৎকার হাতের ভঙ্গী ; আর, ঢাল-তরওয়াল নিয়ে বিকটোজ্জ্বল পোষাক প'রে, মুখে সিঁদুর আর কালী মেখে যোদ্ধার পাঁয়তারা

উদ্দণ্ড নৃত্য। ছবির মতন এক-একটী দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যেতে লাগল।

জিনিষটা তার নোতুনত্বের জন্য, আর একটা বড়ো সুসভ্য জাতির নাট্য-সৃষ্টি হিসাবে, আর তার প্রাচীন নাচগান আর অভিনয় রীতির নিদর্শন হিসাবে, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল ব'লে, আর তার নিজস্ব সৌন্দর্য আর সার্থকতাও একটা ছিল ব'লে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে দেখতে পারা যেত'। কিন্তু তা পারা গেল না। আমরা বারোটার সময় বিদায় নিলুম, প্রায় পৌনে দু ঘণ্টা থাকবার পরে। চীনা ঐক্যতান বাদনই আমাদের তাড়ালে। এই বাজনার বিরাম নেই। বোধ হয় এই বাজনা শোনার অভ্যাসের দরুন চীনাদের কর্ণ-পটহের সহন-শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগল, বুঝি বা এক রাত্তির চীনা Orchestra শুনে, চির জীবনের জন্য আমাদের কানে তালা লেগে যায়। আগেই ব'লেছি, কয়েক বৎসর পূর্বে কাণ্টন থেকে আগত 'ভ্রাম্যমাণ' একটী চীনা থিয়েটারের দল সপ্তাহ খানেক ধ'রে ক'লকাতায় থিয়েটার দেখিয়েছিল, বিডন্ স্ট্রীটের অধুনা-লুপ্ত 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ভবনে; নিজেদের জাতীয় অভিনয় দেখ্‌তে ক'ল্‌কাতার সমস্ত চীনাপাড়া সেখানে ভেঙে পড়েছিল; কৌতূহল-বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো তিনটে দৃশ্যের পরে, আমার মতন বাঙালী যে ক'জন গিয়েছিল, তারা সবাই স'রে পড়ল, আমি বাহাদুরী ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ছিলুম, তার পরে আর পারলুম না। সুতরাং এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী। Orchestra-র যন্ত্রগুলি প্রায় সবগুলিই gong বা কাঁসর জাতীয়, সেগুলি হচ্ছে এই—মস্ত বড়ো কাঁসর, হাত দুই তার ব্যাস হ'বে, এ-রকম গোটা দুই, কাঠের ফ্রেমে দুটো ঝুলছে; মাঝারী আকারের কাঁসা গুটী তিন-চার; ছোট কাঁসা চার-পাঁচ খানা; কাঠের ফলকের উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মেরে তবলার কাজ হয়; একতারা কি দোতারা জাতীয় অতি কর্কশ-ধ্বনি তন্ত্রীময় যন্ত্র গুটী তিনেক; আর একটী কি দুটী বাঁশের বাঁশুলি, অভিনয় চ'লছে, তার সঙ্গে ছবির background বা ভিত্তি-ভূমিকার মতন এই কাঁসরের ঐক্যতান বাদন চ'লেছে, তার আর বিরাম নেই, কখনও বা মৃদু-মন্দে আর কখনও বা প্রলয়-নিনাদে আওয়াজ ক'রে। গান হ'চ্ছে, তারও সঙ্গে এই বাত্তির সঙ্গত, আর বহু স্থলে বাজনার চোটে গলার স্বর ঢাকা প'ড়ে তলিয়ে' যাচ্ছে। দুই বীরে তলওয়ার ঠোকাঠুকি আরম্ভ ক'রে দিলেন, অমনি প্রাণপণ

জোরে যুগপৎ ছোটো বড়ো ডজন-খানেক ঝাঁঝ কাঁসর আর কাঁসীতে হাতুড়ি বা কাঠি প'ড়তে লাগল। কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়, 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে হয়। তবুও রক্ষা ছিল যে, কি জানি কেন আমাদের একটু দূরে বসিয়েছিল, একেবারে স্টেজের সামনে নয়; স্টেজের সামনে হ'লে তো প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ত। তারপর, একটুও বিশ্রাম ছিল না কানের। একটা গর্ভাঙ্ক বা অঙ্কের মাঝে মাঝে যে বিরাম দেবার কথা, তখন এই কাঁসর বাজনা, স্টেজটীকে না পুরো দখলে পেয়ে, আমাদের নানা করুণ আর মিঠে চিনা গৎ শুনিয়ে' দিচ্ছিল; আর বাজিয়েদের হাতে যে জোর আছে, সেটাও মাঝে-মাঝে তারা বেশ এক হাত দেখিয়ে দিচ্ছিল। চীনা শ্রোতারা কিন্তু নির্বিকার। বাঁশের বাঁশুলি বেচারীদের দুরবস্থার একশেষ—তারা ঐ কাঁসরের ঝঙ্কারের মধ্যে প'ড়েছিল, তাই 'ঝা—ঙ্ ঝা—ঙ্ ঝাঝাঙ্ ঝাঙ্-এর ফাঁকে-ফাঁকে যে বাঁশের বাঁশীর আওয়াজটুকু পাবো, তারও জো ছিল না, কারণ কাঁসরের আওয়াজের বহুক্ষণ-ব্যাপী রেশের কল্যাণে কোনও ফাঁক পাবার উপায় ছিল না। মাঝে-মাঝে কোনও সুকণ্ঠী গায়িকা যখন গান ধ'রছিল, তখন কাঁসর আর কাঁসাগুলি এক-আধবার একটু-আধটু 'ক্ষ্যামা' দিচ্ছিল, খালি দু-একটী কাঁসী চাপা গলায় বাঁশীকে উপহাস ক'রে তাল দিচ্ছিল মাত্র, তখনই যা বঁশীর আওয়াজ একটু কানে আস্‌ছিল। তাও আবার দোতারাগুলির আওয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে'। 'সুকণ্ঠী গায়িকা' ব'ল্‌লুম, মনে রাখতে হবে চীনা রুচি অনুসারে সুকণ্ঠী। এদের গায়িকাদের বা নটীদের গলার আওয়াজ শুনে আমাদের দেশের লোকেরা হাস্‌বে। এরা গান করে, যাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের পরিভাষায় বলে falsetto-তে, স্বাভাবিক গলায় যে সপ্তকে গাইতে পারে, এরা তার উপরের সপ্তকেই গান ধ'রে থাকে; তাতে এদের অভিনয়ে নটীদের গান কথা-বার্তা বড়ই অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়, আর এতে এরা জোরও পায় না। সুতরাং পোষাক-পরিচ্ছদে কায়দা-করণে, চীনা-নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী অভিনয়-ভঙ্গিতে মিলে, জিনিসটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে তুল্‌লেও, এই falsetto গলায় গাওয়া আর অভিনয় করায়, আর কাঁসরের বাজনার উৎপাতে, অ-চীনা ব্যক্তির পক্ষে চীনা-থিয়েটারে বেশীক্ষণ থাকা কষ্টকর হয়ে উঠে।

দ্বীপময়-ভারত। ১৯৪০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪—১৯৫০

অরণ্যের সৌন্দর্য্য

বিশাল সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্ব্বত্য কুইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেচে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই জল-কলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে। কি সে অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য্য —এর বর্ণনার কি ভাষা আছে? যে কখনো এমন হাজার বর্গ মাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য নদীর পাষাণ-তটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গম্ভীর সৌন্দর্য্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কুইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে, চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কুইনা নদীর এই সুন্দর স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এর অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে—ওপারের বিরাট বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয় নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শিকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই দু-চারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথ রাত্রে এই গভীর অরণ্যানী মধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই অরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়।

হে অরণ্য কথা কও। ১৯৪৮

॥ পরিশিষ্ট

এই অংশে প্রাচীন চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, বৈষ্ণব কড়চা প্রভৃতি সঙ্কলিত হইল। পর্তুগীজ বাংলা গদ্যের নমুনাও পাওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত বইগুলিতে প্রাচীন বাংলা গদ্যের নমুনা সংগৃহীত আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন : প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন

শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

Siva Ratan Mitra : Types of Early Bengali Prose

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল : চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)

এ-ছাড়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতে প্রাচীন বাংলা গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

নরনারায়ণে[মল্লদেব]র পত্র*

লেখনং কার্য্যঞ্চ [।] এথা আমার কুশল [।] তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে [।] তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক [।] আমরা সেই উদ্যোগত আছি [।] তোমারো এ-গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় [।] না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম [।] সতানন্দ কর্ম্মী [,] রামেশ্বর শর্ম্মা [,] কালকেতু ও ধুমাসর্দ্দার [,] উদ্দণ্ড চাউনিয়া [,] শ্যামরাই [,] ইমরাক পাঠাইতেছি [।] তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ [,] ধনু ১ [,] চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর [,] বালিচ ১ [,], জকাই ১ [,] সারি ৫ খান [,] এই সকল দিয়' গইছে [।] আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক [।] তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ [,] ছিট ৫ [,] ঘাগরি ১০ [,] কৃষ্ণচামর ২০ [,] শুক্লচামর ১০।

লিপিকাল। ১৫৫৫

দলিল†

কাজী হাফেজ মহাম্মদ আরজী হইল জাহের করিলক জে পরগনে জয়নুজাল দরুন মোজে কোকা ও ঘোষবাটী জমা খারিজে বঞ্জর ১৪ চৰ্দ্দ বিঘা বাগ লাগাইতে হুকুম হইয়াছে কোকাতে ১৮ বিঘা ঘোড়াচাতে ৩ তিন বিঘা পরআনা ১১৩৩ সাল ৭৮ দাগে হইয়াছে তাহাতে ঘোষকার প্রজারা ও মোড্যাচার প্রজারা আরজী হইল জে আমার্দ্দের গরু চরাইতে আর জাগা নাই অতএব ইহার এয়জ অনস্তে হুকুম হয় ইহাতে জুমা খারিজ বঞ্জর ১৪ বিঘা কোনকা ঘোড়াচ্যাতে বাগা লাগাইতে ১৫ ভাদ্র ৭৮ দাগে পরআনা হইয়াছিল তাহা খারিজ করিল খারিজ রাখিহ তাহার এওজ ইহাকে বাগ লাগাইতে

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। শ্রীসুকুমার সেন

† Types of Early Bengali Prose । Siva Ratan Mitra

জমা খারিজ বঞ্জর ১৪ বিঘা পরআনা দরুন মোজে রামচন্দ্রপুরে হুকুম করিল নিসাদা করিয়া দেহ জেন বাগ লাগাইয়া ভোগ করেন।

লিপিকাল। ১২৩৩ সাল। ১৭২৬ (ইং)

পত্র*

ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড় মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড় মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকীয়া সধর্ম্ম উপরি বহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবর্দ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্ম-অধীকারি ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোশ্বামীদের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমরাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন পরকীয় ধর্ম্ম সে দেষে ও সেখানে সভাপণ্ডীত লইয়া ও দেবালয় আদি একত্র হইয়া তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন এতএব গৌড়-মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম অধীকারি তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন হইতে সিরোপা তোমাকে আইল আমরা পরাভূত হইয়া বাঙ্গলা উড়িস্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাও শ্রীমদজীব গোশ্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩০৮

বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধীকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহিভূত এবং শ্রীশ্রী৺সরকারে গুণাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাও ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম।

লিপিকাল। ১১৩৭ সাল। ১৭৩০ ইং (?)

পত্র *

৭ শ্রীহরিঃ

পোষ্য শ্রীগোপীনাথ দেবশর্ম্মণঃ—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ প্রযোনঞ্চ বিশেষ—

তোমার বাড়ির আমার বাড়ির সংবাদ বিবরিয়া লেখিবেন আর ঘরের বিশয় সকল সোষ্ঠব করিআ থাকিবেন আমার এখানে কিছু মাত্র নাই বাসা খরচ হয় না কজ্জতে মদাব (?) এই শ্রীমতি দীদী ঠাকুরাণির স্থানে ৭ সাতটি টাকা লইয়া দেবে বাড়া নাগে তাহা করিবেন অবস্থ অবস্থ রামহরি দিগের টাকা দিবে নাই রামহরিদ্দের খাবার খরচ উশাড়ি গ্রামে চালু ১৯ সলি ১০ সাড়ে শ্রীবিশ্বনাথ আচায্যস্থানে আছে শ্রীরামনাথ শর্ম্মাকে লইয়া আসিবেন শ্রাবন নাগাদি অগ্রহায়ন পর্য্যঞ্চ হইবেক আমার এখানে নাই জে খাবেন পুনশ্চ লিখি গোয়ালন্দের ঔসধ দুই সপ্তাহ চতুর্মুখ পাঠাই মধুতে ঘসিয়া পিপ্‌পলী চুর্ন্ন প্রক্ষেপ দিয়া খাইতে কহিবেন ইতি—

লিপিকাল। ১৭৪১

কুঞ্জনির্ণয় †

রাধাকুণ্ডের উত্তরে ললিতাজিউর কুঞ্জ। তার অষ্টদিগে অষ্ট সখির কুঞ্জ। মধ্যে এক কুঞ্জ নাম কন্দর্প কুহলি। তার মধ্যে চম্পক বৃক্ষ আছে নানারত্নে মূল বান্ধা। তার ছয় কোন বেদিঃ উপরে চান্দয়া নানা জাতি রত্নে জড়িত বস্ত্রে ঝলমল করে। নানা পুষ্প গুচ্ছ তাহাতে দুলিতেছে। মধ্যে রত্ন পালঙ্কঃ

* চিঠিপত্রে সমাজচিত্র [২য় খণ্ড]। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

† Types of Early Bengali Prose । Siva Ratan Mitra.

নানা পুষ্প সর্য্যাতে। বিরচিত তার চতুর্দিগে নানা সামগৃ পরিপুর্ন। তার মধ্যে কিসোর কিসোরীকে বৈসাইঞা নানা সেবা নর্ম্মসখিগণ করেন। কৃষ্ণের বামে রাই : রাইর বামে রূপ। দক্ষিণে রতি সম্মুখে অনঙ্গ॥ উপরে রূপ তাম্বুল জোগান॥ নৈঋত কোনে রস ব্যজন করেন। বাউবে কস্তুরি চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ মাল্য জোগান। তার সঙ্গে তার সখি সেবা করেন। ইসানে রতি পাখা সেবা করেন। অগ্নিকোনে অনঙ্গ সুভাসিত জল জোগান। দক্ষিণে অনঙ্গ নানা সেবাদি করেন। ইত্যাদি॥ : :॥ অঙ্গ সেবা করেন। জার জেই সেবা রূপের ইঙ্গিতে করেন॥ মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের এই॥ এই মত আর সাত কুঞ্জে॥ প্রাতঃকালে জাবটে। কোন দিন কদম্বখণ্ডিতে। রাত্রে শ্রীবৃন্দাবনে॥ আসাড় শ্রাবণ ভাদ্র বর্সা গোবর্দ্ধনে কন্দবাতে॥ আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রাণ পোষ মাঘ শ্রীবৃন্দাবনে॥ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জৈষ্ট শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে : যখন বাপের ঘরকে জান। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র ফুলদোল হুলি খেলান। বৈশাখ জৈষ্ট আসাড়ের সাতাইষ দিন পর্য্যন্ত জাবটে স্থিতি॥ কদম্ব কুহুলিতে॥ পুনশ্চ আসাড়ের তিন দিন রহিতে রসনাকে পিতৃ গৃহে গমন॥ শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিনের চব্বিশ পর্য্যন্ত থাকে। হিন্দোলা ঝুলনা নানান লীলাদি করেন। আরবার সমুর বাষ গমন আশ্বিনে। পাচ দিন রহিতে কার্ত্তিক অগ্রায়ণ পৌষ মাস পর্য্যন্ত রাষ। সেই সঙ্গে সখিদিগের গমনাগমন।

লিপিকাল। ১১৭১ সাল॥ ১৭৬৪ ইং (?)

রাজনগর-রাজ প্রদত্ত সনন্দ *

আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের গোপিনাথ শর্ম্মা ও রামজীউ শর্ম্মা ও লক্ষীকান্ত শর্ম্মা ও জয়চন্দ্র শর্ম্মা ও রাজ্জিধর শর্ম্মা জাহির করিলা জে—উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর—দেবত্তর মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুর —সাবীক বীররাজার দত্ত ৺ বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিস্কর দেবত্তর মুদ্দ্যৎ পুরুষ ২ হইতে ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে এক্ষণ বক্রেশ্বর মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গামা করে এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম

* Types of Early Bengali Prose : Siva Ratan Mitra.

না করে তেঁহায় যেমত হুকুম অতএব উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর দয়বস্ত দেবত্তর মৌজা ও চক গঙ্গারামে ডিহি ও শিবপুর সাবিক বীররাজার দেওয়া যথার্থ্য তাহার সনন্দ রাখে উক্ত শর্ম্মা পাণ্ডা মজকুরেরা পুরুষ ২ মুদ্দ্যৎ হইতে ৺জীউর সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে ও বক্রেশ্বরে যে বাজার হয় তাহাতে খাজনা আদায় করিয়া দখলিকার আছে উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম হাঙ্গামা করিবে না ও কখন শর্ম্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবে না যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক স্থরত ৺জিয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগ দখল করে।

লিপিকাল। ১১৭২ সাল। ১৭৬০ ইং (?)

পত্র *

৭ শ্রীশ্রীরাম—

স্বহায়—

৭ সেবক শ্রীদেবনাথ মিত্রস্য প্রণামা সতকোটি নিবেদনঞ্চ। আগে মহাসএর শ্রীচরণ শুভানুধ্যানে এ নফরের সমস্ত মঙ্গল করে মহাশএর স্বরির [গ] তিক ভাল আছেন শুণিয়া প্রাণ পাইলাম ১৭ ভাদ্র গ্রহণে একটি সিব স্থাপন বাটীতে করিব বাসনা করিয়া আয়োজন করিয়াছী আমী দষঞি কিস্তী দাখিল করিয়া বাটী জাইব মহাশয় অধিষ্ঠান হইলেই কৃয়াটী হয় অতেব নিবেদন অনুগ্রহ করিয়া অম্বপাড়ায় বাটী একবার আগমন হইবেক চিনী এক সের মণ্ডা সন্দেষ এক সের পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। ইতি

লিপিকাল। ১১৯১ সাল। ১৭৮৪ ইং (?)

পত্র †

৭ শ্রীশ্রীরামঃ ॥

আজ্ঞাকারি শ্রীজিবন দত্তস্য পরে পরাদ্ধং লিখনং নিবেদনঞ্চ। আগে মহাশএর পরম রাজোন্নতি সদা শ্রীশ্রী৺করিতেছেন তাহাতেই সমস্ত কুসল বিশেষঃ সরকার ইস্বরাবাদ পরগণে ভারতনগর মৌজে দেহতপুর শ্রীজিবানন্দ

* চিঠিপত্রে সমাজচিত্র। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

† চিঠিপত্রে সমাজচিত্র। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল।

দাষ একজন ভাল মনিষ্য বিদেষ হইতে আসিয়া আবাদ ভোগ তসরুপ করিঞা দেহতপুরের মালগুজারি করিতেছিল সঙ্গি ও তলি নয়ান রায় ও কর্ন্নসেন ও নাসিকা সর্ন্ন ইহারা সকলেই মতোয়াব্দ ছিলেন। ইদানি নাগাহালি অকস্মাত জরাতিসার নামে এক সওার আসিঞা দেহতপুরে পড়িল ধুমের সিমাহ নাই অনেক প্রহার করিলেক তবিবখানাতে একজন ভাল মনিষ্য ছিলেন তিহ আসিঞা অনেক মত নিসেধ করিলেন কিন্তু সওার জানিম মানিলেক নাঃ সঙ্গি ও তলি নয়ান রায় ও কর্ন্নসেন ও নাসিকা সর্ন্ন ইহারা সকলেই নিরস্ত হইলেন অজরাহ জবরজস্তি খামখায় দেহতপুরকে জালাঞা পোড়াঞা জিবানন্দকে বান্ধিঞা নিঙা গেল এমত অবিচার হইলে সৃষ্টি রক্ষা পায় না কোথাকার সওার কোথা হইতে আসিল কে পাঠাইলেক কোথা নিঞা গেল ইহার নিতান্ত না [জা] ন মহাসয় ভারতভূমের কর্ত্তা ইহার তদন্ত করিয়া নিসেধ করিবেন জেন এমত অবিচার না হয় চরনে বেদন করিল ইতি—

লিপিকাল। ১১৯৪ সাল। ১৭৮৭ ইং (?)

পত্র*

৭ শ্রীশ্রীশিবরামঃ

শরণং

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্ক মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপতাপিত সক্র সমূহ পূজিতাধীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাষ হুজুর শুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্দয়েণ আজীমঃসান সেপাহসালার আফোআজ বাদসাহিও কুম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্তান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালছ বাহাদোর বিশম সমরাট বৈরিকুল করিকুম্ভ বিদারণ কেশরিবর মহোগ্র প্রতাপেষু—সাহেবের দৌলত জ্যাদা সতত কামনা করি জাহাতে অত্রানন্দ-বিশেষঃ নমকবহরাম শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ কুঙর বারহা জেমত জেমত মুশীবতে শ্রীশ্রীবাবা মহারাজাকে ও আমাকে ও আমলাহায় পর পহচাইয়াছে তাহা জেলার সাহেবের নিকট বিস্তারিত জাহের করিআছি এবং হুজুরেও নিবেদন লিখিআছি একবার সন ১১৯০ নব্বে সালে বাবা মহারাজা শ্রীশ্রীহরেন্দ্র

* প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

নারায়ণ রাজা হইলে পর কুঙর মজকুর শ্যামচন্দ্র রায় সহিত পরামর্ষ করিয়া আমারদিগের গুরু শ্রীযুত ৺সর্ব্বানন্দ গোশ্বামিজীউ ও আমলাহায়কে সিদ্দত ও পুরশীষ পায় জিঞ্জীর করিয়া আপনে জবরদস্তী রাজা হইয়া আপন নামে শীকা জারি করিয়া বাবা মহারাজা ও আমারদিগের প্রাণ মারিতে উদ্যত ছিল খোরাক বেতিরেক অন্ধরের জনকএক স্ত্রীলোক মরিআছে শীঘ্র ৺কুম্পানির মদদ পহুছাতে আমারদিগের সকলের প্রাণরক্ষা সেবার হইআছে চারি পাচ দিবশ মদদ পহুছার দের হইলে আমারদিগের প্রাণ বাচিত না মদদ পহুছামাত্র কুঙর মজকুর পলাইয়া বলরামপুর গেল পরে শ্রীযুত মেস্তর মোর সাহেব জিল্লে রঙ্গপুর পহুছিয়া কোলনামা দরিআপ্ত করিয়া বড় কৌশলে সকল সমাচার লিখিলেন এবং কৌশলের হুকুম মতে আমারদিগকে খাতিরদারি লিখিলেন এবং ৺গোশ্বামিজীউ ও আমলাকে খালাষ করিয়া সরকারের তরফ শ্রীদেওান গঙ্গাপ্রসাদকে বেহার মোকাম সরেজমিতে কুঙর মজকুরের লুটতারাজ ও জুলুম তজবিজ করিতে পঠাইলেন দেওান মজকুর সরেজমিত পহুছিয়া কুঙর মজকুর মুকাবিলা হাজিরান মজলিসে কুঙর মজকুরের জুলুম ও প্রজা লুটতারাজ সকল তক:শীর ইসবাত হইল কুঙর মজকুরেক শ্রীকাপীতান ডক্কীনসেনের তরফ শীফাইর পহরাতে বেহারের গুদাম কাচারিত রাখিয়াছিলেন আমি কুঙর মজকুরেক নাজিরি মনসব হইতে তগীর করিয়া শ্রীজীবেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে নাজিরি মনসবে মোকরর করিলাম কথক দিবস পরে কুঙর মজকুর পলাইয়া রাঙ্গামাটীর কাহুনগো বুলচন্দ্র বড়ুআর জায়গাতে তাহার সহিত ইতফাকে থাকীয়া আপনার গায়েব জাহির করিয়া হুজুরে নালিষ করিয়াছিল তাহার পর দুই বৎসর পরে গনেসগির আদি সন্ন্যাশীয়ান ও বরকন্দাজান জমাইত করিয়া আমার চাকর শ্রীগোলাপ শীংহ শুবেদার সহিত কারসাজি পূর্ব্বক দাগা করিয়া বেহারের রাজবাড়ী চড়াও করিয়া জথা সর্ব্বস্ব লুটতারাজ করিয়া আমাকে ও বাবা মহারাজকে পাকুড়িয়া জে অবস্থাতে বলরামপুরে লইয়া গিআছে তাহা জেল্লার সাহেব ও শ্রীকাপীতান রাটন সাহেবক সকল জাহের আছে বলরামপুরে জে দুর্গতি করিআছে প্রান মারার বক্রী মাত্র ছিল জেল্লার সাহেব এতক পয়রবি ও তদারক না করিলে নমকহারামের হাতে বাবা মহারাজার প্রাণ ও আমার প্রাণ কদাচ বাঁচিতনা চাকর হইয়া সাহেবশীকার রাজার পর এমত সরারতি দফাত করিতেছে জখন জে মহারাজার আমলে জে মনসবদার নমকহারামি কিম্বা সরারতি করিআছে তখন সেহি মহারাজা

তাহার তক:শীর মাফিক সাজা করিআছেন যে অবধী ৺কুম্পানিতে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়া কৌল করার হইয়া ৺কুম্পানির আশ্রয় লইআছি সেই অবধী ৺কুম্পানি আমার মদদ ও মেহেরবানগী ও পয়রবি করিয়া মুদ্দইকে সাজা দিয়া নিকালিয়া দিবেন এমত খাতিরজমা আছে খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর কোনতু (?) সে (?) কুঙর মজকুর পুনশ্চ পিতাপুত্রন্ন (?) পোষ হইয়া নিকটাবৃত্তি থাকিয়া নানা ফেতরত করিয়া ফিরিতেছে জে জে লোক আমার পর দৌরাত্য করিআছে সে সকল লোক রঙ্গপুরে কএদ আছে তাহারদিগেকে মাফিক তক:শীর সাজা হয় কুঙর মজকুররা পিতাপুত্রে পাকড়া আশীয়া বিহিত প্রতিকার হবেক এমত উম্মেদে ছিলাম তাহাতে হুজুর হইতে কুঙর মজকুরের নামে ইস্তাহারনামা দিতে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আশীআছে সে মর্তে জেল্লার সাহেব ইস্তাহারনামা দিয়াছেন যে তুমি যতো তক:শীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসের মেআদে খালিসাতে কিম্বা জিলার সাহেবের নিকট হাজির হও জদি এ মেআদে হাজির না হও তবে তোমার তক:শীর মাফ হবেক না এহি শুনিঞা অধীক প্রাণ ভয় হইল সর্ব্বস্ব লুটীয়া লইলেক এবং বাবা মহারাজা ও আমার প্রাণ বধীতেছিল ও ৺কুম্পানীর ফৌজের সহিত লড়াই করিল এমত ২ তক:শীর মাপ হইল ইহাতে সে বড়ই পরশ্রয় পাইল অখন কুঙর মজকুর মনে করিবেক জদি এতো তক:শীর আমার মাফ হইল তবে মহারাজা ও মহারাণীকে মারিলে সেহ তক:শীর আমার মাফ হবেক অখন সে বাবা মহারাজার ও আমার প্রাণ মারিতে কোন সঙ্কামাত্র করিবেক না আমি তাহার দাগা ও ডাকাতির ডর করিতাম না জদি বাবা মহারাজা শীষু না হইতেন তবে তাহার মুরাদ কী ছিল বাবা মহারাজা বালক সেমতে সর্ব্বদা ভয়মান থাকি সাহেব সকলিরে মালিক যাহাতে বাবা মহারাজা ও আমার প্রাণ বাঁচে এবং আমলাহায় ও প্রজাদী নির্ভয় হয় আমি বাবা মহারাজাকে লইয়া খাতিরজমাত মুলুকের খবরগিরি ও আবাদবশত ও নালবন্ধী মালগুজারের সরবরাহ করি এমত করিতে হুকুম হইবেক।

লিপিকাল। ১৭৮৮

সাধননিরূপণ *

চন্দন সেবা চারিমত হয়॥ গোপী চন্দন॥১॥ শ্যামচন্দন॥২॥ অরক্ত চন্দন॥৩॥ কস্তুরি চন্দন॥৪॥ মালা পঞ্চ॥ গুঞ্জা মালা॥১॥ ধাত্রি॥২॥ পট্টডোর॥৩॥ শ্যামবর্ন্ধনি॥৪॥ তুলুশী॥৫॥ এই পঞ্চমালা ধ্যান করিবে॥ তৈলমর্দ্দন ত্যাগ॥ আলিশ ত্যাগ॥ স্ত্রীশঙ্গ ত্যাগ॥ আশক্তি দুর॥ বিশয় ত্যাগ॥ এই তিন কুর্য্যাত॥ বাসনা না টুটে তা করিবে॥ শাধন লক্ষণ॥ বিধিমার্গ ত্যাগ॥ কুলগর্ব্ব্য ত্যাগ॥ যবৈষ্ণবের অন্ন ত্যাগ॥ অন্নদীয়া নিন্দাবান্দা-ত্যাগ অন্নদিয়া নির্মার্ণ্য প্রসাদ গ্রহণ ত্যাগ॥ অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ॥ অশত আলাপন ত্যাগ॥ নিন্দা বিধিবাদ ত্যাগ॥ কুশধারণ ত্যাগ॥ পিতার শ্রাদ্ধ ত্যাগ॥ ইতি॥

লিপিকাল। ১১১৯ সাল। ১৭১২ ইং (?)

চিঠি (আহোম) †

মহামহিম মহিমসাগর গঙ্গাজল নিরমল পবিত্র কলেবর গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীযুত গবনর কৌসল বড় সাহেবর প্রত্তি প্রার্থনা নিবেদনঞ্চঃ পূর্ব্বক জানাইতেছি দরঙ্গের ধর্ম্মরাজা শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ জানাইতেছে পূর্ব্বে আমি [ ] পুত্র শ্রীবিসসিঙ্গি তাহার পুত্র শ্রীনরনারায়ণ ও শ্রীছিলারায় দুই ভাই নরনারায়ণ বিহারের পাট করিতেছেন আর ছিলারায় দরঙ্গের পাট করিতেছেন তাহার পুত্র শ্রীরঘুদেব তাহার পুত্র শ্রীবলি নারায়ণ তাহার পুত্র শ্রীমহিন্দ্র নারায়ণ তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র নারায়ণ ইহার দুই ভাই বড় পুত্র শ্রীসুর্যনারায়ণ ছোট পুত্র শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রনারায়ণের মির্ত্ত্যু হইলে বড় পুত্র সুর্জনারায়ণ রাজা হইলে পাঁচ বস্তর রাজা হইতে নবাব মনযুর খাঁ আসিয়া রাজা সুর্জনারায়ণকে ধরিয়া লইয়া ঢাকা গেল তাহার ছোট ভাই ইন্দ্রনারায়ণ রাজা হইল কীছুদিন ব্যাজে সুর্জনারায়ন ঢাকা হইতে আইল আসীয়া তাহার মিত্ত্যু হইল কীছুদিন গউনে ইন্দ্রনারায়ণের মিত্ত্যু হইল তাহার পুত্র শ্রীমোদনারায়ণ রাজা হইলেন ঞিহার কাল হইলে সুর্জনারায়ণের পুত্র

* Types of Early Bengali Prose। Siva Ratan Mitra.

† প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীধিরনারায়ণ রাজা হইল ক্রিয়ার মৃত্যু হইলে পরে শ্রীদুর্ল্লভ নারায়ণ রাজা হইল ইহার মির্ত্তু হইলে পরে ধির নারায়ণের পুত্র শ্রীকীর্ত্তি নারায়ণ রাজা হইল ইহার মিত্তু হইলে পরে দুর্ল্লভ নারায়ণের পুত্র শ্রীহংস নারায়ণ রাজা হইল কীছুকাল গউনে জখন শ্রী৺সর্গদেব রঙ্গপুর হইতে ভাগীয়া গোহাটী মোকামে আইল সেইকালে হংসনারায়ণ ৺সর্গদেবের সহিত বিগাড় করিয়া রণ করিলেন তাহার পর সর্গদেব ধরিয়া আনিয়া [ ] দিয়া মারিলেক পরে কির্ত্তনারায়ণের পুত্র শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ রাজা হইল ইহার ভাতিজা হংস নারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ছাওয়াল দেওয়ান হরদর্ত্তের বাঙ্গাল বরকনদাজ আনিয়া রাজা বিষ্ণু নারায়ণের ঘরবাটী লুট করিয়া পোড়াইয়া আর মলুক লুট করিয়া বিস্তর লোকের গরদান মারিয়া এবং চক্ষু খুলিয়া মারিয়া খারাপ করিয়াছে পরে বিষ্ণুনারায়ণ গোয়ালপাড়া মোকামে মে রোস সাহেবের নিকট গীয়া নালিশ করিয়া শ্রীযুত কোম্পানীর ঠাঞি জানাইতেছে এবং শ্রীযুত কাপীতেন সাহেবকে পাইয়া তাহার নিকট নালিস করিতেছি ফের শ্রীযুত কাপীতেন সাহেবের [গোচর] করিয়া দরঙ্গ মোকামে লইয়া বাঙ্গাল বরকন্দাজ বর করিয়া আপনার মোকামে বসীয়া আছি [অপর] গবনর কৌসল বড় সাহেবের নিকট আরাধন এবং প্রার্থনা করিতেছি শ্রীযুত মেহরবানগী করিয়া শ্রী৺সর্গদেবকে লেখেন আমার জন্য আমার এ মুলুক মেহের [বানগী ও] অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাল করেন এবং এ মুলুক আমাকে দেন এই প্রার্থনা শ্রীযুত ৺কোম্পানি গবনর কৌশল বড় সাহেবের নিকট করিতেছি শ্রী৺সর্গদেব আর আমার ভাই হংস নারায়ণকে মারিয়াছে এবং বহুত রাইয়তকে মারিয়াছে এখন এখন আমার মুলুকের রাইয়ত সমেত হাজার ২ সেলাম প্রার্থনা করিতেছি কোনরূপে শ্রীযুত কোম্পানির অনুগ্রহতে হবে আমার এই যে বিষ্ণু রাজা রাজ শ্রীযুত কোম্পানির অনুগ্রহতে জেন সুখে থাকী এ আসাম মুলুকের কাহারো তজবিজ নাই বড় দুর্খ দেয় আমী শ্রীশ্রীখোদাকে জেরূপ ভাবনা করি এখন শ্রীযুত কোম্পানি গবনর বড় সাহেবকে সেইরূপ ভাবনা করিয়াছি তোমার অনুগ্রহতে আমার সকল ভাল হইবেক ইহা আরজ করিলাম

লিপিকাল। ১৭৭০

চিঠি (কাছাড়) *

এখন মিং লাজনবারের আমল তিনবৎসর জে গরদিশ তাহা পত্রে কাহাতগ লিখিয়া জানাইব খামখা টাকা জিনিষ পাঠাইয়াছেন কুরুক করিয়া দন্ত ও মোম ভিটি ও ঘাসবাস বেত সমস্ত তাহাকে খরিদ করিয়া দিতাম আর বাজে এঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি কেহ খরিদ না পারে আমার মুলুক জঙ্গল পাহাড় বাস ঘাস বিক্রি করিয়া রাইয়ত লোকে পরবিসয় আমি এ সকল বেপার কুরুক করিয়া তাহাকে দিলে কাঙ্গাল লোক কি করিয়া বাচিবেক এই কারণ আখাজ করেন ছিপাই দিয়া রাস্তাঘাট বন্ধক করিয়া রাখেন আমার মুলুকের লোক তুমার মুলুকে জাইতে পারে না তোমার মলু [কের লোক] আমার মুলুকে আসিতে না পারে এই বিসয়ে গরিব লোকের নালিস নিমিত্যে আমার উঁকিল শ্রীখুসালরাম দত্তকে পত্র দিয়া তুমার নিকট পাঠাইতেছি তুমি বাঙ্গালার মালিক মেহেরমানি করিয়া এমৎ হুখুমনমা দেও অহিবা [আমার মুলুক হইতে] তুমার মুলুক জাইতে এবং তোমার মুলুক হইতে আমার মুলুক আসিতে বেপার তিজারৎ করিতে পারে এবং মন্দেসীয় লোকে কলিকাত্তাতে জিনিসপত্র লইয়া যাতায়াতে কেও বালাদাস্থি আটক ইত্যাদি বিসয়ে করিতে না পারে এমৎ হুখুমনমা পত্রী দেওয়াবেন আর বিশেষ কি লিখিবাম যৎকিঞ্চিৎ সন্দেশ হস্তির দন্ত ২ গোট দিতেছি তাহা স্বিকার করিবেন

লিপিকাল। ১৭৯৭

চিঠি (মণিপুর) †

বিনয়পুর্বক সেলাম নিবেদনঞ্চ। আগে শ্রীযুত লাড সাহেবের উমর দৌলত জেয়াদা ৶ করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং নিজরাজ্য মনিপুর হইতে আমি মোঃ মুরসিদাবাদে ৶ স্নান করিতে আসিয়া অন্তকরণ হইল আমার স্নান কারণ ৶ তিরে এক বাটী তৈয়ার করাই এবং সওদাগরিকারণ বড় হাতির দাঁত ও মোম আর আর হরেক জিনিষ নিজ রাজ্য হইতে মোকাম মুরাসিদাবাদে পঠাই কথক জমিন না হইলে বাটী কিমতে হয় মরজি হইলে

* প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

† প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

মুরসিদাবাদের কলেকটর সাহেব নামে এক চিটী আমার উকিলকে হুকুম হইলে অনেক মেহেরবানগী আমার মুক্তিয়ার উকিল শ্রীরাস বিহারি দাসকে নিকট পাঠাই জে জে বিসয় রোবরো আরজ করিবে তাহাতে গৌর মেহেরবানগী ফরমাইলে আমা প্রীতি অনুগ্রহ প্রকাশ আমার উকিল মজকুরকে সরফরাজ করিয়া ত্বরায় বিদায় হুকুম হইলে বহুত মেহেরবানগী লাড সাহেবের দৌলত জেয়াদার খএরাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকুম হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম।

লিপিকাল। ১৭৯৮

মনোএল্-দা-আসুস্থুম্পসাম্

রাখালের কাহিনী

এক রাখোয়াল মেড়ীর আছিল; তাহারে ভূত বাজি দিয়া কহিল, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম; রাখোয়ালে কহিল; ভাল, তোমার দাস হইব, তুমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল: তবে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্ম্মঘরে যাইতে; এবং সিদ্ধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না; এমত যে করে, সে আমার গোলাম; এহি আমার আজ্ঞা; তাহা পালন করিবি: এমত যদি না করিস্, তোমারে বহুৎ বহুৎ তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল: যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব: যদি এমত না করি, তোমার যে ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগিয়া রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিল; তাহার পর এক এক দিন মুনিষ্য বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্ম্মঘরে লইয়া গেল। ধর্ম্মঘরে এক পাদ্রি আছিলেন, সেই বড় সাধু: তিনি লোক-সকলেরে কহিলেন—তোমরা রাখোয়ালের উপর সিদ্ধি ক্রুশ কর। এমত লোক-সকলে করিল। তখন ভূতে বড় ক্রোধ করিয়া রাখোয়ালেরে অনেক তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রি রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাদ্রিরে কহিল: এহি মুনিষ্য আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত: তাহারে এড়িয়া দেও: না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাদ্রি

কহিলেন ; তাহারে এড়িয়া দিব না ; আমারে যাহা করিতে পারিস্, তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্র করিল, যে পাদ্রির মুখ বেঁকা হইল। এহা দেখিয়া লোকসকলে ডরে পলাইয়া গেল।

তখন পাদ্রি সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন ; এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে ; এবং ক্রুশ করিয়া, ভূতে পলাইয়া গেল। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কন্‌ফেসার করিল ; নির্ম্মল ধর্ম্মও ভক্তি রূপে লইল, এবং পুনর্ব্বার পাইল যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

লোভের পরিণাম

ফ্লান্দিয়া দেশে এক শিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল ; লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল ; এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতা মাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল ; তাহার এক বইন্ আছিল ; তাহারে পন্থে লাগাল পাইল ; ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল : তুমি নি আমারে চিন ? না ঠাকুর, বইনে কহিল। সে কহিল, আমি তোমার ভাই। ভাইয়ের নাম শুনিয়া, উনি বড় প্রীত হইল : ভাইয়ে ঘরের খবর লইল ; জিজ্ঞাসা করিল : আমারদিগের পিতা মাতা কেমত আছেন ? বইন্ কহিল, কুশল। দুই জনে কথা বার্ত্তা কহিল। পরে বইন্ আপনের ঘরে গেল, ভাইয়েও পিতা মাতার ঘরে যাইতে লাগিল। তাহার পিতা লাগাল পাইয়া, পুত্র অচিনা হইয়া পিতার কাছে বাসা চাহিয়া কহিল, ঠাকুর, তুমি নি এহি রাত্রে আমারে বাসা দিবা ? যে খরচ হয়, তোমারে দিবাম। পিতায় অচিনা পুত্ররে বাসা দিল, তাহার ধন দেখিয়া ধনের লালসে তাহারে রাত্রে বধিল, এবং তাহারে মাটি দিল, ধন লুকাইয়া রাখিল। আর দিন বড় প্রাতঃকাল পিতা মাতার বাড়ীতে বইনে গেল। পিতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাইয়ে কোথায় গেল ? পিতায় উতর দিল, তোর ভাই আসিল না, আমরাও দেখিলাম না তাহারে। ঝীয়ে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, তবে কোথায় গেল ? আমি কইল্ল রাত্রে তাহারে দেখিলাম হাঁটিয়া যাইতে ; তাহার লাগাল পাইলাম, আমার লগে কথা বার্ত্তা কহিল। এহা শুনিয়া

পিতা কান্দিতে লাগিল; মাগেরে কহিল, করিয়াছি আমরা? আমারগো পুত্র বধিলাম; অভাগিয়া হইয়াছি পৃথিবীর মধ্যে! এমত ধরাণ কান্দিতে কান্দিতে দুই জনে মাগ ভাতার অভরসা হইল: অভরসা হইয়া, যেন পাতকে আর পাতক জর্ম্মে, পিতা আপনে আপনেরে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিল, মাতায় ছুরি দিয়া আপনে মরিল, এবং দুই জনে নরকে গেল। এহি কথাতে দেখ, পরের ধনের লালসে পুত্রের বধ জর্ম্মিল, এবং অভরসা জার্ম্মিয়া দুই জনের বধ হইল।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ। ১৭৪৩

দোম্ আন্তোনিও

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

ব্রাহ্মণ।—তুমি কারে ভজো?

রোম।—পরমেশ(শ্ব)রের পূর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে।

ব্র।—তবে তোমোরা বরো উত(ত্ত)ম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি (?)।

রো।—যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্ম্মো ভজোনা দেখি?

ব্র।—তুমি এমত গিয়া (ন) মোস্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশ(শ্ব)রেরে নিন্দা করহ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?

রো।—আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারোকী।

ব্র।—তবে তো তোমারদিগের শাস্ত্রে * * যে নিন্দা করিলে মহা [২] নারোকী হএ; তবে কেনো নিন্দা করিলা?

রো।—আমিতো ধর্ম্মো নিন্দা করিনা, ধর্ম্মেরে ধর্ম্মো কহি অধর্ম্মেরে অধর্ম্মো কহি; পুণ্যোরে পুণ্যো কহি জননীরে জননী কহি স্ত্রীরে স্ত্রী কহি; ব্রমে(হ্ম)রে ব্রম(হ্ম) কহি; চণ্ডালেরে চণ্ডাল কহি; ধু(ধ্ব)গদেরে ধুগদো কহি; গোচোনেরে গোচোনা কহি; অমেরতেরে অমেরতো কহি; বিষেরে বিষ কহি; এমত কথাএ পুণ্যো বাদে পাপ নাহি;

এহাতে প্রতক্ষ্যে না জানিলে ধর্ম্মাধর্ম্মো জানিতে না পারে ; পরিণামে মুক্তি না হএ এহা না জানিলে, এ কারোণ এহারে নিন্দা না কহি।

ব্র।—এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথক্ষ্যে বুঝাইবা ; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মো তিনি লওয়াএন, ধর্ম্মো তিনি অধর্ম্মো তিনি।

রো।—এ সকোল প্রতক্ষ্যে বুঝাইবো যেমত জিজ্ঞাসা করহ ; ধর্ম্মাধর্ম্মো তিনি লওয়াএন না, ধর্ম্মো কার্য্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ ; আমোরা (অ)ধর্ম্মো কার্য্য করিয়া তাহান শাস্ত্রে লঙ্গনা করিয়া আমোরা পাপ করি ; তিন শাস্ত্রেতে বেমতি দেন, পিণ্ডো, ভূত আর শরীর ; এই সকোল ব্রমিয়া তাহান অধর্ম্মো আমোরা করি, এই যে ধর্ম্মাধর্ম্মতোনুসারে ভোগ দিবেন ; সৎ কার্য্যো করি, তবে মুক্তি দিবেন ; অসৎ কার্য্যো করি, তবে কুমতি দিবেন, অসৎ কার্য্যো করি তবে মহা নরোকে যোম তারোণা দিবেন, তিনি অধর্ম্মো নহেন তিনি কেবোল পরমো ধর্ম্মো রাজ, তাহান ঠাই অযোথার্থ নাই।

ব্র।—এসকোল কথা অতি বিলক্ষণ ; এহার মৈধে (মধ্যে) আমারদিগের শাস্তোর কহি, এই সৎ কায। জানামি ধর্ম্মং নচো মে প্রবির্তি ; জানামি অধর্ম্মো নচো মে নিবৃতি, তয়া হৃষীকেশো হৃদিস্থিতেনো যথা নিযুতোসি তথা করোমি, এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা লওয়াএন তাহা হএ করি, অধর্ম্মো বা কি, ধর্ম্মো বা কি তাহা না জানি ; বোলে যে আমি জানি না ধর্ম্মো আছে কিবা না, এবং অধর্ম্মো আছে কিবা না, যেমোন পরমেশর বলেন তেমোন আমি করি শরীরে থাকিয়া, অধর্ম্মো জানিনা, ধর্ম্মো জানিনা ; এহার বিচার কহো আমারে, এ বেধের কথা।

রো।—হএ, এহা বুঝাইবো ; সম্পতি তোমার শাস্ত্রের মতে বুঝাই, এহাতে কতো বুঝো ? যদি পরমেশর তোমারে লওয়াইতেন পাপ করিতে, তবে কেনো তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি লিখে ? গোবধ ব্রম(হ্ম) বধের মাতৃ গমোনের গোমাংসো ভক্ষণের সুরাপান আর ইত্যাদি যতো ? পরমেশরের আজ্ঞাএ যে কার্য্যো করি তাঁহার পুরাশ্চিন্ত (?) কেনো আমি করিবো ? আমার অপেরাদ কি ? তাহান আজ্ঞাএ আমি করি তিনি ধর্ম্মোরাজ হৈয়া এমত অবিচার করিবেন ?

মুনিষ্যের মৈধে যে রাজার আজ্ঞাএ চোর ঢাকাইতের, এবং পিতার মস্তোক কাটে তাহারে সেইয়া রাজাই এ অপেরাদী; তাহা(রে) মাথা কাটে না; যে এ অপোরাদ তাহার নহে। মুনিষে (মুনিষ্য) যে অধোম তাহার বিচার এমত; এহাতে পরমেশর এমত ধর্ম্মোরাজ যথার্থো হৈয়া এমত অবিচার করিবেন? যে আমারে দিয়া পাপ করাইয়া আমারে নরোকে যে মত তারোণায় ফেলিবেন? এ নি উচিৎ? তোমার পরোমার্থে নি লএ এ বিচার, যে পতিত পাবন করুণা সিন্ধু এমত অবিচার করিবেন?

ব্র।—যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএ না, যে পরমেশর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ-কথা যেতো কালের পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ।

রো।—যে মতে ও কথা মিথা (থ্যা) হেনো চিতে তোমার লইলো, তেমর্ত ইহাও বুঝাইবো, কিন্তু করমাঙ্কিত কি? আমি তো ইহাতো বুঝি না।

ব্র।—করমাঙ্কিত এই প্রব জন্মিয়াছিলো, তাহাতে বিস্তি পাপ করিয়াছিলো, এ কারোণ সেই পাপে এ কালে পাপ করে।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ। ?

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন

১৮০৫ খ্রী-১৮৩২ খ্রী

আসামের রাজ্য বিবরণ

এক সময় গৌড়ের বাদশাহজাদা রত্নধ্বজের নিকট আসিয়াছিলেন। তাহাতে বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করত অনেক ২ দ্রব্য দিয়া বিদায় দিলেন। তদন্তে রত্নধ্বজ আত্মপুত্রকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ রাজপুত্র বাদশাহের নিকট গিয়া দৈবাৎ কালায়ত্ত প্রযুক্ত সে স্থানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত ঐ শব তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালীন রাজা রত্নধ্বজ পাল সিদ্ধক্ষেত্রে বসতি করার কারণ এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ নূতন নগরে প্রবেশকালে শব লইয়া বাদশাহের লোক পঁহুছিল। এ কারণ ঐ নগরের নাম সদিয়া হইল অদ্যাপিও ঐ স্থানকে সদিয়া কহে।

ঐ রত্নধ্বজপালের যে পুত্র বিজয়ধ্বজপাল ছিলেন, তৎপুত্র বিক্রমধ্বজপাল রাজা হইলেন। পরে তৎপুত্রপরম্পরারূপে গরুড়ধ্বজপাল ও হংসধ্বজপাল ও ময়ূরধ্বজপাল ও জয়ধ্বজপাল ও ধর্ম্মধ্বজপাল ও কর্ম্মধ্বজপাল এই নয়জন রাজা হন।

ঐ কর্ম্মধ্বজপাল অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত পুত্র কামনা করিয়া দেবতা সাধনা করাতে পুত্র না হইয়া পুত্রী একটি জন্মিল। দেবতা সাধন দ্বারা কন্যা পাইলেন, একারণ সাধনী নামে ঐ কন্যা খ্যাতা হইলেন।

ঐ কন্যা যুবতী হওয়াতে রাজা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস বৃক্ষোপরি কর্কট একটা উপবিষ্ট ছিল। রাজা কহিলেন যে এই কর্কটকে যে ব্যক্তি কাণ্ড অর্থাৎ বাণ দ্বারা বধ করিবেক তাহাকে কন্যা বিবাহ দিব, তাহাতে সামান্য একজন ছুটিয়া তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাতে রাজা সত্যবাগ্বদ্ধ হইয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা তাহাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজা কহিলেন যে তাহাতে ক্ষতি কি আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে। পরে কন্যা কহিলেন যে আমি যাহা চাহিব তাহা দিবা। রাজা তাহাতেও স্বীকৃত হইলে সম্প্রদানন্তর কন্যা স্বর্ণসিন্দুকস্থিত কুবেরদত্ত বিড়াল চাহিলেক। রাজা সত্যবাগ্বদ্ধ হইয়া অগত্যা তাহা দিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হৃতরাজ্য হইলেন। কন্যা সিন্দুক হস্তে করিবামাত্র বিড়াল অদৃশ্য হইল। তদর্থে কন্যা ক্রন্দনপরায়ণা হওয়াতে তৎপতি সান্ত্বনা করিয়া নূতন স্বর্ণ বিড়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজা হতশ্রী হইয়া মন্ত্রিসমভিব্যাহারে বনপ্রবেশ করিলেন। রাজজামাতা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া নীতিপাল নামে খ্যাত হইলেন। এবং পূর্ব্বায় মন্ত্রিপাত্র সকলকে দূর করিয়া যদ্রূপ রাজা তদ্রূপ মন্ত্রিপাত্র পুনরায় কল্পনা করিলেন। দোষাদোষ বিচার না করিয়া প্রাণিকে দণ্ড করিতে লাগিলেন। এ নিমিত্ত রাজ্যেতে তাঁহার নীতিপাল না হইয়া অনীতিপাল খ্যাত হইল। আরো তিনি রাজ্যচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মৃগয়ানিরত হইলেন। তাহাতে ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গরাজ পক্ষীয় ফ্রাচেংমুন্ বড়গোহাঞি নামক সেনাপতি ঐ রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন। তদবধি ছুটিয়ার রাজত্ব সমাপন হইয়া তদ্রাজ্য ইন্দ্রবংশীয়দের রাজ্যান্তঃপাতি হইল। ইদানীং ঐ ছুটিয়ার রাজার সন্তান আছে। কিন্তু তাহারা সাধারণ লোকের শ্রেণিতে গণিত হইয়াছে।